ও

তাহার আদর্শ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

SOCIETY AND ITS IDEAL.

VOL. I.

By

DEBENDRABIJOY BOSE.

প্রথম খণ্ড,—সমাজ-আত্মা।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু

প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫।

মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

'সমাজ ও তাহার আদর্শ' পুস্তক অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইল। ইহার কারণ এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় ছিল। সমাজ-বিজ্ঞান নূতন শাস্ত্র,—সম্প্রতি ইউরোপে ইহার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যে সকল মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া সমাজবিজ্ঞান বুঝাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সুযুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, এবং এই কারণে আমাদের শাস্ত্রোক্তাবিত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া সমাজতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম।

১৩০৮ সালের সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেন। সেই উপলক্ষে আমি আদর্শ সমাজের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করি। কিন্তু পরে কয়েক মাস পীড়ায় শয্যাগত থাকায় সে অভিপ্রায় উপযুক্তরূপে সিদ্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমাজের সকল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আলোচনা করিবার অবসরও ছিল না। উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে যে 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহা নব্যভারতে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তাহার পর বিস্তারিত ভাবে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু তখনও পীড়িত থাকায় সে সঙ্কল্প সম্পূর্ণ-রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। অবসর মত লিখিত হইয়া ক্রমে পুস্তক ছাপান হইতেছিল। তখন কর্ম্মোপলক্ষে উলুবেড়িয়াতে থাকিতাম। সেখানকার দর্পণ প্রেসেই ইহা মুদ্রিত হইতেছিল। তখন তেইশ ফর্ম্মা পর্যান্ত ছাপা হয়। পরে নানারূপ বাধা উপস্থিত হওয়ায় পুস্তক লেখা ও ছাপান বন্ধ হয়। সে আজ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসরের কথা।

ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতের সম্পাদক আমার ভক্তিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় উক্ত ছাপান অংশ ক্রমে ক্রমে নব্যভারতে প্রকাশ করেন। সুতরাং এই অসম্পূর্ণ অংশ এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেই ছাপান ফর্ম্মাগুলি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া

যাইতেছে জানিয়া, সেই গুলি এক্ষণে পুস্তকের প্রথমভাগ রূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। কেবল শেষ অসম্পূর্ণ অধ্যায়কে সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত হইত। যথা :—প্রথম খণ্ড—সমাজ-আত্মা ; দ্বিতীয় খণ্ড,—সমাজ-শক্তি ; তৃতীয় খণ্ড,—সমাজ-শরীর ; চতুর্থ খণ্ড—সমাজ-বিজ্ঞান ; ও পঞ্চম খণ্ড—সমাজ-আদর্শ। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের আর তিন অধ্যায় ছাপাই— দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া প্রথম ভাগে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কি বাধা হেতু তাহাও এক্ষণে ঘটিয়া উঠিল না। যদি ভগবানের ইচ্ছা থাকে ভবিষ্যতে ইহা ভালরূপে ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে

এই পুস্তকের প্রুফ্ দেখিবার ভাল ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া অনেক নীয় ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। বানান ভুল অনেক আছে। 'অণ্' স্থানে 'আপত্তি' স্থানে 'আপত্য',—এরূপ ভুল অনেক আছে। এরূপ ভুল অর্থ গের বিশেষ বাধা হয় না। কোন কোন স্থলে এরূপ ভুল আছে, যাহাতে গ্রহণেও বাধা হয়। ১৬০ পৃষ্ঠায় এরূপ ভুল বিস্তর আছে, যথা:—১৫ 'লাভের' স্থলে 'নাশের', ১৬ ছত্রে 'নষ্ট' স্থলে 'দগ্ধ', ২৫ ছত্রে 'পরিচ্ছদ' 'পরিচ্ছদে', ২৬ ছত্রে 'আমাদের শীতাতপ বা লজ্জা' স্থলে 'আমাদের বা ২৮ ছত্রে 'বিলাসিতা ভোগলালসা বা অভিমান চরিতার্থ' স্থলে 'বিলাসি অভিমান নিবৃত্তি',—ছাপা হইয়াছে। এরূপ স্থলে অর্থ গ্রহণ হয় না। অসম্পূর্ণ বলিয়া ভ্রম সংশোধন-পত্র দেওয়া হইল না। যদি কেহ অনুগ্রহ এ পুস্তক পাঠ করেন, তবে আশা করি, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন. ইতি।

১লা ভাদ্র, সন ১৩১৫ সাল।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

—০৩০০—

১। আমরা সমাজ ও তাহার আদর্শ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেন প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ আলোচনার প্রয়োজন কি, তাহা প্রথমে আমাদের উল্লেখ করিতে হইবে। কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহার প্রয়োজন, বিষয়, অধিকারাদি অনুবন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। আমাদের সমাজ মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আজ আটশত বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের সমাজে নানাদিকে নানারূপ পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যে সংসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আপাত-মনোহর আহ্বানে, আমাদের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ধীরেধীরে অলক্ষ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সংগঠিত হইতেছে। এক দিকে প্রাচীন আর্য্য সমাজের কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ, অন্যদিকে আধুনিক ইহকালে সুখসমৃদ্ধিপ্রদ পাশ্চাত্য সমাজের জড় কেন্দ্রাতীগ আকর্ষণ, এবং এই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হেতু, আমাদের সমাজ একরূপ বক্র গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু, ভয়ের সহিত সেই উৎকট পরিবর্ত্তন, সমাজের সেই তির্য্যক্ গতি লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। দারুণ ধর্ম্মহীন কলিযুগমাহাত্ম্যে সমাজ ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে মনে করিয়া, তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ-শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত নেতা ছিলেন, তাঁহারা একরূপ হতাশ হইয়া হাল্ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই সামাজিক পরিবর্ত্তনকে সমাজের উন্নতি ও জীবনী-শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া, আহ্লাদে ও ব্যগ্রভাবে ভবিষ্যতের পূর্ণ উন্নতির আশায়

অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া (দিকে যাইতেছেন, তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। এই বিষম পরিবর্ত্তনের দিনে, এই বিপ্লবের প্রাক্‌কালে, আমাদের ভাবিবার ও বুঝি প্রয়োজন হইয়াছে—আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, না উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সমাজের লক্ষ্য কি, সমাজের আদর্শ কি, সমাজের কর্ত্তব্য কি, তাহা না জানি পারিলে, আমরা এই কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিব না। এই জন্য আমাদের অ সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

২। আর শুধু তত্ত্ব আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আদর্শ সঃ কাহাকে বলে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে ন আদর্শ সমাজ কি—তাহা স্থির করা ত প্রায় সকল জ্ঞানার্থীরই কর্ত্তব্য। (কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় সমাজের কোন্ দিকে গতি হয়, কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সমাজ উন্নতি দিকে নীত হয়, কিরূপ সমাজ আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, কোন্ শ বলে সমাজের অবনতি হয়,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে তাহা জানিতে হয়। সমাজে স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও পরিণতির কারণ পরম্পরা কি, তাহা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। কি এই তত্ত্ব আলোচনা যথেষ্ট নহে। যাঁহারা জ্ঞানার্থী, তাঁহারা এই তত্ত্ব আলো করেন। আর যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে কা[illegible] করেন, যাঁহ সমাজের নেতা—তাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া, নিষ্কাম ভাবে, কর্ত্ত[illegible] বুঝিতে, সম রক্ষার্থ ও সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া [illegible] জন্য আজী প্রাণপণ চেষ্টা করেন, লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করেন. 'সা[illegible] লোকে শ্রেষ্ঠদি অভিমত ও আচরণ অনুসরণ করে,'* এই তত্ত্ব অনুসারে ত[illegible]হারা স্বয়ং লোকশিক্ষ কর্ম্ম করেন। তাঁহারাই সমাজের শীর্ষ স্থানীয়, তাঁহাদের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠি সমাজনেতৃগণ ভবসমুদ্রে সমাজ-পোতের নাবিক স্বর[illegible]। সমাজের প্রকৃত ল কি, সমাজ সেই লক্ষ্য স্থানে যাইতেছে কি না, তাঁহারা তাহার প্রতি রাখেন। প্রতিকুল শক্তি দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার তাহার গতি ল অভিমুখে স্থির করিয়া দিতে যত্ন করেন। যে প্রতিকুল শক্তি সমাজের উন্নতি

* যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
গীতা ৩।২১।

অন্তরায়, যাহা সমাজকে অবনতির পথে লইয়া যায়, সমাজনেতৃগণ সেই প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার কার্য্য রোধ করিতে, ও তাহাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়া সকল উন্নত সমাজের সমাজনেতৃগণের কর্ত্তব্য। এইজন্য আদর্শ সমাজ কি, কি করিয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় সকল সমাজনেতৃগণের জানা একান্ত প্রয়োজন। অতএব সমাজতত্ত্ব আলোচনা করা জ্ঞানার্থীর কর্ত্তব্য, সমাজতত্ত্ব প্রচার করা তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্য, আর আদর্শ সমাজতত্ত্ব জানিয়া তদনুসারে সমাজকে আদর্শের অভিমুখে, উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সমাজনেতৃ-গণের কর্ত্তব্য।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ও তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা সাধারণ ভাবে আলোচ্য, সকল সমাজ-নেতৃগণের যাহা সাধারণ ভাবে কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের সমাজে বিশেষ ভাবে আলো-চনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ মহা বিপ্লবের আবর্ত্ত মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিকুল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। এই জন্য প্রকৃত আদর্শ সমাজ কি, আমরা সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি কি না, তাহা এক্ষণে আমাদের বিশেষ রূপে জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আর সে কথা শুধু জানিলেই যথেষ্ট হইবে না। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের সমাজ ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আদর্শের বিপরীত দিকে অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা হইলে সেই লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের সমাজের গতি স্থির করিয়া দেওয়া আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য,—এ কথা বুঝিয়া তদনুসারে আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

জ্ঞানীগণ যেরূপ সমাজতত্ত্ব প্রচার করেন, যেরূপ তত্ত্ব প্রমাণ করেন, ও তদনুসারে সমাজনেতৃগণ যেরূপ সমাজ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহার ফলে যে, সমাজে নানা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। গত শতাব্দীতে এই কারণে ইউরোপে, বিশেষতঃ ফরাসী সমাজে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই মনে আছে। রুসো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফরাসী দেশে যে সমাজতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, ও তথাকার সমাজনেতৃগণের চেষ্টায়, যে দারুণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সে লোমহর্ষণ ব্যাপার স্মরণ করিলে এখনও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত

হয়। গত শতাব্দীতে আমাদের সমাজের বিষয় ভাবিলেও আমরা এ কথা বুঝি পারি। বাঙ্গালায় রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহা কেশব চন্দ্র সেন—ইঁহারা স্বতঃ পরতঃ সমাজে নানা পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে এক নূতন অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের সম্মিলিত আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠি হইবার চেষ্টা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে ও এইরূপ স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণে চেষ্টায় সমাজের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর কংগে সভাস্থলে সামাজিক সভার (Social Conference) অধিবেশনে, সামাজিক রী নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হইতেছে। পশ্চিমদেশে কায়স্থ সভার এইরূপ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া, তাহাতে সামাজিক রীতি আলোচনা হইয়া থাকে। অতএব এই সময়ে আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করা আম দের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

৩। অনেকের ধারণা আছে, আদর্শ সমাজ আদৌ সম্ভব নহে। আদ সমাজ, কবি বা কবিদার্শনিকের কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বে য়ুনানী দার্শনিক প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিক (Republic) আখ্যাত পুস্তকে, এইরূপ এক আদর্শ সমা কল্পনা করিয়াছেন। ইউটোপিয়া (Utopia) নামক গ্রন্থে, এল্‌ডোরেডো (El dorado) প্রভৃতিতে এইরূপ আদর্শ সমাজের কল্পনা আছে। আরও কতর আদর্শ সমাজের কল্পনা হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন আদর্শ সমাজের ধার যেরূপ নিরর্থক হইয়াছে, সেইরূপ সকল আদর্শ সমাজের ধারণাই নিরর্থক হইবে সমাজ সতত পরিবর্ত্তনশীল। অবস্থা অনুসারে সমাজের পরিবর্ত্তন হয়। যে সমা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে, সে [illegible]জ মৃতপ্রা তাহার জীবনীশক্তি নাই বলিলেই হয়। অতএব যখন অবস্থা[illegible]শেষে সমাজে পরিবর্ত্তন হয়, যখন সমাজের বৃদ্ধি ক্ষয় উৎপত্তি বিনাশ আছে, তখন আদর্শ সমা সম্ভব নহে। সুতরাং আদর্শ সমাজের কল্পনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপ ধারণা ঠিক সঙ্গত নহে। মানুষ মাত্রেই আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হয় আমাদের জ্ঞানে মনুষ্যত্বের বা আদর্শ মানবের যেরূপ ধারণা থাকে, আমরা জ্ঞানপরি চালিত হইয়া, সেই আদর্শ অভিমুখে যাইতে চেষ্টা করি। যখন আমরা প্রবৃত্তি বা স্বভাববশে, অথবা মানসিক শক্তির অভাবে অথবা আমাদের আদর্শ ধারণা অস্পষ্টতা হেতু, সে আদর্শ হইতে দূরে গিয়া পড়ি, বা আদর্শবিরোধী কর্ম্ম করি

তখন পাপ করিয়াছি মনে করিয়া প্রায়ই অনুতপ্ত হই। আমরা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কখন আদর্শ পর্য্যন্ত যাইতে পারি না। আমরা যতই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই ইন্দ্রধনুর ন্যায় আদর্শ আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের আদর্শ ধারণারও উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাই আমরা আদর্শে পঁহুছিতে পারি না। যদি কখন সাধনা বলে আমাদের আদর্শ লাভ করা সম্ভব হয়, তখন আমাদের মুক্তি হয়। কেন না আমাদের আদর্শ লাভই মুক্তি।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যাঁহারা সমাজের নেতা, যাঁহারা সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সমাজের একটা আদর্শ ধরিয়া লয়েন, এবং সেই আদর্শ অভিমুখে সমাজকে লইয়া যাইতে যত্ন করেন। আমাদের জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সমাজ সম্বন্ধে আমাদের আদর্শের ধারণাও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। অসভ্য সমাজের সমাজনেতৃগণও, তাহাদের সীমাবদ্ধ অপরিস্ফুট জ্ঞানে, সমাজের একটা আদর্শ অলক্ষ্যে কল্পনা করিয়া লইয়া, সমাজকে সেই আদর্শ মত সংগঠিত করিতে চেষ্টা করে। সভ্য সমাজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সকল সমাজই, সেই সমাজের নেতৃগণের কল্পিত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হয়। কোন সমাজই ঠিক সেই আদর্শে আসিতে পারে না। কোন কোন সময়ে সে আদর্শের কল্পনা এত উচ্চ হয়, যে এ পৃথিবীতে কোন সমাজ কখন সে আদর্শ লাভ করিতে পারে না, মনীষিগণ এইরূপ ধারণা করেন। তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া, পরকালে বা স্বর্গে সেই আদর্শ লাভ হইবে, পরকালে মুক্ত অমরাত্মাগণের সমাজ সেইরূপ আদর্শে গঠিত আছে, এইরূপ কল্পনা করেন।* যাহা হউক আমাদের

* "There forms itself in the minds of men the conception of an ideal commonwealth, whose pattern, as Plato said, is stored in heaven, never itself to descend, yet visible for perpetual approximation by the wise—"a kingdom of God," in which at last wrong shall wear itself out, and the energies of life shall be harmonised and its affections perfected. Under this aspect it is, that the moral evolution of society, unable to rest in the *State* aspires to transcend it to church.........."

J. Martineau.—*Types of Ethical Theory.*
Vol. II. P. 405.

সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এই আদর্শের ধারণা আংশিক—অপূর্ণ। যদি কখন পূর্ণ জ্ঞানল সম্ভব হয়, তবেই আমাদের জ্ঞানে সমাজের পূর্ণ আদর্শ ধারণা হইতে পারে। নতু আমাদের জ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, আমরা তদনুসারে সমাজ সম্ব তাহার আদর্শ কল্পনা করিয়া লই। কাজেই আমাদের এই অপূর্ণ অজ্ঞানজনি জ্ঞান সমাজের যে আদর্শ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকে এ জন্য জ্ঞানী আপ্ত ঋষিগণ, সাধনা বলে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, আ সমাজ সম্বন্ধে যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই আমাদিগ আদর্শ সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে,—প্রকৃত আদর্শ সমাজ কিরূপ, ত স্থির করিতে হইবে। এই উপায়েই প্রকৃত আদর্শ সমাজতত্ত্ব আমরা লাভ করি পারি। নতুবা কেবল আমাদের নিজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, সাধারণ যু পথ অবলম্বন করিয়া, আদর্শ সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে, বিশেষ ফললাভ হইবে না

৪। আমরা এক্ষণে যে সমাজতত্ত্ব ও সমাজের আদর্শ স্থির করিতে প্র হইয়াছি, তাহাতে কিরূপ যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা এ বিষয়ের সা কি, উল্লিখিত কথা হইতে আমরা তাহার আভাষ পাইয়াছি। এক্ষণে তাহা আর বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দুই পথ বা দুই উপা এক জ্ঞান-পথ, আর এক প্রত্যক্ষ-অনুসারী যুক্তি-পথ। জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ সকল সত্য লাভ হয়, বা যে তত্ত্ব-দর্শন হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণ বি সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি—তাহাই জ্ঞান-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a prio* বা *deductive* method বলে। ইহার পূর্ণ বিকাশ—যোগ-পথ, inspiratio বা illumination পথ, অথবা absolute reason পথ। ইহাই জ্ঞান-পথ। কেবল প্রমাণ অবলম্বনে দর্শনের সহায়ে যে প্রজ্ঞাজ্ঞান লাভ হয়, তাহা সাধা বিজ্ঞান পথ। এ উভয়ই জ্ঞান-পথ। আর প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার অনুসন্ধা করিয়া, বিশেষ সত্য সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে আমরা যে সাধারণ সত্যে উপনী হইতে পারি, তাহাই সাধারণ যুক্তি-পথ। ইংরাজীতে ইহাকে *a posteriori*, *inductive*, কি *synthetic* method* বলে। অধিকাংশ আধুনিক পাশ্চা

---

* "তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।"
পাতঞ্জল দর্শন, ৩। ৫।

পণ্ডিতগণের মতে এই শেষ পথই প্রকৃত পথ, তাহাই বৈজ্ঞানিক পথ। তাহারই ফলে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের এত অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে, মানুষ প্রাকৃতশক্তি ও জড়কে এরূপ বশীভূত করিয়া উন্নতির পথে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু সত্য আবিষ্কার কল্পে, আমাদের এ উভয় পথই যথাসম্ভব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেবল জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমবিহীন হয় নাই। কেন না তাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবিহীন ও সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সমাজ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও ভ্রমশূন্য হয় নাই। আজকাল শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ, অতীত ও বর্ত্তমানের নানাদেশীয় নানাপ্রকার সভ্য ও অসভ্য সমাজের অবস্থা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, সমাজের বৃদ্ধি ক্ষয় উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বিষয়ে, নানা সামাজিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায় কেহই আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ জন্য—প্রকৃত আদর্শ সমাজতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, উপরোক্ত উভয় পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানপথ অবলম্বন করিতে হইলে, কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবলে পূর্ণ বিকাশিত অজ্ঞানমুক্ত, যাঁহারা আপ্ত ঋষি, যাঁহারা প্রজ্ঞার আলোক লাভ করিয়াছিলেন, বলিয়াছি, তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, এস্থলে সমাজ ও তাহার প্রকৃত আদর্শের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যদি আমাদের এই প্রকৃত জ্ঞানপথ ও যুক্তিপথ—এ উভয় পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে এই আলোচনা অতিবিস্তার দোষে দূষিত হইবে। আর সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার অবসর এস্থলে নাই। কাজেই বিভিন্ন সমাজের অবস্থা গতি ও পরিণাম সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে তত্ত্ব আবিষ্কারের যথোচিত সুবিধা ও অবসর এস্থলে পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য আমরা প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তি-পথের আভাষ মাত্র দিয়া, প্রায়শঃই জ্ঞান-পথ অবলম্বন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৫। আমরা বলিয়াছি যে, আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষরূপে সমাজ বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি সমাজ বিজ্ঞানের এখনও

সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয় নাই। সমাজ বিজ্ঞান বড় কঠিন শাস্ত্র। ইহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে, উল্লিখিত জ্ঞান-পথ ও যুক্তি-পথ—উভয় পথ অবলম্বন করিয়া সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, ইহার আনুসঙ্গিক শাস্ত্রও অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিতে হয়। বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যেমন বেদাঙ্গ শাস্ত্র প্রথমে আয়ত্ব করিতে হয়, তেমনই সমাজ বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহার আনুসঙ্গিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, বিভিন্নরূপ সভ্যতার ইতিহাস, বিভিন্ন সমাজের বিবরণ, (Discriptive Sociology) সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইলে, তাহাই সমাজতত্ত্ব লাভের প্রধান উপকরণ। ধর্ম্মনীতি (Moral Philosophy), রাজনীতি (Polity বা Science of Government), ব্যবহার শাস্ত্র (Jurisprudence), এ সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক শাস্ত্র। অর্থনীতি (Political Economy) সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রই সমাজ বিজ্ঞানের মূল। ধর্ম্মের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই সমাজের জীবনীশক্তি, সমাজের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। আমরা পরে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মশাস্ত্র না বুঝিলে সমাজতত্ত্ব প্রকৃত রূপে বুঝা যায় না।

আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বেদের কল্পসূত্র মধ্যে গৃহ্যসূত্র সমাজ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সূত্রিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের আশ্বালায়ণ ও সাংখ্যায়ণ গৃহ্যসূত্র, সামবেদের শাণ্ডিল্য গৃহ্যসূত্র, যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত মনু, বৌধায়ণ, আপস্তম্ব, ভরদ্বাজ, কাত্যায়ণ প্রভৃতি উক্ত গৃহ্যসূত্র, অথর্ব্ব বেদের কৌষিক ও আথর্ব্ব গৃহ্যসূত্র—এবং এই সকল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য টীকা পদ্ধতি পরিশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। ইহার পর মনু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত বিভিন্ন স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও অনেক উপস্মৃতি আমাদের সমাজ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারি। স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়নের পরেও কত স্মার্ত্তপণ্ডিত কত স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত রঘুনন্দন সেই সকলের সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের পুরাণ ইতিহাসে সমাজ বিষয়ক অনেক তত্ত্বের আলোচনা আছে। আমাদের অনেক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে সে

কালের সমাজের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। যাহা হউক সমাজ বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে উল্লিখিত সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়।

৬। এই বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং এই আলোচনায় আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না। আশা করি, সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাদের এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা জ্ঞানার্থী, আদর্শ সমাজতত্ত্ব চিন্তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের অন্য অধিকার নাই। আমরা জ্ঞানী নহি—আদর্শ সমাজ বিজ্ঞানের পুরোহিত হইয়া, সে তত্ত্ব সাধারণে প্রচার করিবার শক্তি সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের নাই। আমরা সমাজনেতা নহি, চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইবার অধিকার আমাদের নাই। অনধিকারী আমরা, আমাদের সামান্য মলাবৃত অন্তরে, ভগবানের যে জ্ঞানালোক অস্ফুটরূপে প্রতিভাত বা প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত জ্ঞানীগণের পদাঙ্ক ধরিয়া, সমাজ-নেতৃগণকে নমস্কার পূর্ব্বক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সামান্য চিন্তার ফল এ স্থলে প্রকাশ করিবার সাহস করিয়াছি। যদি এই আলোচনা দ্বারা কাহারও সামান্য উপকার সংসাধিত হয়, তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

সমাজ ও তাহার আদর্শ।

প্রথম অধ্যায়।

সমাজ কাহাকে বলে?

১। এক্ষণে সমাজ কাহাকে বলে, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ কাহাকে বলে, তাহার অপরিস্ফুট ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু তাহার পরিষ্কার পরিস্ফুট সম্যক্ ধারণা করা, সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়া তাহার সংজ্ঞা বা লক্ষণা স্থির করা, আমাদের এস্থলে প্রথমেই কর্ত্তব্য। সমাজের ইংরাজী কথা সোসাইটী (society)। এই সমাজ ও সোসাইটী চলিত কথায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে রয়েল্ সোসাইটী, এসিয়াটিক্ সোসাইটী, পশুক্লেশ নিবারিণী সোসাইটী, স্কুলবুক্ সোসাইটী, খ্রীষ্টান সোসাইটি, লণ্ডন সোসাইটী, মানব সোসাইটী প্রভৃতি স্থলে সোসাইটী নানারূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও সেইরূপ সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, সঙ্গীত সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, কলিকাতা সমাজ, হিন্দু সমাজ, মনুষ্য সমাজ,—এইরূপ স্থলে সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একাধিক ব্যক্তি, কোন বিশেষ কারণে, বা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, বা কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একত্র সম্মিলিত হইলে, যে সভা সমিতি বা সমাজ সংগঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক—আংশিক সমাজ। ব্যবসায় বা কৃষি কি শিল্পের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, যে কোম্পানি যৌথকারবার

বা সম্ভূয়সমুত্থান সংস্থাপিত হয়, এরূপ সম্মিলনকে—এরূপ কোন বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য মানব সম্প্রদায় মধ্যে দুই বা ততোধিক লোকের বিশেষ বা নৈমিত্তিক সংযোগকে সমাজ বলা যায় না। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধির জন্য, বা সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার জন্য, জ্ঞানার্জ্জন বা আত্মোন্নতির জন্য, পরস্পরের রক্ষণ পোষণ বা উন্নতির জন্য, যে একাধিক ব্যক্তির নৈমিত্তিক বা আংশিক সম্মিলন—তাহাকে বরং সমাজ নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। এ সকলই প্রকৃত সমাজের বিভিন্ন অংশ মাত্র।

২। এইরূপে আমরা সাধারণতঃ বড় সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সমাজ' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের দেশে 'সমাজ' আর একরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার প্রচলিত আছে, আমরা প্রায়ই তাহাদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। আমরা গ্রামস্থ সমাজ বলি। কোন এক বা একাধিক গ্রামে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বাস করেন, ক্রিয়া কর্ম্মে একত্র আহার ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এক সমাজভুক্ত বলি। কোন ক্রিয়া কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, সেই সমাজস্থ বা দলস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই রূপে যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এক সমাজ-ভুক্ত মনে করি। এই সমাজ মধ্যে যদি কেহ যথেচ্ছাচার করে, সমাজকে উপেক্ষা করে, বা সমাজের রীতি নীতির অবহেলা করে, তবে সমাজের প্রধান লোকে তাহাকে সমাজচ্যুত বা 'এক ঘরে' করেন—তাহার সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করেন। যে দোষে রাজা দণ্ড দেন না, বা দণ্ড দিতে পারেন না, যে দোষ দণ্ডবিধির শাসনের আয়ত্ত নহে, ধর্ম্মশাসন দ্বারা যাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না, উপেক্ষা ঘৃণা অপমান প্রভৃতি দ্বারা সমাজ সে দোষের শাসন করেন।

এইরূপে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার প্রভৃতি প্রত্যেক 'জাতি' বিভিন্ন ক্ষুদ্র গ্রামসমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু, এবং গতায়াতের অসুবিধা স্থলে পরস্পর মধ্যে সংস্রবের অভাব হেতু, এই সকল সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন হইয়া পড়ে। আবার এইরূপ বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ মধ্যে যে সমাজের দলপতি অধিক প্রতিপত্তিশালী হন, যে সমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়, অন্য নিকটস্থ সমাজ তাহার অনুকরণ করে, তাহার অনুশাসনে পরিচালিত হয়, ও ক্রমে সেই সমাজের

অন্তর্ভূ´ত হইয়া পড়ে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এইরূপে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নবদ্বীপ সমাজ বা বিক্রমপুর সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এবং অন্য ক্ষুদ্র সমাজ সেই সমাজের অন্তর্ভূ´ত হইয়াছিল। অন্য দিকে দেশভেদে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, ও কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ-গণ এইরূপ বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল সমাজ আরও ক্ষুদ্রতর সমাজে বিভক্ত হইয়াছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণ যশোহর চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি চারি প্রধান সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ মাইনগর প্রভৃতি ছয় সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন কালে, এ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম বাসের জন্য ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ছাপ্পান্ন গাঁই বা ছাপ্পান্ন বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন সমাজের ধারণা করি। সমাজের এইরূপ সংকীর্ণ ধারণা স্থলে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ফুলিয়া ব্রাহ্মণ খড়দহের ব্রাহ্মণের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সহিত, কি কামার কুমারের সহিত, কি অনাচরণীয় কোন শূদ্রের সহিত, কি অন্য কোন 'জাতির' সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করিতে পারেন না। আর যে দেশে এরূপ 'জাতিভেদ' নাই, সে দেশেও সমাজের ধারণা সাধারণতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণ। ইউ-রোপেও সোসাইটীর প্রচলিত ধারণা অনেক স্থলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ। সেখানেও এক গ্রামে বা একদেশে যে সকল লোক একত্র আহার ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের এক সোসাইটীভুক্ত মনে করে। যাহাদের সহিত আহার ব্যবহার সংশ্রব নাই, তাহাদের সহিত তাহারা আপনাদিগকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না, তাহাদের সহিত কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকা ধারণা করে না। অনেক স্থলে বড়লোক ইতরলোকের সহিত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না। তাহাদের সহিত অনেক স্থলে আহার ব্যবহার পর্য্যন্ত করে না। এরূপ স্থলেও সমাজ বা সোসাইটীর ধারণা বড় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সমাজের প্রকৃত অর্থ এত সঙ্কীর্ণ নহে। কেবল আহার ব্যবহার বা বিবাহের সংশ্রব হইতেই 'সমাজ' হয় না।

৩। এই জন্য আমরা 'সমাজ' কথা ইহা অপেক্ষা আরও প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কখন আমরা এক ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধীন লোকদিগকে

এক সমাজভুক্ত বলি। কখন এক দেশের লোকদের এক স[illegible] [illegible] বলি। কখন এক রাজার অধীন লোকদের এক সমাজভুক্ত মনে করি। [illegible] যাহাদের মাতৃভাষা এক, তাহাদের এক সমাজভুক্ত ধারণা করি। কখন[illegible] জাতি'কে এক সমাজভুক্ত বলি। ইংরাজিতে যাহাকে 'জাতি' (nation) [illegible] আমরা অনেক সময় সমাজকে সেই অর্থে গ্রহণ করি। এইরূপে 'সমাজ' আমরা [illegible] প্রশস্ত অর্থে বুঝিয়া থাকি। গত্যর্থক 'অজ' ধাতু হইতে 'সমাজ'। 'এক[illegible] গমন' হইতে সমাজ। যে সকল লোক একত্র সম্মিলিত হইয়া জীবনযাত্রা নি[illegible] করে, সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, যাহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপ [illegible]শেষ সংশ্রব আছে, যাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া কার্য্য করিলে, পরস্পরের জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না, যাহারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া সকলে একত্র হইয়া সেই লক্ষ্য অভিমুখে গন্তব্য পথে পরস্পরের সহায়ে গমন করে, তাহারাই এক সমাজের অন্তর্গত। এইরূপে পরস্পর সম্বন্ধ বা একত্র হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হইতেই সমাজ।

আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের পোষণ রক্ষণ ও বর্দ্ধনের প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের শরীর পোষণের জন্য অন্নের প্রয়োজন, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বস্ত্র প্রভৃতি কত কি দ্রব্যের প্রয়োজন, বহিঃ ও অন্তঃ শত্রু হইতে আমাদের রক্ষার প্রয়োজন, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজ[illegible]ন, আত্মোন্নতির জন্য জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। আমরা প্রত্যে[illegible] যদি অপরের সাহায্য বিনা এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারিতাম, ত[illegible] হইলে সমাজের প্রয়োজন হইত না—সমাজ থাকিত না। কিন্তু আমরা পরস্[illegible] সম্মিলিত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করি। আমাদের মধ্যে কেহ সকলের অন্ন সংগ্রহের জন্য চাষ করি, কেহ গবাদি পশু পালন করি, কেহ বস্ত্র বয়ন করি, কেহ অস্ত্র প্রস্তুত করি, কেহ সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করি। আমি মসীজীবী কায়স্থ। কৃষক চাষ না করিলে আমার অন্ন সংস্থান হইবে না। বণিক সে অন্ন আমার কাছে আনিয়া না দিলে আমার অন্ন সংগ্রহ হইবে না। তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া না দিলে আমার শীত বা লজ্জা নিবারণ হইবে না। তেলি তৈল প্রস্তুত করিয়া না দিলে আমার ব্যঞ্জন তৈলহীন বিস্বাদ হইবে। কুমার হাঁড়ি গড়িয়া না দিলে আমার রন্ধন বন্ধ হইবে। রাজা ও রাজসৈন্য আমায় রক্ষা না করিলে

আমার জীবন রক্ষা দুরূহ হইবে। ব্রাহ্মণ বা শিক্ষক আমায় জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ না দিলে আমার উন্নতি হইবে না, আমি ক্রমে পশু, হইয়া যাইব। অতএব আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমার এ সকলের সহিতই সংস্রবের প্রয়োজন। আমাদের এ সকলকেই 'এক সঙ্গে গমন' বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এইরূপে এক রাজার অধীনে, এক ধর্ম্মের শাসনে, এক দেশের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—বা তদনুরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন, বা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকারী লোক সকল সম্মিলিত হইয়া এক সমাজভুক্ত থাকে। কর্ম্ম বিভাগ হেতু বা অন্য কারণে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকও এক সমাজভুক্ত হইতে পারে। সেই হিসাবে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানকে এক সমাজভুক্ত বলা যায়।

তবে ইহার মধ্যে কথা আছে। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ হইতেই মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয়, ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া "একত্র গমন" বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধের বিকাশ ও পরিণতি হইতে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি হয়। আমরা এ কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমার সহিত যাহার যত সম্বন্ধ অধিক, যত সংস্রব অধিক, তাহার সহিত আমার সমাজ বন্ধন তত অধিক দৃঢ়। যাহার সহিত আমার সংস্রব বা সম্বন্ধ অপরিহার্য্য, তাহার সহিত আমার সমাজ সম্বন্ধ নিত্য। এই সকল সম্বন্ধের সংখ্যা বা দৃঢ়তার তারতম্য অনুসারে, সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সমাজের প্রসর বা পরিধি যত অল্প হয়, তত সমাজ বন্ধন দৃঢ় হয়, সামাজিক সম্বন্ধের পরিমাণও অধিক থাকে। সমাজ পরিধির যত বিস্তার হয়, সমাজ বন্ধন তত শিথিল হইয়া পড়ে, সামাজিক সম্বন্ধেরও তত হ্রাস হয়। কেন্দ্র হইতে সমাজ পরিধির দূরতা অনুসারে, সমাজিক সম্বন্ধের ও তাহার দৃঢ়তা ও পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্থানেই আহার ব্যবহার প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই জন্য এই আহার ব্যবহার সম্বন্ধকে আমরা অনেক সময় সমাজের মূলসূত্র মনে করি। কিন্তু সমাজের এরূপ ধারণা সঙ্কীর্ণ তাহা বলিয়াছি।

৪। আমরা মানব সমাজের কথা বলিতেছি। কিন্তু শুধু যে মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয় তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর ইতর জীব মধ্যেও সমাজের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষে আছে, "পশুনাং সমজঃ অন্যেষাং সমাজঃ।" অর্থাৎ

পশুদের সমাজের আভাষকে 'সমজ' বলে, কেবল মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সম্মিলনকেই 'সমাজ' বলে। পশু মধ্যে পিপিলিকা, মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি অনেক জীব এরূপ 'সমজ' সম্বদ্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাক প্রভৃতি পক্ষিদের মধ্যে সহানুভূতি বা সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পশু দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অনেক পশুপক্ষিদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। সে যাহা হউক ইতর জীবসমাজ ও মানবসমাজ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইতরজীব সহজ জ্ঞান পরিচালিত। তাহাদের সমাজের উন্নতি অবনতি বা পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানুষের উন্নতির সহিত মানব সমাজের উন্নতি হয়। অথবা সমাজের উন্নতির সহিত মানুষের উন্নতি হয়। মানব সমাজ ক্রমবিকাশশীল—পরিবর্ত্তনশীল।

৫। আমরা বুঝিয়াছি যে মানুষ সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ থাকে। নানাভাবে ও নানা কারণে মানুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে যে নিত্যসম্বদ্ধ লোকসংগ্রহ তাহাই সমাজ, একথা বলিয়াছি। এই সম্বন্ধ মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপ্রণোদিত, কতকগুলি সম্বন্ধ নিঃস্বার্থ বা পরার্থবৃত্তিজনিত। তবে আমরা সমাজ মধ্যে নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তিজনিত সম্বন্ধ, পরস্পর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ভাব প্রধানতঃ দেখিতে পাই। মানুষ প্রথমে, অসভ্য অবস্থায়, হয়ত পরস্পর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, কিম্বা তাহারা কোন এক বিশেষ শক্তিশালী নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজ প্রথমে যেরূপেই সম্বদ্ধ হউক, সমাজ সম্বদ্ধ হইলে পরে, ক্রমে মানুষের স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হয়। ক্রমে এই নিঃস্বার্থ অথবা পরার্থপ্রবৃত্তিজনিত আকর্ষণ বলে মানুষ পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া একীভূত হইলে সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়। তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। তখনই সমাজ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই পরার্থবৃত্তিকে, এই নিঃস্বার্থ আকর্ষণকে আমরা সমাজের মূলসূত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। আমরা যখন কোন লোককে অসামাজিক (unsocial) বলি, তখন বুঝি যে, সে লোক তত মিশুক নহে, যেন পরের জন্য তাহার সহানুভূতি নাই, যেন

সে পরের সুখে সুখী পরের দুঃখে দুঃখী হইতে জানে না, যেন সে পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। সে আপনাকে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। অতএব এই পরস্পর 'মিলা মিশা' ভাব হইতে, এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত (organised) সুবিভক্ত সংমিশ্রণ হইতে আমরা সামাজিকতার ভাব ও সমাজের স্বরূপ বুঝিতে পারি।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিঃস্বার্থ স্বাভাবিক আকর্ষণই সমাজের মূল। জড় জগতের ন্যায় জীব জগতেও আমরা দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। এক আকর্ষণ—আর এক বিক্ষেপ বা অপসারণ। আমাদের ভালবাসা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি আছে। তাহা দ্বারা আমরা পরকে আকর্ষণ করি, পরকে আপনার করিতে পারি, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সাধনা-দলে এক হইয়া যাইতে পারি। সেইরূপ আমাদের দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, ক্রোধ, স্বার্থ প্রভৃতি বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা আমরা পরকে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলিয়াছি যে, উল্লিখিত আকর্ষণজনিত সম্বন্ধ হইতেই সমাজ। এই আকর্ষণ জন্য সমাজের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় মধ্যে একত্বের ভাব থাকে। বহুত্ব মধ্যে এই একত্বের ভাব—এই আকর্ষণজনিত বন্ধন হইতেই সমাজ।

৬। এই সমাজ সংগঠন কৃত্রিম নহে। ইহার সংগঠন বা বিনাশ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ বাধ্য হইয়া, স্বাভাবিক নিয়মবশে, স্বাভাবিক পরার্থপ্রবৃত্তি বলে, অথবা প্রকৃতিপ্রণোদিত স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় সমাজসম্বদ্ধ হয়। যে আকর্ষণশক্তি বলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়, তাহাকে 'সমাজশক্তি' বা সমাজের 'জীবনীশক্তি' বলা যাইতে পারে। জড় আকর্ষণশক্তি বলে, এক জড়াণু অন্য জড়াণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া, জড় জগতের উৎপত্তি হয়। জৈব শক্তির আকর্ষণ বলে, প্রথমে কতকগুলি বিরোধী বা বিক্ষেপশক্তিসম্পন্ন পরমাণু-পুঞ্জ তাহাদের জড়শক্তিকে সংযত ও অভিভূত করিয়া, জীবাণুর বা জীবকোষের উৎপত্তি করে। সেইরূপ উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, এক জীবাণু অন্য জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিজ শক্তিকে অভিভূত করিয়া উন্নত জীবদেহ সংগঠিত করে, জীব জগতের পুষ্টি ও পরিণতি করে। মানুষও সেইরূপ উচ্চতর সমাজ-শক্তি বলে নিজ স্বার্থকে অভিভূত করিয়া সমাজসম্বদ্ধ হয়। পরমাণু মধ্যে বা

জীবাণু মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ আপাত-দৃষ্টিতে স্বার্থপ্রণোদিত (১), স্বশক্তি বলে তাহাদের নিজ সুবিধার জন্য অভিব্যক্ত মনে হয়। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে, সেই আকর্ষণ তাহাদের স্বায়ত্ত নহে, উচ্চতর প্রাকৃতশক্তি বলে তাহারা বাধ্য হইয়া পরস্পর আকৃষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায়। তেমনই মানুষও যে আপাততঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পর আকৃষ্ট হয় মনে করে, সেই আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক, তাহা মানুষের নিজ আয়ত্ব নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির নিয়মে তাহা সংসাধিত হয়। এ কথা আমরা পরে আরও বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে এ স্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, স্নেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, আমাদের নিজ চেষ্টায় বা জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের উৎপত্তি হয় না। তবে আমরা জ্ঞানবলে, ও অভ্যাস বা সাধনা দ্বারা, তাহাদের উন্নতি করিতে পারি। মমতাময়ী প্রকৃতি বাধ্য করায়, জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব জীবান্তরকে আকর্ষণ করে, মানুষ অন্য মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষ অনেক সময় স্বার্থ ভুলিয়া আপনাহারা হইয়া পরের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই মানুষে মানুষে আকর্ষণ—এই সমাজশক্তিও সেই প্রাকৃত জড় আকর্ষণশক্তিরই শেষ ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যেমন জৈবশক্তি বিভিন্ন জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চতর জীবদেহ সংগঠিত করে, তেমনই সমাজশক্তিও বিভিন্ন মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, একীভূত করিয়া দিয়া সমাজদেহ সংগঠিত করে।

৭। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীরের আভাষ দিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ এই সমাজশরীরের কথা ও তাহার দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা যথা-স্থানে উল্লিখিত হইবে। এই সমাজশরীরের কথা,—জীবশরীরের ন্যায় সমাজ-শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ নহে, সকল অঙ্গের সমান প্রয়োজন, একের কর্ম্ম বন্ধ হইলে সমস্ত শরীরের হানি হয়,—এই বৈদিককাল হইতে প্রচলিত উপা-খ্যানের (২) উল্লেখ করিয়া, পুরাকালে কোন প্রসিদ্ধ বক্তা, 'শ্রেষ্ঠ' ও 'ইতর' লোকের মধ্যে (পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে) বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন,

(১) জর্ম্মান দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সপেনহর তাঁহার 'World as Will and Idea' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মানুষে যে শক্তি ইচ্ছা বা বাসনারূপে বিকাশিত, তাহাই জড়ে জড়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত। জড়ও অব্যক্ত বাসনা চালিত।

(২) ইসপের এই গল্প ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে আছে।

ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন য়ুনানী পণ্ডিত প্লেটো (১) সক্রেটিস্ এই সমাজশরীরের আভাষ দিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীর স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সমাজশরীরের কথা বলিয়াছেন (২)। ফরাসি দার্শনিক কোমৃত্, এই সমাজশরীর স্বীকার না করিলেও, তিনি প্রথমে সমাজের প্রকৃত অর্থ ধারণা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, জাতীয়তা অপেক্ষা সামাজিকতা রূপ আরও উচ্চ ভূমিতে মানবের মধ্যে একত্ব সংস্থাপনের উপায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই ইউরোপে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ এই সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমাজশরীর স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর (৩) ডিউক্ অব আর-

---

(২) প্লেটো বলিয়াছেন,—"The states are as men are : they grow out of human character."

(২) হব্‌স্ বলিয়াছেন,—"For by art is created that great leviathan called a commonwealth, or state,...which is but an artificial man : though of great stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended : and in which the sovereignty is an artificial soul..........."

এই সকল স্থলে সমাজ ও state প্রায় একার্থবাচক।

(৩) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর ঠিক সমাজ শরীর স্বীকার করেন নাই। কেন না তিনি জীবশরীর ও সমাজশরীর মধ্যে স্বাধর্ম্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্য অধিক দেখিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

" * * There exist no analogies between the body politic and a living body, save those necessitated by that mutual dependence of parts which they display in common. * * The social organism discrete instead of concrete, assymmetrical instead of symmetrical, sensitive in all its units instead of having a single sensitive centre, is not comparable to any particular type of individual organism animal or vegital.

Principles of Sociology. Vol. I. P. 580.

হার্বার্ট স্পেন্সার যে শ্রেণীর দার্শনিক, তাঁহারা ঠিক সমাজশরীর স্বীকার করিতে পারেন না, কেন না তাঁহারা সমাজাত্মা মানেন না। তথাপি যে হার্বার্ট স্পেন্সর এতটুকু স্বীকার করিয়াছেন, সেই যথেষ্ট।

গাইল (১) প্রভৃতি সমাজকে Organism বা Super-organic structure বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিতগণ আর এক্ষণে সমাজের সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সমাজের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার মূলতত্ত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজশরীর স্বীকার করিয়া, সমাজ যে কেবল নাম, সামান্য ভাব (abstract idea) বা কল্পনা নহে, সমাজরূপ মানব সংহতির যে স্বতন্ত্র সত্বা আছে, তাহার যে জীবনীশক্তি আছে, ইহা ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই সমাজশরীরতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

---

(১) "Reign of Law" গ্রন্থের প্রণেতা ডিউক্ অব্ আরগাইল (Duke of Argyle) এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"Human society is indeed in the nature of an organism, in which all the several active parts have a definite function to discharge, and that the healthful condition of the whole depends on the healthful condition and working of the separate and constituent structures."

Ninteenth Century. Nov. 1894.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০৩৩*৩৩০—

সমাজশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্য তদন্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টি নহে,—সমাজ চুক্তিমূলক নহে।

৮। আমরা পূর্ব্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। এই সমাজশরীর বুঝিতে হইলে সমাজ কাহার শরীর তাহা জানিতে হইবে। সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা সমাজাত্মার কথা বুঝিতে হইবে। সমাজের সহিত ব্যক্তিমানবের সম্বন্ধ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। যে মহাশক্তি বলে সমাজ সম্বদ্ধ হয়, তাহার তত্ত্ব আমাদের প্রথমে ধারণা করিতে হইবে। আমরা শরীরের শাস্ত্রসম্মত লক্ষণা হইতে জানিতে পারি যে, পরার্থ সংহতি জন্য—শরীর, (১) আত্মার চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়—শরীর, (২) চেতনাধিষ্ঠিত পঞ্চভূতবিকারাত্মক—শরীর, (৩) চেতনাধিষ্ঠিত, পঞ্চভূতবিবৰ্দ্ধিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত—শরীর। (৪) অতএব শরীর যন্ত্র,—চৈতন্য তাহার অধিষ্ঠাতা। শরীর চৈতন্য

(১) "সংহত পরার্থত্বাৎ।"—সাংখ্যসূত্র। ১। ১৪০।

(২) "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং।"—ন্যায় দর্শন। ১। ১১।

(৩) "তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকার সমুদয়াত্মকং।"—চরক সংহিতা।

(৪) "শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তঞ্চ চেতনাবস্থিতং............স যদা হস্তপদ............অঙ্গৈরূপেতাস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।"—

সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান। ৫। ২।

জন্যই সংহত, চৈতন্যের চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্বরূপ, পঞ্চভূত বা জড় জগতের উপাদানে সৃষ্ট, বিভিন্ন অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট কার্য্য জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত। স্থাবর জঙ্গম সকল জীবশরীর সম্বন্ধেই এই কথা। মায়াবদ্ধ চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জন্য, সুপ্তাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিয়া পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিবার জন্য, জীবাত্মা বা পুরুষ শরীর গ্রহণ করে, এবং শরীরের ক্রমবিকাশ দ্বারা, নিম্ন জাতীয় জীবশরীর হইতে ক্রমশঃ আপূরণে উচ্চ জাতীয় জীবশরীর লাভ দ্বারা, উন্নতির পথে মুক্তির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে (১) জীব, নিজ ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুযায়ী ভবিতব্য অনুসারে, প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে, প্রকৃতির অনুগ্রহে, নিজ প্রয়োজনোপযোগী শরীর, পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে পঞ্চভূতাত্মক জড় জগত হইতে লাভ করে। অতএব শরীর বুঝিতে হইলে, তদধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের কথা, শরীরের উপাদানের কথা, যে শক্তি বলে এই সকল উপাদান একীভূত হইয়া শরীর সংগঠন করে—তাহার কথা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহার কার্য্য বিভাগের কথা বুঝিতে হয়। বিবর্ত্তন নিয়মে কিরূপে শরীরের ক্রমপরিণতি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হয়। সমাজশরীর সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা যদি স্বাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিয়া, উপমান প্রমাণ বলে, সাধারণ শরীরের সহিত তুলনা করিয়া সমাজশরীর স্বীকার করি, তবে সেই সমাজশরীর চৈতন্যাধিষ্ঠিত, চৈতন্য জন্যই সমাজশরীর সংহত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সেই চৈতন্য নিজ শক্তি বলে, ব্যষ্টি মানবগণকে সংহত করিয়া—সমষ্টি করিয়া, আপন প্রয়োজন উপযোগী শরীর সংগঠন করিয়া লয়। সুতরাং সমাজশরীর বুঝিতে হইলে, এই সমাজশরীরাধিষ্টিত আত্মা কি, মানুষ কোন্ শক্তি বলে ও কিরূপে সম্মিলিত হইয়া সমাজশরীর সংগঠন করে, সমাজশরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের কার্য্যবিভাগ কিরূপ, বিবর্ত্তন নিয়মে সমাজের কিরূপ পরিণতি হয়, এ সকল আমাদের বুঝিতে হইবে। সমাজশরীরাধিষ্ঠিত সেই চৈতন্য কি—কে এই মানব সমাজাত্মা, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজশরীর কাহার জন্য সংহত, তাহা বুঝিয়া দেখিব।

---

(১) "অসর্ব্বগতা ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিমানুষদেবেষু সঞ্চরতি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তম্।......পঞ্চমহাভূতশরীরসমবায়ঃ পুরুষ ইতি।"

সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান। ১। ১৭।

৯। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যসমষ্টিই সমাজচৈতন্য, তাহাই সমাজাত্মা। তাঁহাদের মতে, সমাজস্থ প্রত্যেক মানবের জন্যই সে সমাজ। সমাজ তদন্তর্গত মনুষ্যের জন্যই সংহত। সমাজ মানবাতিরিক্ত কাহারও জন্য সংহত হইতে পারে না। অতএব সমাজশরীর স্বীকার করিলে, তদন্তর্গত মানবের চৈতন্যসমষ্টিই যে সেই সমাজচৈতন্য, এ কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষ পরস্পরের সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয়। পরস্পরের উন্নতির জন্য, সুখের জন্য একপে সম্মিলিত হয়। অসভ্য মানুষ স্বাভাবিক নগ্নাবস্থায় পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে, যেরূপ যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে, পরস্পর সমাজবদ্ধ হইলে, সে তাহার সেই পূর্ব্ব স্বাধীনতা, সেই স্বেচ্ছাচারিতা সঙ্কীর্ণ করিতে বাধ্য হয় সত্য। কিন্তু মানুষ আদিম অবস্থায় যে পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করে, যে পরিমাণ কষ্ট পায়, অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির সহিত ও অন্য নিকটস্থ ব্যক্তির সহিত তাহাকে যেরূপ সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়, যেরূপ সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিতে হয়, তাহা পরিহার জন্য, মানুষ স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিয়াও পরস্পর মিলিত হয়, কিম্বা কোন শক্তিশালী লোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া লয়। অথবা তাহারা আদিম অসভ্য অবস্থায়, স্বাভাবিক সরলতাময় সহানুভূতি হেতু এবং সামাজিক বা পরার্থবৃত্তিবশে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য পরস্পর অস্পষ্ট অঙ্গীকার-মূলে সমাজবদ্ধ হয়। এজন্য এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, সমাজের মূল—পরস্পরের মধ্যে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা। মানুষ একরূপ অস্পষ্ট চুক্তিমূলেই সমাজসম্বদ্ধ হয়। মানুষ কেবল নিজের সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের সুখবৃদ্ধির জন্য এরূপ সমাজবদ্ধ হয়। বিলাতী দার্শনিক্ হব্‌স্ (Hobbes) সাহেব এইরূপ মত প্রতিপন্ন করেন। ফরাসী পণ্ডিত রুসো (J. J. Rousseau) তাঁহার Du Contrat Social এবং Emile নামক গ্রন্থে এই মত আরও বিশদরূপে সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সাম্যবাদ ও চুক্তিমূলে সমাজ সৃষ্টিবাদ প্রচারিত হইয়া ফরাসী দেশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার এই সাম্যবাদের আপাত-মনোহর প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যানে জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টও (Kant) বিচলিত হইয়াছিলেন। এজন্য

তিনিও, চুক্তিমূলে সমাজের সৃষ্টি, এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (১) যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিতদের কথা আংশিক সত্য। তখন সমাজশরীরের ধারণা হয় নাই। তাই সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্যের তত্ত্ব, সমাজের প্রকৃত মূলতত্ত্ব তাঁহারা কেহ আলোচনা করেন নাই। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, যে সকল পণ্ডিত কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য বা স্বাভাবিকবৃত্তিবশে চুক্তিমূলে মানবসমাজ প্রথমে সম্বদ্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলিয়াছেন—যাঁহারা এইরূপ অস্পষ্ট সর্ব্বসম্মত চুক্তিকে সমাজের মূলসূত্র ধরিয়াছেন, তাঁহারা অদূরদর্শী। (২) যৌথকারবার

(১) ক্যাণ্টের কথা এই :—

"The art whereby a people constitutes itself into a state, or, we should properly say, that act the idea of which is presupposed in the state as rightfully constituted, is the original contract, by which all members of the people give up their freedom in order to take it up again as members of a commonwealth *i. e.*, of a people regarded as a state. We are not therefore to say, that man in the state has sacrificed a *part* of his innate eternal freedom to secure n end. We are to say that he has surrendered, the whole of his wild and lawless freedom in order to find it all again undiminished in a dependence regulated by law."

Quoted in E. Caird's Critical Philosophy of Kant.
Vol. II. P. 332.

(২) বিলাতী পণ্ডিত কেয়ার্ড, ক্যাণ্টের এই ধারণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"In fact it was an illogical attempt to stretch the individualistic idea, so as to cover a social unity, which is the negation of individualism."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant Vol. II. P. 361.

বিলাতী দার্শনিক মার্টিনো ও এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"The social union is most inadequately represented as a compact or tacit bargain subsisting among separate units, agreeing to combine for specific purposes, and for limited times and then disbanding again to their several isolations. It is no such forensic abstraction.............. ..., but a concrete though spiritual form of life, penetrating and partially constituting all persons belonging to it, so that only as fraction do they become human integers themselves."

J. Martineau on Types of Ethical Theory. Vol. II. P. 403.

বা কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে চুক্তি করিয়া পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেমন কতকগুলি লোক সংহত হয়, সেইরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি (contract) মূলে মানবসমাজ সংহত হইয়াছে, যাঁহারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের মূলতত্ব ঠিক বুঝেন নাই। সমাজ প্রথম সম্বদ্ধ হইবার কথা কেহ জানেন না। তবে অনেকে কোন কোন সমাজের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন বা নূতন করিয়া সংগঠন দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে কোন সমাজ সংগঠিত হইতে কেহ কখন দেখেন নাই। যেমন কেহ প্রথম কোন ভাষাসৃষ্টি দেখেন নাই, অথচ কিরূপে ভাষা সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা নানারূপ অভিমত প্রচলিত আছে,—সেইরূপ প্রথম সমাজসৃষ্টি সম্বন্ধেও নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চুক্তিমূলে সমাজসৃষ্টির কথা, হয় শুধু অনুমান, অথবা আমাদের জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। এরূপ অনুমান বা জ্ঞানের এরূপ ধারণা সকল সময় সঙ্গত হয় না। কেন সঙ্গত হয় না, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। (১)

১০। আমরা জানি যে কেবল আমাদের ইচ্ছায় ও জ্ঞানকৃত চেষ্টায় আমরা আমাদের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না। প্রকৃতি তাহা আমাদের জন্য, আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভ হইতে সংগঠন করেন। তেমনি আমরা প্রথমে আমাদের জ্ঞানকৃত চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির নিয়মে আমরা সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হই। আমরা দেখিয়াছি যে, শুধু স্বার্থের জন্য মানুষ কখন সমাজবদ্ধ হয় না। মানুষ স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সমাজবদ্ধ থাকে। মানুষে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়। মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করে, সমাজের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্য এই পরার্থবৃত্তিকে মানুষের সামাজিক বৃত্তি বলা হইয়া থাকে।

(১) ক্যাণ্টই বলিয়াছেন,—
"that act *the idea of which is presupposed* in the state as rightfully constituted is the original Contract......"

অতএব,— "The social Contract is no fact of History, but an idea of Reason......"

Caird's Kant vol. II. P. 332.

সুতরাং প্রত্যেক মানবের জন্য সমাজ, একথা যেমন আংশিক সত্য,—তেমনই সমাজের জন্য মানুষ, একথা ততোধিক সত্য।

আমরা পূর্ব্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়াছি। আধুনিক জীববিজ্ঞানের (Biology) সিদ্ধান্ত অনুসারে, জীবশরীর সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু বা জীবকোষ দ্বারা জীবশরীর সংগঠিত হয়। কিন্তু জীবশরীর সেই সকল জীবকোষের জন্য সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক জীবাণু তাহার অণুচৈতন্যকে অভিভূত করিয়া শরীরাধিষ্টিত এক চৈতন্য জন্য সংহত হয়। এই চৈতন্য ঠিক দেহস্থ জীবাণুর চৈতন্যের সমষ্টি নহে। অতএব সমাজ যদি তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সংহত হয়, যদি সমাজশরীরাধিষ্টিত চৈতন্য সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি হয়, তবে সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। (১) তাহা হইলে সমাজশরীর বলা ঠিক সঙ্গত হয় না। কেন না, তাহা হইলে, সমাজের সহিত জীবদেহের সাধর্ম্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্য অধিক হইবে। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বিষয়ে জীবশরীরের সহিত সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য নাই। জীবশরীরের সহিত, সেই শরীরান্তর্গত জীবাণুর যে

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Hence, then, a cardinal difference in the two kinds of organisms. In the one, consciousness is concentrated in a small part of the aggregate. In the other, it is diffused throughout the aggregate. All the units possess the capacities for happiness and misery, if not in equal degrees, still in degrees that approximate. As, then there is no social sensorium, the welfare of the aggregate, considered apart from that of the units, is not an end to be sought. The society exists for the benefit of its members; not its members for the benefit of the society. It has ever to be remembered that great as may be the efforts made for the prosperity of the body politic, yet the claims of the body politic are nothing in themselves, and become something only in so far as they embody the claims of its component individuals."

Principles of Sociology, Vol. I, P. 449.

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর জড়বাদী—তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত, তাহা আমরা এ স্থলে ইঙ্গিত করিয়াছি।

সম্বন্ধ, সমাজশরীরের সহিত সেই সমাজান্তর্গত প্রত্যেক মানুষেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কতকগুলি জীবাণুর সমষ্টিতে জীবশরীর, আর কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিতে সমাজশরীর। জীবশরীরস্থ জীবাণু যেমন তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া, জীবশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্যের জন্য সংহত হয়, সমাজশরীরস্থ ব্যক্তিগণও তেমনই তাহাদের স্বার্থ সংযত করিয়া সমাজশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্য জন্য সংহত হয়। যেমন জীবশরীর মধ্যে প্রত্যেক জীবাণু বা জীবকোষ, জীবভুক্ত খাদ্যের সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, অন্য জীবকোষ উৎপাদন দ্বারা ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, ও সেই সঙ্গে জীবশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে, যেমন জীবশরীরস্থ জীবাণু এইরূপে আপনার পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবশরীরেরই পুষ্টি করিয়া থাকে, সমাজশরীরান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইরূপে সমাজের দ্বারা বিকাশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অঙ্গীভূত থাকিয়া সমাজেরই পুষ্টি করে। যেমন জীবশরীরস্থ জীবাণুর বা জীবকোষের অনুচৈতন্যের সমষ্টি জীবচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত, সেইরূপ সমাজশরীরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি সমাজচৈতন্য বা সমাজাত্মা হইতে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত। যেমন জীবশরীরস্থ চৈতন্য, তদধিষ্ঠিত শরীর হইতে পৃথক্ হইলেও, মস্তিষ্ক তাহার অধিষ্ঠানভূমি, তেমনই সমাজশরীরেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লোকই সেই সমাজের সমষ্টিজ্ঞানের বা সমাজচৈতন্যের আশ্রয়স্থান। যেমন জীবশরীরের মস্তক হইতে শরীরের সর্ব্বত্র জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়, তেমনই সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেষ্ঠ লোক হইতে সমাজের সকল লোকে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পরিচালিত হয়। এ সকল কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১১। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও এক কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন সমাজ কোন বিশেষ কালের জন্য সংহত নহে। সমাজশরীর বহুকালস্থায়ী। কিন্তু তদন্তর্গত মানবগণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সমাজান্তর্গত কত লোক প্রত্যহ মরিতেছে, জন্মিতেছে, মানবপ্রবাহ নিয়ত চলিতেছে, কিন্তু সমাজশরীর একরূপ অচল অটল ভাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের শরীর যে সকল জীবাণু দ্বারা সংগঠিত, তাহাদের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এমন কি, কথিত আছে, প্রতি সাত বৎসরে সমুদয় শরীরের অণুগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন জীবাণু

দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন শরীর সংগঠিত হইয়া থাকে, অথচ আমাদের শরীরের বিশেষ পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না, শরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্যের কোন ক্ষতি হয় না। সমাজশরীর সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সমাজ কোন বিশেষ কালের লোকের জন্য সংহত হইতে পারে না। কোন বিশেষ কালে কোন সম্প্রদায় তাহাদের নিজের চেষ্টায় তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি বা সুবিধার জন্য সমাজবদ্ধ হয় নাই। সমাজ, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালের মানবগণের স্বার্থ বা সুবিধার জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সংহত। কোন বিশেষ সমাজ, কোন বিশেষ সময়ে তদন্তর্গত মানবের সমষ্টি নহে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ আমাদের সকলের সমষ্টীকৃত রূপ নহে। সমাজ এক অর্থে, সে সমাজান্তর্গত অতীত বর্ত্তমান সমুদয় মানবের সমষ্টীকৃত রূপ। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও নিজে মিলিত হইয়া নিজের সুবিধা-মত সমাজ নূতন করিয়া সংগঠন করিতে পারি না। আমরা সমগ্র অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে পারি না। বলিয়াছি, আমরা যেমন নিজে নিজের শরীর গড়িয়া লইতে পারি না, তেমনই সমাজশরীরও সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সমাজশরীর সংগঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, সমাজশরীরের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় হয়। মানুষ যদি নিজে চেষ্টা করিয়া সমাজ গড়িয়া লইতে পারিত, তবে সে আপন সুবিধামত সমাজ করিয়া লইত। মানুষ নিজের স্বার্থই বুঝে, নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্যই কাজ করে। পরবর্ত্তী কালে তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশের বা সমাজের কি হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার বিশেষ স্বার্থ নাই। সুতরাং যাহাতে পর-বর্ত্তী কালের লোকের সুবিধা হয়, তাহার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করায় তাহার প্রয়োজন নাই। কারণ, সাধারণ জ্ঞানে মানুষ পরবর্ত্তী কালের সঙ্গে আত্মীয়তা বা একত্ব ধারণা করিতে পারে না। মানুষ নিজ জ্ঞানবলে ও আপন চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে, 'জাতি' বা মানবপ্রবাহ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বাধা হইত। (১) এজন্য চুক্তিমূলে সমাজ সংগঠন হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য সমাজাধিষ্ঠিত চৈতন্য কোন বিশেষ সময়েই তদন্তর্গত মানবগণের চৈতন্যের সমষ্টি নহে। সে সমষ্টিচৈতন্য হইতে সমাজাত্মা পৃথক। সেই সমাজাত্মার জন্য ব্যক্তিমানব সমাজবদ্ধ হয়। সমাজ ব্যক্তিমানবকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়।

(১) [খ] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।
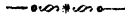
সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ,—সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়,—
এ কথার আপত্য—ও মীমাংসা।

১২। ব্যক্তিমানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে সমাজান্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের সমষ্টি হইতে সমাজ-চৈতন্য পৃথক্, মানুষ পরস্পর মিলিয়া যুক্তি করিয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করে না, একথা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব। মানুষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার প্রথমেই আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ সমাজ গড়ে না, সমাজই মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশুত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিত না। সমাজের প্রথম সৃষ্টিতে মানুষের কতদূর কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাহা আমরা স্থির জানি না। জ্ঞান বা অনুমানের দ্বারা বিচার করিয়া সে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার এ স্থলে প্রয়োজন নাই। তবে চুক্তিমূলে যে সমাজ সৃষ্টি হইতে পারে না, সমাজের মূল যে চুক্তি নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এক্ষণে মানুষের সহিত সমাজের যে সম্বন্ধ স্থির বুঝিতে পারি, তাহারই কথা বলিতেছি। মানুষ এখন সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সমাজের দ্বারাই মানুষ লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। সমাজ মানুষকে যেরূপ শিক্ষা দেয়, মানুষ সেইরূপেই শিক্ষিত হয়। তাহার পরে মানুষ বড় হইয়া, নিজের জ্ঞান ও শক্তি বলে, কখন কখন সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নত কি অবনত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বটে, কিন্তু সে সমাজ গড়িয়া লইতে পারে না। সংসারে সর্ব্বত্রই ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ম। সুতরাং সমাজ মানুষের উপর

যেরূপ ক্রিয়া করে, মানুষকে যেরূপে সংগঠিত করে, সেইরূপ মানুষও সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া করে,—সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু এস্থলে, সে প্রতিক্রিয়ার কথা, মানুষ কিরূপে সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহার কথা আলোচ্য নহে। সমাজ কিরূপে মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজ কিরূপে মানুষকে মানুষ করে, সমাজে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহাই এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে, এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্য হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। এজন্য অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন, ও অনেক কূট দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। আশা করি, ইহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

১৩। সমাজ বা বাহ্যপ্রকৃতি মানুষকে যে কোনরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, ইহা কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন না। ইহাঁদের কথা সত্য হইলে, মানবশিশু যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই শক্তি-বলেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি হয়, তাহার বিকাশের জন্য সে বাহ্যশক্তি বা অনুকূল কি প্রতিকূল কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, মানবশিশুর উপর বাহ্যবিষয়ের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, সমাজ যাহাই হউক, তাহা মানুষের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না,—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে সকল ধর্ম্মে পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকৃত হয় নাই, সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণের মতে, মানবমাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেই মানবাত্মা জন্মগ্রহণ করে তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্মগ্রহণ কালে সকল মানবাত্মাই একস্বভাব ও একধর্ম্মযুক্ত থাকে। তখন ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকে না। তাহার পর বিভিন্ন মাতৃগর্ভে, বিভিন্নরূপে পরিপুষ্ট হওয়াতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মানবশিশু মধ্যে বাহ্য বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পরে সংসারে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের বিভিন্ন দিকে গতি হয় সত্য, কিন্তু তাহারা, তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাবলে বা স্বাধীন ইচ্ছা (free will) বশে, বাহ্যপ্রভাব অতিক্রম করিয়া, বাহ্য অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া, নিজের গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে পারে। ইহাই মানবাত্মার বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে মানবাতিরিক্ত জীবের আত্মা নাই।

কেবল মানুষেরই আত্মা আছে। আত্মা স্বাধীনস্বভাব। এজন্য মানুষ ইচ্ছা করিলে ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মন্দ হইতে পারে। এজন্য সে তাহার কৃত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের জন্য দায়ী। এবং এজন্য, পরকালে তাহার পুণ্য বা পাপের ফলভোগ জন্য স্বর্গ বা নরকের ব্যবস্থা আছে।

১৪। ইহা ব্যতীত কোন কোন শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মানুষের উপর সমাজের বা বাহ্যবিষয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইহার মধ্যে প্রধান কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। এই পণ্ডিতদের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিকগণকে 'আমি-সর্ব্বস্ব-বাদী' বলা যাইতে পারে। ইঁহারা 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া জগৎ বুঝিতে চেষ্টা করেন 'আমি' রূপ কষ্টি পাথরের দ্বারা অন্য তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষা করেন। ইঁহারা সকল তত্ত্বে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস সাগরে ডুব দিয়া সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের আশ্রয় স্বরূপ 'আমি' কে বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিযুক্ত অহঙ্কারকে মহাসত্যরত্ন রূপে উদ্ধার করেন, (১) অথবা কোন সত্যরত্নই উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহারা এই 'আমি'র বাহিরে গিয়া সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া—সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, এ কথা বলিতে পারেন না। এই 'আমি সর্ব্বস্ব-বাদের' ফলে পাশ্চাত্য দেশে আমিত্বের প্রসার বড় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আত্মাভিমান ফলে, ইঁহারা আপনাদিগকে সমাজের অঙ্গ মনে করেন না, বা সমাজ কর্ত্তৃক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এই আত্মবাদের শেষ পরিণাম এক দিকে মায়াবাদ, আর এক দিকে জড়বাদ।

যাঁহারা মায়াবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা এ জগৎকে মায়াময় স্বপ্নময় বা কল্পনাজাত ও বাস্তবিক অসত্য এইরূপ ধারণা করেন, দর্শনের ভাষায় যাঁহারা 'ইদং' কে 'অহং'প্রসূত, 'অহঙ্কারেই' 'ইদং' আরোপিত (২), অর্থাৎ আপনার

(১) বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের মূল—ফরাসিপণ্ডিত দেঃ কার্ত্তের, মহাবাক্য 'Cogito Ergo Sum'। ইহা হইতে জ্ঞানক্রিয়ার বা চিন্তার আধার বা কর্ত্তা 'আমি'র অস্তিত্ব প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর অন্য তত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মূল লক্ষ্য।

(২) বৌদ্ধ দার্শনিকের বিজ্ঞানবাদ, ও জর্ম্মাণ দার্শনিক সেলিং ও ফিক্তের 'অহঙ্কার'বাদ এইরূপ।

জ্ঞানে অথবা কল্পনায় জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, যাঁহারা ব্রহ্ম বা পরম-পুরুষের জ্ঞানে ও শক্তিতে জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত না করিয়া, ব্যষ্টি সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত মানবজ্ঞানে জগতের কাল্পনিক অস্তিত্ব ধারণা করেন, যাঁহারা অজ্ঞানকে বা মায়াকে, নিত্য অব্যয় ব্রহ্মরূপ আমাতে, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাণ্ডিত্য-মূর্খতা পশুত্বদেবত্ব প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্মের আরোপের কারণ মনে করেন, তাঁহারা মানবের বিকাশ ও পরিণতি স্বীকার করেন না, বা তাহার জন্য সমাজের কোন কর্তৃত্ব আরোপ করেন না।

১৫। আর যাঁহারা জ্ঞানবাদী, জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মানবের জ্ঞানশক্তির ক্রমবিকাশ, এবং তাহাতে সমাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইহাঁদের মতে জ্ঞান—এক অনন্ত অপৌরুষেয়, জ্ঞান—ব্রহ্ম। অথবা জ্ঞান চৈতন্য বা চিৎ—ব্রহ্মস্বরূপ। (১) মানবজ্ঞান তাহার নিজস্ব নহে, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানের আংশিক অভিব্যক্তি বা প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় আমাদের সামাজিক বৃত্তি বা সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, সমাজের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা উচিত সেই ধর্ম্মজ্ঞানও আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। তাহা সমাজ হইতে আমরা লাভ করি না। তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান, রামের জ্ঞান, শ্যামের জ্ঞান মূলতঃ এক—অখণ্ড। তবে সকলের জ্ঞানের অভিব্যক্তি সমান নহে। আমাদের অন্তঃকরণের মলিনতাই তাহার কারণ। মানুষের নানারূপ 'অশক্তি' হেতু, তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত—অজ্ঞানজড়িত। এজন্য আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারিক জ্ঞান পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান যাহাই হউক, মূল জ্ঞানের ক্রমবিকাশ [illegible] না,—এই কথা জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ প্রায়ই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাঁদের মতে, জ্ঞানে যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিকাশ হয়, বা যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহা মূলতঃ আমাদের সকলেরই এক। আমাদের সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞান, ভালমন্দ জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য জ্ঞান, প্রভৃতি মূলতঃ এক। তবে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ব্যবহার স্থলে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে মাত্র। যেমন, আমাদের কাজের মধ্যে কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ,

(১) বিলাতী দার্শনিকের কথায়,—জ্ঞান Universal (Cousin), Absolute (Hegel) ও Transcendental (Kant)।

কতকগুলি কর্ত্তব্য, কতকগুলি অকর্ত্তব্য, এইরূপ সাধারণ দ্বন্দ্বজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। তবে কোন্ বিশেষ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, বা কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমাদের ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে, এবং সেই বিশেষ জ্ঞানের ক্রমবিকাশও হইতে পারে। এই কথা সত্য হইলে, সমাজ বা বাহ্যবিষয় হইতে আমরা মূলজ্ঞান বা চিৎশক্তি লাভ করিতে পারি না বটে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ (intuitional) একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে বিশেষ জ্ঞান প্রমাণজনিত, যাহাকে প্রমাজ্ঞান বলে, যাহা বিষয়বিষয়ীর সংযোগে উৎপন্ন হয়, যাহা বাহ্যজগত হইতে বা বিষয় হইতে আমরা লাভ করি, সমাজ সেই জ্ঞানবিকাশে সহায়তা করে, একথাও বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। আমাদের মূল জ্ঞানশক্তির বা চৈতন্যের ক্রমবিকাশ না হইলেও, যে অজ্ঞান জ্ঞানকে আবরিত করিয়া রাখে, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে পারে, এবং সেই ক্রমাপসারণের দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়, এবং সমাজ সেই অজ্ঞানের ক্রমাপসারণে, বা ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিতে পারে, একথা জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণের স্বীকার করিতে কোন বাধা হয় না, তাহা বলিতে পারা যায়।

১৬। তাহা হইলেও, সমাজ যে মানুষ গড়িয়া লয়, একথা এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বরং সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয় (১)। তাঁহারা যদি আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের পার্থক্য, অপূর্ণত্ব ও ক্রমবিকাশশীলত্ব স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে একথা বলিতেন না। পারমার্থিক ভাবে জ্ঞান—এক অখণ্ড অবিভক্ত বটে, এজন্য পারমার্থিক ভাবে এই জ্ঞানের সমষ্টি হইতে পারে না। অন্যদিকে ব্যক্তিমানবের ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানজড়িত, অপূর্ণ ও ক্রমবিকাশশীল বলিয়া, তাহার সমষ্টিতে কখন 'সমাজ-জ্ঞান' কি পূর্ণ অনন্তজ্ঞান হইতে পারে না। তাহাও অপূর্ণ থাকিবে। মূলজ্ঞান বা চৈতন্য এক অবিভক্ত। জীবচৈতন্যরূপে তাহারই অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ হয়।

(১) এই জন্য চুক্তিমূলে সমাজ, একথা জ্ঞানবাদী জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, আমাদের এই মূল "I ought" জ্ঞান বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যখন সকলের সমান, তখন আমরা সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই সমাজ সংগঠন করিতে পারি।

সমাজচৈতন্যরূপে তাহারই অপেক্ষাকৃত পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য কখন সমাজচৈতন্যকে, সেই সমাজস্থ ব্যক্তিমানবের চৈতন্যের বা জ্ঞানের সমষ্টি বলা যাইতে পারে না। অপূর্ণত্বের সমষ্টিতে প্রকৃত পূর্ণত্বের ধারণা হয় না। আবার ব্যবহারিক ভাবে 'ব্যক্তিজ্ঞান' ও 'সমাজজ্ঞান' প্রত্যেকের পৃথক্। 'ব্যক্তিজ্ঞান' নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে। 'সমাজজ্ঞান' সমাজের জন্য বা পরার্থে কর্ত্তব্যকর্ম্মে আমাদের নিয়োজিত করে। আমাদের এই সমাজজ্ঞান—এই সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান ('I ought' জ্ঞান) একস্বভাব হইলেও, আমাদের সকলের মধ্যে তাহা সমানরূপে বিকাশিত বা পরিস্ফুট হয় না। আর তাহার বিশেষ বিকাশ স্থলেও, কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, সে জ্ঞান আমাদের সকলের সমান নহে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের সংস্কার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং অতীতের ও সমাজের প্রভাব অনুসারে তাহার প্রভেদ হইয়া থাকে। অতএব আমরা সকলে মিলিয়া কোন্ কাজ কর্ত্তব্য, কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য, কিসে সমাজের উন্নতি হয়, কিসে বা অবনতি হয়, তাহা একমত হইয়া অথবা অধিকাংশ লোকের অভিমত লইয়া কোন সময়ে স্থির করিতে পারি না। কেবল যে সকল লোকের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত, স্বার্থ বা বাসনাবিবর্জ্জিত, যাঁহারা 'আপ্ত', তাঁহারাই এই সকল ব্যবহারিক কর্ত্তব্য, দেশ কাল পাত্র অনুসারে স্থির করিতে পারেন। (১) তাঁহাদের এই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, অতি ধীরে ধীরে কালবশে ও সেই সকল অসাধারণ লোকের প্রভাব অনুসারে, সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে ক্রমে প্রবেশ করিয়া সমাজকে উন্নত করে। অতএব আমরা কখন সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া সমাজ গড়িতে পারি না। মানুষ সমাজ গড়ে না। আমাদের সকলের ব্যবহারিক জ্ঞান (২) একরূপ হইলে বরং একথা সম্ভব হইত।

---

(১) এই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্ম্মণোহপি বোধ্যব্যং বোধ্যব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥

গীতা, ৪। ১৬—১৭।

(২) শঙ্করাচার্য্যের উল্লিখিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্যাণ্টের উল্লিখিত practical reason—প্রায় একার্থবাচক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

১১। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের কথা এস্থলে আর বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। এই জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের ন্যায় আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা, এই মূলজ্ঞানের ন্যায় আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত করেন। মানুষ কেবল জ্ঞাতা নহে। মানুষ—জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা। আমাদের জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আছে। এই কর্ম্মবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিজ। কেহ কেহ (Schopenheaur প্রভৃতি) আরও বলেন যে, আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতিই এই ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের স্বরূপ। জ্ঞান প্রথমে এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, এই ইচ্ছাশক্তির অধীনে, কেবল তাহারই বশে পরিচালিত হইবার জন্য, বিশেষ অবস্থায় অভিব্যক্ত হয় মাত্র। তবে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে সেই জ্ঞানে এই ইচ্ছাবৃত্তির লয় হইয়া যায়—বাসনাবীজ নষ্ট হয়। আমাদের স্বরূপ—এই ইচ্ছাশক্তি হইতে, আমাদের স্বভাব বা প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। ইঁহারা বলেন যে, আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রের (Intrinsic character) বা স্বরূপস্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল বাহ্য বা ব্যবহারিক চরিত্রের (Empiric character) পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। (১) মানুষ তাহার আত্মশক্তি বলে এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। তাহা এ জীবনে শিক্ষা বা অন্য অবস্থার দ্বারা সংগঠিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না। যে স্বভাবতঃ সৎ বা সাধুপ্রকৃতি, সে সংসারের শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও ভাল থাকে। সে যে অবস্থায় পড়ুক,—সে রাজা হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মুর্খ হউক, সে 'বড় লোক' হউক, বা 'ইতর লোক' হউক, সে নিরন্তর সুখের ক্রোড়ে লালিত হউক, বা উৎকট দুঃখ ও ক্লেশের সংঘর্ষে অনবরত নিষ্পেষিত হইতে থাকুক, তাহার সে স্বাভাবিক চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। সে বরাবর সৎ থাকে। আর যে স্বভাবতঃ অসৎ, সে যে অবস্থাতেই পড়ুক, বরাবর অসৎ থাকিবে। অতএব বাহ্যবিষয় বা সমাজ কখন আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রকে সংগঠিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হউক, কিম্বা এই বাসনাজ প্রকৃতি

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট (Kant) সপেনহর (Schopenheaur) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের মূলসত্তা হউক, জ্ঞানস্বরূপ আমাদের অজ্ঞানাবরণের ক্রমাপসারণে এই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হউক, অথবা প্রকৃতির আপূরণে আমাদের মূলস্বরূপ—জগতের মূলসত্তাস্বরূপ—বাসনা বা ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া পরিণামে আমাদের বাসনাজাত প্রকৃতি জ্ঞানের পূর্ণবিকাশিত অবস্থায় সেই জ্ঞানেই প্রবিলীন হউক, আমাদের মূলস্বরূপ যাহাই হউক, আমাদের এই জ্ঞানের বা প্রকৃতির যে ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই। অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহারিক চরিত্র যে সমাজের সহায়তায় বিকাশ হইতে পারে, তাহা আমাদের কাহারও স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্য হইতে পারে না। (১)

১৮। আধুনিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ও তাহার মীমাংসায়, আর্য্যঋষিগণ বহু পূর্ব্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে জীবের জন্মান্তরবাদ ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে, জ্ঞানতত্ত্ব ও উল্লিখিত স্বাভাবিক চরিত্রের (বা intrinsic character এর) প্রকৃত তত্ত্বও বুঝা যায় না। আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষ জ্ঞাতা বটে, জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ বটে। কিন্তু মানুষে এই জ্ঞান তাহার বাসনাজাতঅজ্ঞানজড়িত ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসংস্কারবদ্ধ। তাহা দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত হয়। এই প্রাক্তন সংস্কার মধ্যে যে গুলি স্ফুটনোন্মুখ হয়, তাহা হইতেই মানুষ তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে। মানবাত্মা এই স্বভাব লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। বাহ্যপ্রকৃতি দৈব বা পুরুষকার এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তাহারা এই স্বভাবের বিকাশে সহায়তা করে মাত্র। এই স্বভাব মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি। তাহার প্রভাব বড় অধিক। আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক শক্তিতে

(১) ফরাসি দার্শনিক রুসো মানুষের এই স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, সমাজের দ্বারা তাহার উন্নতি হয় না, তবে অবনতি হয়—একথা সত্য। তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতঃই সরলপ্রকৃতি—নির্ম্মলচরিত্র। আদিম অবস্থায় মানুষ এইরূপ সরলপ্রকৃতিযুক্ত থাকে। পরে সমাজ তাহাকে নষ্ট করে। সমাজের কল্যাণে সে মিথ্যাকথা, জাল, জুয়াচুরি শিক্ষা করে, সে দস্যু বা রাক্ষস-প্রকৃতি হইয়া পড়ে। সমাজ হইতেই তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মল স্বভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। সমাজ তাহাকে দেব গড়িতে বানর গড়ে। রুসো ক্রমোন্নতিবাদের পরিবর্ত্তে কতকটা ক্রমাবনতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যঋষিগণ উভয়বাদই স্বীকার করিতেন।

সেই জন্য তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সামান্য। যেমন কোন বৃহৎ জড়খণ্ডকে কোন ক্ষুদ্র জড়খণ্ড আকর্ষণ করিলে, প্রাকৃত নিয়মে, সেই বৃহৎ জড়খণ্ডের সামান্য মাত্র গতি লক্ষিত হয়, তেমনই বাহ্য-প্রকৃতি বা সমাজের দ্বারা মানবের সেই স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন, তাহার পরজন্ম নিয়মিত করে। নতুবা যদি মানুষের ইহজন্মের সুখ দুঃখ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বা শক্তির বিকাশ প্রভৃতি সমুদায়ই তাহার অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল হইত, যদি তাহা কেবল তাহার পুরুষকার বা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিত, যদি তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট ও পুরুষকারের দ্বারা নিয়মিত হইত, এবং অন্য কিছুর উপর নির্ভর না করিত, যদি তাহার অদৃষ্ট বা স্বভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত হইলেও এ জন্মে সেই অর্জ্জনে তাহার কোনরূপ হাত না থাকিত, যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত যে, তদনুসারে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

১৯। আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। ইঁহারা শক্তিবাদী বা প্রকৃতিবাদী। ইঁহাদের মতে, প্রকৃতি চৈতন্যরূপিণী, প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। মানবের প্রকৃতিও এই মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ মাত্র। যেমন ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান—এক অখণ্ড, মানবে সেই জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি হয়, তেমনই শক্তিরূপা ব্রহ্মপ্রকৃতিও—এক অখণ্ড, মানবে সেই প্রকৃতিই মানবের প্রকৃতিরূপে, তাহার স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপে অভিব্যক্ত হয়। মানবের চৈতন্য, বুদ্ধি, ধৃতি, প্রীতি, দয়া, মোহ, ক্ষুধা, নিদ্রা (১)

(১) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা... ...চৈতন্যেত্যভিধীয়তে,... ...বুদ্ধি...নিদ্রা...ক্ষুধা...শক্তি...তৃষ্ণা,...ক্ষান্তি...জাতি...লজ্জা...শান্তি...শ্রদ্ধা... ...কান্তি...লক্ষ্মী...বৃত্তি...স্মৃতি...দয়া...তুষ্টি...মাতৃ...চিতি...ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা"

চণ্ডী, ৫। ১৬—৭৬...মন্ত্র।

সেই শক্তির মহাতত্ত্ব আমরা এই মার্কণ্ডেয়চণ্ডী হইতেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারি। এই চণ্ডীই শক্তিবাদী পণ্ডিতদিগের মূলগ্রন্থ।

[illegible] মানবের বাসনা, তাহার [illegible] সংস্কার অনুসারে আবার জন্মান্তর, ও প্রতিজন্মে এই সংস্কারের বিশেষ বিকাশ, সমুদায়ই সেই মমতাময়ী মহাপ্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত, সেই এক মহাশক্তিপরিচালিত। সেই প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানকে আবরিত করিয়া, তাহার অর্জ্জিত সংস্কার বা বাসনাজাত প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে পরিচালিত করেন। সেই প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, মুক্তি অভিমুখে মানবের গতি হয়। (১) জগৎরূপিণী—জগতের শক্তিরূপিণী এই মহাপ্রকৃতি জগতের ক্রমবিকাশ করেন, সমাজের ও মানবের আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া তাহাদের সত্বশক্তি বা তাহাদের দৈবপ্রকৃতির বিকাশ করেন,—সমাজের ও মানবের ক্রমোন্নতি করেন। এই মহামমতাময়ী প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবপ্রকৃতিবীজরূপে বা মানবের শক্তিরূপে মানবে অধিষ্ঠিত, তেমনই সেই প্রকৃতিই বাহ্যপ্রকৃতিরূপে, সমাজরূপে বা সমাজশক্তিরূপে, মানবের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়রূপে, অর্থাৎ তাহার অনুকূল বাহ্যঅবস্থারূপে অভিব্যক্ত। সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে, মানবের আত্মশক্তি বলে এবং সমাজ ও বাহ্যপ্রকৃতি সহায়ে মানবের ক্রমবিকাশ স্বীকৃত। এ তত্ত্ব [illegible] যে মহাসত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

২০। এই সকল কূট দার্শনিকতত্ত্ব আমাদের আর অধি[illegible]ল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিতগণের অভিমত পূর্ব্বে [illegible]লিখিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা অনেক দার্শনিক পণ্ডিত সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। মানবাত্মা যে আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে সেই শক্তি দ্বারাই নিয়মিত হয়, সমাজ বা কোনরূপ বাহ্যশক্তি দ্বারা সে বিশেষরূপে পরিচালিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না—ইহাই ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। পক্ষান্তরে অন্য কয়েক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা আদৌ এই আত্মশক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং বাহ্যবিষয় ও সমাজের দ্বারাই যে মানুষ গঠিত হয়, ইহাই ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যে জড়বাদী পণ্ডিতগণ প্রধান। ইঁহারা জন্মান্তর মানেন না, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহারা আত্মাকে 'মদশক্তি'র ন্যায় জড়পরমাণু

(১) ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।—চণ্ডী, ১১। ৫।

বিশেষের সংযোগফল সিদ্ধান্ত করেন। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা পরকাল স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করেন না। ইঁহারা মনাত্মবাদী—মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহাদের মতে জন্মকালে জীবাত্মার কোন বিশেষ শক্তি থাকে না, তাহার মন মোমের মত কোমল থাকে, বাহ্যবিষয় তাহার উপর ছাপ্ দিয়া তাহাকে যেরূপ করিয়া গড়িয়া লয়, সে সেইরূপই গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আত্মার জ্ঞানশক্তিও স্বীকার করেন না। ইঁহারা আত্মাকে জড়স্বভাব বলেন। বিষয় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হেতু আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম্ম—ইঁহারা একথা বলেন। ইহা আমাদের দেশের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এবং মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রভাকরের মত। এই সকল শ্রেণীর পণ্ডিত-গণের মধ্যে আধুনিক বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতের স্থান। ইঁহারা মানবজাতির ক্রমবিকাশের সহিত ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতি স্বীকার করেন, এবং বাহ্যবিষয়কে সেই ক্রমপরিণতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ পণ্ডিতগণ ব্যক্তিমানবের ক্রমপরিণতিতে পিতৃমাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা এই পিতৃমাতৃশক্তিকে heridity বলিয়াছেন। এই পিতৃমাতৃশক্তির কথা পরে উল্লিখিত হইবে। এই পণ্ডিতগণের মতে মানবের কোন 'আত্মশক্তি' নাই। সে কোন আত্মশক্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহার যদি কোন আত্মশক্তি থাকে, তবে তাহা এই ঘনীভূত পিতৃমাতৃ-শক্তি। বীজের মধ্যে যে বৃক্ষত্ব থাকে, বীজ যেমন সে বৃক্ষত্ব মূলবৃক্ষ হইতে লাভ করে, তেমনই মানুষও পিতামাতা হইতে তাহার দেহ ও অন্তঃকরণ গঠনো-পযোগী শক্তি ও উপকরণ লাভ করে। ইহাই কেবল মানুষের নিজস্ব। তাহার আর কোন নিজস্ব থাকা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহাদের কথায় 'বীজ আগে না বৃক্ষ আগে হইয়াছে,'—এই প্রাচীন তর্কের বিষয় মনে পড়ে। ইহাতে আরও অনেকরূপ আপত্য হইতে পারে। তাহা আর এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতের কথা, আর আলোচনারও প্রয়োজন নাই।

২১। আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে বলিতে পারি যে, সাধারণ ভাবে এ সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত মানবের উপর বাহ্যজগতের প্রভাব

স্বীকার করেন না, স্বাভাবিক শক্তিবলেই মানবাত্মার বিকাশ হয়, তাহার ব্যবহারিক উন্নতি অবনতি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, মানবের এই স্বাভাবিক শক্তি আদৌ স্বীকার করেন না, কেবল বাহ্যজগতই তাহার উন্নতি বা অবনতির কারণ, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে,—সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না, মানুষই সমাজ গড়িয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না—সমাজশরীর বা সমাজাত্মা স্বীকার করেন না। তাহা না স্বীকার করিলেও, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা তাঁহারা বলিতে পারেন। মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজ গড়ে, ও পরে সেই সমাজের দ্বারা নিয়মিত হয়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন।

যাঁহারা আত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, যাঁহারা মানবের নিজশক্তি বলে অন্য শক্তির সহায়তা বিনা মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা বলেন, অথবা যাঁহারা মানবের আত্মশক্তি বাদ দিয়া কেবল বাহ্যবিষয়ের দ্বারা বা আনুসঙ্গিক অবস্থার দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মত আংশিক সত্য। এই বাদ প্রতিবাদের সামঞ্জস্য করিয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে না পারিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু কিরূপে এই সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা এস্থলে বুঝিবার স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই। তবে এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অন্যের সহায়তা বিনা, কাহার নিজশক্তি না থাকিলে, তাহার বিকাশ হইতে পারে না। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কখন হইতে পারে না। অন্যের সমবায়ে তাহাতে নূতন সত্তার বা নূতন শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। তাহার শক্তিক্রিয়ার বা গুণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে মাত্র। অন্যের সমবায়ে বা অনুকূল অবস্থার সহায়ে, কেবল যাহাতে যাহা আছে তাহারই বিকাশ হয়। আর সে সহায়তা না পাইলে তাহারও বিকাশ হইতে পারে না। আমাদের দেশের দার্শনিকগণের 'শশবিষাণের' দৃষ্টান্তের ন্যায় আমরা বলিতে পারি যে, আমাতে যদি শৃঙ্গ উৎপাদন করিবার শক্তি অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে কোনরূপ অবস্থাতেই আমার শৃঙ্গ হইতে পারে না। তেমনই আমাতে হস্তপদাদি অঙ্গবিকাশের শক্তি থাকিলেও যদি অনুকূল অবস্থার সাহায্য না পায়, তবে আমার হস্তপদাদি অঙ্গের বিকাশও হইবে না। আমাদের জ্ঞানশক্তি

আছে বটে, কিন্তু বাহ্যবিষয়ের সহায়তা ব্যতীত সে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। দর্শনের ভাষায়, কোন 'ভাব'পদার্থই সহকারী কারণ বা নিমিত্ত কারণ ব্যতীত বিকাশিত হইতে পারে না, কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা সমবায়ী কারণ, তাহাতে নিমিত্ত কারণের সংযোগ হইলে তবে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ক্রিয়ায় সমবায়ী কারণেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাতে, সেই সমবায়ী কারণে যে 'ভাব' বা যে সত্ত্বা থাকে, তাহারই বিকাশ হয়। আমরা সর্ব্বত্র এই নিয়ম বুঝিতে পারি। অতএব দর্শনের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ ভাবপদার্থ; তাহার বিকাশে তাহার আত্মশক্তি সমবায়ী কারণ। আর অনুকূল বাহ্য-অবস্থা সেই বিকাশের সহায় বা নিমিত্ত কারণ মাত্র।

ইহা ব্যতীত আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সংসারে কিছুই স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। অন্যের সহিত সম্বন্ধ বা সংশ্রয় বিনা কাহারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অথবা যদি থাকে, তবে তাহার কোন বিকাশ বা পরিণতি হয় না। কোন বস্তুই তাহার সংসৃষ্ট অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত বুঝা যায় না। বাহ্য-বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধভাবে আমরা মানুষকেও বুঝিতে পারি না। বাহ্যবিষয় মানুষকে নিয়মিত করে, মানুষও বাহ্যবিষয়কে নিয়মিত করে। বলিয়াছি ত, ঘাত-প্রতিঘাতই সংসারের নিয়ম। সেইজন্য বাহ্যবিষয় বাদ দিলে মানুষের কিছুই বুঝা যায় না। আবার জ্ঞাতা আমাকে বাদ দিলে জ্ঞেয় বাহ্যবিষয়ও বুঝা যায় না। ইহা বড় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব। আমরা দর্শনের ভাষায় বলিতে পারি যে, কোন 'এক'কে তাহার সংসৃষ্ট 'অন্য' ব্যতীত ধারণা করা যায় না। শুধু তাহাই নহে। সেই 'এক' তাহার সংসৃষ্ট 'অন্যের' সমষ্টির সমান। অথবা সেই 'এক' ও তাহার সংসৃষ্ট 'অন্যের' সমবায়েই তাহার পূর্ণ একত্ব। এই যে 'আমি'—আমাকে, আমার 'ইদং' বা আমার সংসৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত মিলাইয়া বা একীভূত করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারিব না। জ্ঞানে—'অহং' ও 'ইদং' বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহাদের মিলনেই আমার জ্ঞান, আমার পূর্ণ ব্যবহারিক আমিত্ব। আমার জ্ঞানে এই 'ইদং' বা এই বাহ্যবিষয় বাদ দিলে আমার জ্ঞান থাকে না, এ আমি থাকি না। আমার জ্ঞানে, এই 'ইদং'জ্ঞান, এই জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান, যত বৃদ্ধি হইবে, আমার 'আমিত্বের' বিকাশ তত অধিক হইবে। জ্ঞানে—আমার জ্ঞেয় 'ইদং'এর বিকাশের সহিত, আমার 'অহং'এর বিকাশ হইবে। সেইরূপ কর্ম্ম বাদ দিলে কর্ত্তা থাকে না।

কর্ম্মের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, কর্ত্তার পরিসর বা বিকাশ বৃদ্ধি হয়। আবার 'ভোগ্য'-বিষয় বাদ দিলে 'ভোক্তা' থাকে না। এক কথায়, 'বিষয়' বাদ দিলে 'বিষয়ী' থাকিতে পারে না। আমরা মূল সম্বন্ধবিহীন 'অহং'কে বা 'ইদং'কে জানিতে পারি না। এই 'অহং' ও 'ইদং'এর সমবায়ে বা সম্বন্ধ হইতে যে ব্যবহারিক 'অহং', বা ব্যবহারিক 'ইদং', তাহাই কেবল আমাদের এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

দর্শনের এই জটিল দুর্ব্বোধ্য ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ এবং তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংসৃষ্ট বিষয় (environs) ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতেই ব্যবহারিক মানুষের বিকাশ হয় ;—তাহার জ্ঞান-বৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতি হয়। মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই শক্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, ঘাত-প্রতিঘাত হয়। এই সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না থাকিলে মানুষের বিকাশ আদৌ কল্পনা করা যায় না। শুধু মানুষ বলিয়া নহে। জগতে সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্রই বিষয়ের সহিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই সেই বিষয়ের পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হয়, জগতের পরিণতি হয়। যদি এক পরমাণুর সহিত অন্য পরমাণুর সম্বন্ধ বা ঘাতপ্রতিঘাত না হইত, যদি জড়পদার্থ মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ-বিক্ষেপক্রিয়া না থাকিত, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জড়জগতের পরিণতি হইত না, জড়জগত পুঞ্জীকৃত অবিশেষ পরমাণু অবস্থা বা সূক্ষ্ম ভৌতিক অবস্থা (nebulous state) বা মূল প্রকৃতির অবিকৃত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে পারিত না। যদি জৈবশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে পরমাণুবিশেষ একীভূত হইয়া জীবকোষ উৎপাদন না করিত, তবে জীবজগতের বিকাশ হইত না। যদি জীবানুর সহিত বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত না হইত, তবে ক্রম-আপূরণে জীবজাতির পরিবর্ত্তন বা পরিণতি হইত না। 'এক' হইতে 'বহু'র বিকাশ, ও এই বহুর মধ্যে প্রত্যেক একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতই জগতের বিবর্ত্তনের বা পরিণতির কারণ।

২২। বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মানুষে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—এ কথা, বীজ হইতে কিরূপে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শাস্ত্রমতে আব্রহ্মস্তম্ভ—সমুদায়ই জীব। সকলেরই বিকাশ সম্বন্ধে একই নিয়ম। বৃক্ষবীজের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহা

আমাদের স্বীকার করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজে অশ্বত্থবৃক্ষ বিকাশের শক্তি অন্তর্নিহিত আছে,—অশ্বত্থবৃক্ষের সূক্ষ্মাবস্থা বা সংস্কারাবস্থা নিহিত আছে, তাহা আমরা বলিতে বাধ্য হই। আধুনিক জীববিজ্ঞানশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সমস্ত বীজ ব্যাপিয়া এই বৃক্ষউৎপাদিকাশক্তি থাকে না। তাহার মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম কোষবিশেষে, অথবা সেই কোষান্তর্গত তরল অংশে, এই শক্তি নিহিত থাকে। বীজের অবশিষ্ট অংশ সেই জীবকোষের আহার ও রক্ষার জন্য থাকে। কোন দ্বিদল বীজ হইতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন বীজের এই দুই দলের মধ্যস্থিত বিন্দুপরিমিত স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হয়—দুইটী দলই পাকিয়া যায়, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। ডিম্ব হইতে শাবক উৎপত্তিরও এই নিয়ম। যাহা হউক, এইরূপ বীজে বা ডিম্বে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে। সেই শক্তি থাকাতেই অশ্বত্থ-বীজ হইতে কেবল অশ্বত্থবৃক্ষই উৎপন্ন হইতে পারে, হংসডিম্ব হইতে কেবল হংসই উৎপন্ন হয়। বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থা বীজের স্বরূপকে কখন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, তবে কখন কখন বাহ্যপরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, এই মাত্র। অবস্থা-অনুসারে কখন কখন সুমিষ্ট আম্রের বীজ হইতে অম্লরসযুক্ত বা বিস্বাদ আম্রের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, অথবা বিস্বাদ বা অম্লরসযুক্ত আম্রের বীজ হইতে সুস্বাদু মধুর আম্রের বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, কমলালেবুর বীজ স্থানচ্যুত হইয়া রোপিত হইলে 'গোঁড়া' লেবুর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয় স্থলেই সে আম্র বা লেবুর পরিবর্ত্তে অন্য ফলের বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, বাহ্যবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা বিনা, অশ্বত্থবীজ কখন অশ্বত্থ-বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না,—আম্রবীজ কখন আম্রবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে হইলে, তাহার কতকগুলি আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা প্রয়োজন হয়। নতুবা তাহার পরিণতি সম্ভব হয় না। প্রথমে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। তাহার পর তাহার অনুকূল জল বায়ুর প্রয়োজন। তাহার পর অত্যন্ত তাপ বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা হইতে, 'আওতা' বা পশু পক্ষী হইতে তাহাকে রক্ষার প্রয়োজন। তবে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। তবে বীজ তাহার অন্তর্নিহিত উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, বাহিরের জড় ও জীবাণুদের আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করতঃ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, নিজের শরীর বিকাশ করিতে পারে। যে

বৃক্ষ কেবল শীতপ্রধান দেশেই বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার বীজ সহজে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। তেমনই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন প্রাণীকে সহজে শীতপ্রধান দেশে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। অনুকূল অবস্থার সহায়তা ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ব্যতীত, কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং কেবল বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিই কোন জীবের বিকাশ ও পরিণতি পক্ষে যথেষ্ট নহে। মানবের বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম।

২৩। অতএব মানবের পরিণতি ও বিকাশের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, মানব যে তাহার নিজস্ব কিছু বা আত্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। মানব ব্রহ্ম হউক, ব্রহ্মস্বভাব হউক, জ্ঞানস্বরূপ হউক, বা ঈশ্বরসৃষ্ট হউক, কি প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে জড় হইতে পরিণত হউক, তাহা আমরা জানি না। মানবের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আমরা এই অজ্ঞানজড়িত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জানিতে পারি না। বিশেষ সাধনাবলে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, “এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান” লাভ না হইলে, আমরা কাহারও স্বরূপ জানিতে পারি না। আমরা কেবল ব্যবহারিক আত্মার কথা জানিতে পারি—এস্থলে সেই ব্যবহারিক আত্মার কথা, (empiric self, phenomenal ego র কথা) বলিতেছি, স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরাভিমানী আত্মার কথা বলিতেছি। আমরা এই মায়াবদ্ধ জ্ঞানে আমাদের যাহা স্বরূপ (true self, absolute self, বা transcendent self) আমাদের যাহা স্বভাব (intrinsic character) যাহা আমাদের মূলসত্ত্বা (being-in-itself) তাহা জানিতে পারি না। তবে মানবের যে নিজস্ব কিছু আছে, ইহা না স্বীকার করিলে চলে না, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই নিজস্ব কিছু তাহার আত্মশক্তি, অথবা আত্মশক্তি ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার। এই নিজশক্তি বলেই মানুষ মানুষ হইতে পারে। অশ্বত্থবীজ হইতে যেমন অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে, অন্য বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তেমনই মানুষ তাহার এই নিজস্ব শক্তিবলে মানুষই হইতে পারে, অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাহার এই মানুষ হইতে হইলে, আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা আবশ্যক করে। তাহাকে পিতৃশক্তি বলে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পিতৃমাতৃশক্তি বলে শরীর গ্রহণ করিতে হয়, পরে সমাজ-সহায়ে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয়। তাহা না হইলে, তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ

হইতে পারে না। অনুকূল অবস্থায় তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশে সুবিধা হয়, প্রতিকূল অবস্থায় সেই বিকাশে বিঘ্ন হয়।

সর্ব্বত্র এই নিয়ম। তবে এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আছে। মানুষকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। কোন কোন লোকের উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তি বড় অধিক। সে শক্তিবলে তাহারা অনুকূল বাহ্যবিষয় লাভ করে, সুতরাং বাহ্যবিষয় তাহাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, বাহ্য-অবস্থা তাহাদের বিকাশে সহায় হয় মাত্র। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বড় ক্ষীণ। বাহ্যবিষয় তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করে। তাহাদের উপর বাহ্য-অবস্থার প্রভাব বড় অধিক। সাধারণ লোক সকলেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা হইলেও, সকল মানব সম্বন্ধেই বলিতে পারা যায় যে, তাহারা নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বাহ্য-অবস্থার সহায়ে তাহার বিকাশ হয়।

আমরা যদি কেবল এই নিজস্ব শক্তির কথা মনে রাখি, ও বাহ্য-অবস্থার কথা উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের কথা ভাবি, তবে আমরা বলিয়া থাকি যে, মানুষ তাহার আত্মশক্তিবলেই মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই শক্তিবলেই তাহার ক্রমোন্নতি হয়, ও মুক্তির দিকে তাহার গতি হয়। অন্যদিকে যদি আমরা কেবল বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা মনে রাখি—ও তাহার আত্মশক্তি উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ লোকের কথা ভাবি, তবে বলিতে পারি যে, 'কেবল বাহ্যশক্তিবলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এ উভয় মত যে আংশিক সত্য, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনুষ্যত্ব-বিকাশকল্পে একদিকে তাহার আত্মশক্তি ও সংস্কার, এবং অন্যদিকে তাহার পিতৃ-মাতৃশক্তি, সমাজ ও বাহ্যবিষয়। মানুষ আপনাকে আপনি গড়িয়া লয়, এক অর্থে যেমন একথা সত্য, তেমনই মানুষকে সমাজ ও বাহ্যবিষয় গড়িয়া লয়, সমাজ মানুষকে যেরূপ গড়ে মানুষ সেইরূপ হয়, একথাও আর এক অর্থে সত্য। মানবের এই আত্মশক্তি থাকা স্বত্বেও, সমাজ কেমন করিয়া তাহার সেই আত্মশক্তি অনুসারে তাহার বিকাশের সহায় হইয়া তাহাকে গড়িয়া লয়, তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।
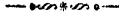
পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, অদৃষ্ট ও দৈববশে,
মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশ।

২৪। পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে ও সংস্কারবশে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়, কিরূপে মানুষ পিতৃমাতৃজ শরীর লাভ করে, তাহা আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার উপর কিরূপে ক্রিয়া করে, কিরূপে তাহার স্থূলশরীর লাভ হয়, আমরা জীবশরীরবিজ্ঞান সহায়ে এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অন্য জীববীজের ন্যায় মানুষের বীজও প্রথমে পিতার শরীর মধ্যে ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে (spermatozoon) অবস্থান করে। (১) শুক্র মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবাণু থাকে। বোধ হয়, ইহার প্রত্যেক জীবাণু

(১) আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের কর্ম্মবিপাকে এ পৃথিবীতে তাহার পুনর্জ্জন্ম-লাভ চেষ্টা হইলে, সে সূক্ষ্মশরীর লইয়া ক্রমে ভূবায়ুতে আসিয়া বি[illegible] করে। বায়বীয় পরমাণু বোধ হয় তখন তাহার সেই শক্তির আধার হয়। পরে তাহা যজ্ঞোত্থিত হবিঃবাষ্পের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া শস্য মধ্যে প্রবেশ করে। সেই শস্য অন্নরূপে যে মানব গ্রহণ করে, তাহার শুক্র মধ্যে সে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মনুসংহিতায় আছে,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥ ১। ৫৬।

অন্যত্র আছে,—

"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

শ্রুতিতে আছে,—

অন্নং বৈ প্রজাপতি স্ততো হবৈ তদ্রেত
স্তস্মাদিমাঃ প্রজা প্রজায়ন্ত ইতি।" প্রশ্নোপনিষদ্। ১২।

এক এক জীবাত্মার আধার বা স্থূলশরীরবীজ। তবে ইহার মধ্যে যে মানবজীবাণু মাতৃগর্ভে গিয়া জরায়ু মধ্যে শোণিতস্থ অণ্ডে বা কোষে (sperm cell) আশ্রয় গ্রহণ করিতে পায়, সেই কেবল অবস্থানুসারে মানবশরীর গ্রহণ করে। মাতৃগর্ভে, পিতৃশক্তি বলে ও মাতৃশক্তি সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, মানবজীবাণুর শরীর ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে। এবং সেই মানবজীবাণুর স্ফুটনোন্মুখ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বা সূক্ষ্মশরীরশক্তি যেরূপ, তদনুসারে, সেই সূক্ষ্মশরীরের অনুরূপ, তাহার স্থূলশরীরের বিকাশ হয়। যেমন কোন স্ফাটিকের (crystal) আকার তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে সংগঠিত হয়, মানুষের বাহ্যশরীরও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, মাতৃগর্ভে বিকাশিত হইতে থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ আধুনিক বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ কেবল এই পিতৃ-মাতৃশক্তি (heredity) স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই শক্তিবলে মাতৃগর্ভে মানব-শরীরের বিকাশের কথা বুঝাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব এস্থলে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। এই পিতৃমাতৃশক্তিতত্ত্ব অনু-সারে, অন্য জীবাণুর ন্যায় মানবজীবাণু পিতৃশরীর মধ্যে অবস্থান কালে, অথবা পিতার শরীর হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশের কালে সন্তানউৎপাদনক্রিয়ায় পিতামাতার পবিত্রতা ও একাগ্রতা অনুসারে, পিতা হইতে তাহার শক্তি লাভ করে। এই শক্তিবলেই সে পিতার অনুরূপ শরীর লাভ করিতে পারে। পিতার শরীরের বিশেষত্ব, তাহার শারীরিক বিকার বৈকল্য বা ব্যাধি—ইহার অধিকাংশই ভ্রূণে সংক্রামিত হয়। এমন কি, কোন কোন স্থলে পিতৃদেহের স্থানবিশেষের তিলটী পর্য্যন্ত পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হয়। এই ত গেল স্থূলশরীরের কথা। ইহা ব্যতীত মানসিক অনেক বৃত্তিবীজ মানবশিশু এইরূপে পিতা হইতে লাভ করে। কাজেই সে অনেক সময় স্বভাব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে পিতার অনুরূপ হয়। এজন্য সন্তানকে আত্মজ বলা যায়। তাহার পর, মানবশিশু শুধু পিতার শারীরিক ও মানসিক শক্তি এরূপে লাভ করে না। মাতৃগর্ভে থাকার সময়, মাতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিও সে কতক পরিমাণে লাভ করে। মানবভ্রূণ সে পিতৃমাতৃশক্তিবলেই বর্দ্ধিত হয়। এজন্য, অর্থাৎ গর্ভে একই রূপ পিতৃমাতৃশক্তি লাভ করায় ও একই রূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায়, আমরা অনেক সময় যমজ ভ্রাতাদের একরূপ আকৃতি ও কতকটা একরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাই। সন্তানে এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তির সঞ্চার

হয়, ও এইরূপে আকৃতির ও প্রকৃতির বিশেষত্ব অনেকস্থলে বংশপরম্পরা ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সেই বংশগত পার্থক্য রক্ষা করে।

২৫। পাশ্চাত্য মত এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে এই পিতৃমাতৃজ শরীরের কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু আমাদের শাস্ত্রে আর এক শক্তির কথা আছে, তাহা বলিয়াছি। তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার। তাহাকে ধর্ম্ম, অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বলা হয়। কেবল পিতৃমাতৃশক্তি স্বীকার করিলে সকল কথার মীমাংসা হয় না। এক পিতামাতা হইতে নিতান্ত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তিসম্পন্ন সন্তান, এমন কি বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন যমজ সন্তান জন্মিতে দেখা যায়। এক পিতামাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এক প্রকার শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া, প্রায় একই অবস্থায় লালিত পালিত হইয়া, ভাই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্নচরিত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রবৃত্তি প্রকৃতি গতি পরিণাম সকলই পৃথক্ হয়, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ জন্য অনেক পণ্ডিত আমাদের স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্র (intrinsic character) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং এজন্য আর্য্যঋষিগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। (১) কেবল আত্মশক্তি, বা স্বাভাবিক চরিত্র স্বীকার করিয়া, সেই শক্তির বা চরিত্রের বৈষম্যের কারণ, প্রতি মানুষে তাহার পার্থক্যের কারণ, পূর্ব্বজন্মসংস্কার [illegible] না করিলে বুঝা যায় না। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ (বিশেষতঃ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ) আরও বলেন যে, মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই যে অনুকূল বিষয় পাইলে ও প্রতিকূল বিষয় দূর হইলে আহ্লাদসূচক হাস্য করে, এবং তদ্বিপরীতে যে দুঃখসূচক ক্রন্দন করে বা মুখ বিকৃত করে, (২) ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে স্বভাবতঃ স্তন্য পানের চেষ্টা করে (৩), যে মরণের ভয় করে, বা জীবন রক্ষার জন্য

(১) "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ।"

ন্যায়দর্শন, ৩। ২। ৬৩, ও ৪। ১। ৪১।

(২) "পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোক সম্প্রতিপত্তেঃ।"

ন্যায়দর্শন, ২। ৩। ১৯।

(৩) "প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃত্যাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।"

ন্যায়দর্শন, ২। ৩। ৩২।

অজ্ঞাত আগ্রহ দেখায়,—এ সকল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার স্বীকার না করিয়া, কেবল পিতৃমাতৃজ সংস্কার দ্বারা বুঝা যায় না।

ইহা ব্যতীত, 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতঅভ্যাগম' দোষ নিবারণ জন্য আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তর ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার স্বীকৃত হইয়াছে। 'কৃত' বা যাহা করা যায়, তাহা নষ্ট হয় না;—ও 'অকৃত' বা যাহা করা হয় না, তাহাও আসিতে পারে না। সৎ—অসৎ হয় না, অসৎ—সৎ হয় না। কর্ম্মের কখন অত্যন্ত লয় হয় না। তাহা শক্তিরূপে আবার সঞ্চিত হয়। জগতের শক্তি (Energy) এক, অনন্ত, নিত্য। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সৃষ্টি নাশ নাই। তবে তাহার কার্য্য (kinetic) অবস্থা—ও শক্তি (potential) অবস্থা আছে। কার্য্যঅবস্থায় যে শক্তি ব্যয় হয় বা ক্ষয় হয়, তাহাই অন্যত্র শক্তিঅবস্থায় সঞ্চিত হয়। ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত শক্তির নিত্যত্ববাদ (Law of Conservation of Energy)। এই তত্ত্ব আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমরা যখন যে কর্ম্ম করি, যে চিন্তা করি, তাহা সূক্ষ্ম শক্তিরূপে, প্রতিঘাত (reaction) বলে, আমাদের অন্তরে (বা সূক্ষ্মশরীরে) সঞ্চিত হয়। ইহাই আমাদের সংস্কার। আমাদের মৃত্যুতে ইহার ধ্বংস হয় না। কেন না, শক্তির কখন ধ্বংস নাই। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা ব্যায়াম করিয়া শক্তি ব্যয় করিলেও, তাহাতে আমাদের কর্ম্মশক্তি ও দৈহিক বলের বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ আমরা একাগ্রভাবে বা ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিলে, সেই জ্ঞানক্রিয়ার সহিত, আমাদের জ্ঞানশক্তিরও বৃদ্ধি হয়। সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই নিয়ম। এইরূপে আমরা কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার বা শক্তি অর্জ্জনের কথা বুঝিতে পারি।

এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে এক আপত্তি আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। জড়জগতে জড়শক্তি নিত্য, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য বটে। কিন্তু চৈতন্যজগৎ স্বীকার করিলেও, চৈতন্যশক্তি যে নিত্য, জড়কর্ম্মশক্তি যে চৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত, অথবা উভয় শক্তিই যে এক মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা মন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে জড় বলেন, মানসশক্তিকে বা সংস্কারকে জড়শক্তি বলেন, তাঁহারাও সাধারণ জড়শক্তিকে মানসশক্তিতে পরিণত হইবার কথা প্রায়ই স্বীকার করেন না। কেন না, উভয় শক্তিই বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক। সুতরাং জড়শক্তি

সম্বন্ধে যে নিয়ম, মানসশক্তি বা চৈতন্যশক্তি সম্বন্ধে যে সেই নিয়ম হইবে, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অতএব, দেহনাশে দেহের সঞ্চিত জড়শক্তি নষ্ট হয় না,—কেবল রূপান্তরিক হয় বা কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয় বটে, কিন্তু দেহনাশে মন বা তাহার সঙ্গে কোন জন্মার্জ্জিত সংস্কার থাকিয়া যায় না। তাহা হয় একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, অথবা জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আর আত্মা বা চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত থাকা স্বীকার করিলেও, উচ্চতর মানসশক্তি বা সংস্কার যে মৃত্যুকালে নিম্নতর "জড়শক্তিতে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ কোন নিয়ম কেহ এপর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের কথা অনুসারে, মানবের জন্মগত বৈষম্যের কারণ পূর্ব্বে ছিল না, জন্মের সহিত সে বৈষম্য হইয়া থাকে, সেই বৈষম্যসৃষ্টিতে মানুষের নিজের হাত নাই, কেন না তাহার স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলেও, তখন তাহার সেই শক্তি বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিবার কোন অবসর ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ রাজা বা ধনীর ঘরে জন্মিয়া আজন্ম স্বচ্ছন্দে থাকে। কেহ বা কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া চিরদিন কষ্ট পায়। কেহ সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নত মনুষ্যত্ব বিকাশের সুবিধা পায়। কেহ অসভ্য রাক্ষস বা দস্যুর ঘরে জন্মিয়া অশিক্ষিত ও পাপরত হইয়া পড়ে। কাজেই যদি পূর্ব্বজন্মজ সংস্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে বৈষম্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে এই বৈষম্য ও মানবের এই দুঃখক্লেশ সমুদায় আকস্মিক বা ঈশ্বরসৃষ্ট, ইহা বলিতে হয়। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা এই জন্মগত বৈষম্য ও এই দুঃখক্লেশ ঈশ্বরসৃষ্ট, একথা বলিতে বাধ্য। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া কাহাকে সুখী বা দুঃখী করেন, মানুষের প্রতি অতি নির্দ্দয় প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করেন, অথবা পিতামাতার পাপে পুত্র অযথা কষ্ট পায়, বাধ্য হইয়া একথা বলিতে হয়। (১) কিন্তু কর্ম্মফল স্বীকার করিলে একথা বলিতে হয় না। জগত সর্ব্বত্র নিয়মের অধীন—সর্ব্বত্র নিয়মের রাজ্য (reign of law)।

(১) "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষাৎ,"।—বেদান্ত দর্শন, (২।১।৪)।

এই সূত্রে ও তাহার শাঙ্করভাষ্যে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে এই কথা বুঝান হইয়াছে,—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"—গীতা, ৫।১৫।

ঈশ্বর সেই নিয়মের নিয়ন্তা। এজন্ত তিনি কর্ম্মফলদাতা মাত্র। এজন্ত জড়-জগতের ন্যায় চৈতন্যের রাজ্যেও শক্তির নিত্যত্ব নিয়ম একই, এ কথা স্বীকার করিতে হয় (১)। সুতরাং জগতের মূল নিয়ম সর্ব্বত্র এক, এই (Law of continuity) অনুসারে এক জন্মের কর্ম্মফল অন্য জন্মে ভোগ করিতে হয়, একথায় কোন বিজ্ঞানসম্মত আপত্তি হইতে পারে না। আর একথা স্বীকার করিলে উল্লিখিত বৈষম্যের কারণও সহজে বুঝা যায়।

এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি আছে। আমাদের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কোন স্মৃতি নাই, সুতরাং পূর্ব্বজন্মও নাই। কিন্তু আমাদের শৈশবের প্রথম তিন চারি বৎসরের কোন কথা স্মরণ নাই, অথচ তখন যে আমি ছিলাম না, একথা কখন মনে হয় না। আর আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সাধনাবলে যোগীগণ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন, জাতিস্মর হন। বিশেষ অবস্থায়ও কদাচিৎ কাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনা বিশেষের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং এ আপত্তি তত সঙ্গত নহে। অতএব এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারশক্তি স্বীকার করিয়া, গর্ভ হইতে মানবে কিরূপে সেই শক্তির ক্রিয়া হয়, কিরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

২৬। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিলে, প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্ম গ্রহণও স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতির আপূরণে জীবের জাত্যন্তর হইয়া ক্রমে জীব মানবজন্ম লাভ করে, একথা বলিতে হয়। জগতে ক্রমোন্নতিই সাধারণ নিয়ম,—জীবের ক্রমবিকাশই জগতের মহাতত্ত্ব। যেমন প্রকৃতির আপূরণে প্রত্যেক জাতির জাত্যন্তরপরিণাম--আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক জীবকেও ক্ষুদ্র জীবাণু (amœba প্রভৃতি) বা ভ্রূণ অবস্থা হইতে মানুষ অবস্থায় আসিতে, নানাজাতীয় জীবজন্ম অতিক্রম করিতে হয়, ইহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সকল জন্মের সংস্কারই সূক্ষ্ম শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবে থাকিয়া যায়। তাহার পূর্ব্বগৃহীত বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ বা পশু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার সকলই তাহাতে থাকিয়া যায়। তবে প্রকৃতির ক্রমআপূরণে

(১) বিলাতী পণ্ডিত ড্রামণ্ড (Drummond) সাহেব সম্প্রতি তাঁহার "Natural Law in the Spiritual World," পুস্তকে এই কথা বুঝাইয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিম্নজাতীয় জীবজন্মের নিম্নশ্রেণীর সংস্কার সকল, পর পর উচ্চতর জন্মের উচ্চশ্রেণীর সংস্কারগুলি দ্বারা অভিভূত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। তাই এই অসংখ্য সংস্কাররাশির মধ্যে যাহাদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নত জন্ম লাভ হইতে পারে, আমাদের এই [illegible]কালে, সেই সংস্কারগুলিই সাধারণতঃ আমাদের বাসনাবলে ও প্রকৃতির [illegible], বিশেষ শক্তিযুক্ত হইয়া স্ফুটনোম্মুখ হয়। বর্ত্তমান জন্মে, ইহার ঠিক পূ[illegible] জন্মের সংস্কারই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমাদের উন্নতি বা অবন[illegible]য়া থাকিলে, সেই উন্নত বা অবনত সংস্কার মধ্যে, যেগুলি পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুকা[illegible] বিশেষরূপে 'প্রস্তোতিত' হইয়াছিল, তদনুসারে সাধারণতঃ আমাদের এজন্ম নি[illegible] হইয়া আমাদিগকে উন্নত বা অবনত করিতে পারে। তবে ক্রমোন্নতিই প্রকৃ[illegible] সাধারণ নিয়ম, ক্রমাবনতি বিশেষ নিয়ম—একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমাদের জন্মগ্রহণকালে আ[illegible]দের অসংখ্য সংস্কার মধ্যে যেগুলি স্ফুটনোম্মুখ হয়, তাহার মধ্যে আবার যেগুলি [illegible]বানুগ্রহে অনুকূল অবস্থার সহায়তা পায়, কেবল সেইগুলিরই বিকাশ হয়। অ[illegible] স্ফুটনোম্মুখ সংস্কারগুলি বীজঅবস্থায় বা অঙ্কুরঅবস্থায় থাকিয়া যায়। যেমন এক ক্ষেত্রে বহুজাতীয় উদ্ভিদের বহুবীজ রোপণ করিলে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পায় না, অনেকগুলি অঙ্কুরিত হইয়াও 'আওতায়' বা প্রতিকূল অবস্থাবশে নষ্ট হইয়া যায়, কেবল সামান্য কয়েকটী বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পায়,—আমাদের অসংখ্য সংস্কারবীজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানবের জন্মকালে তাহার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার যে সকল স্ফুটনোম্মুখ সংস্কারের বিকাশ পক্ষে অনুকূল হয়, সাধারণতঃ তাহার সেই সংস্কারগুলিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সেই গুলিই কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট সংস্কার বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

২৭। এই বিকাশোম্মুখ সংস্কার শক্তি বা প্রকৃতি লইয়া মানবজীবাত্মা, পিতা হইতে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়। গর্ভে, পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে, তাহার সংস্কার বিশেষ শক্তিযুক্ত হওয়ায়, প্রকৃতির অনুগ্রহে তাহার স্থূলশরীরের বিকাশ হয়। এইজন্য এই স্থূলশরীরকে পিতৃমাতৃজ শরীর বলে। এই পিতৃমাতৃশক্তি দ্বারা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী ভাব, মানসিকবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিও নিয়মিত হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে, "ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভূতাত্মার

সহিত ও সত্বরজতমোগুণের সহিত এবং দেবাসুরলভ্য অন্যান্যভাবের সহিত গর্ভে অবস্থিতি করে।" (১) "তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যাদৃশ ভবিতব্যতা, সে দৈবযোগে" তাদৃশ মাতাপিতা ও অন্যান্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (২) এজন্য পিতৃমাতৃ-স্বভাব দ্বারা তাহার প্রাক্তন কর্ম্মজ অদৃষ্ট বা সংস্কার উপযোগী স্বভাবের বিকাশ হয়। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"স্ত্রীপুরুষেরা যাদৃশ আহার, আচার ও চেষ্টা সমন্বিত হয়, তাহাদের সহযোগে তাদৃশ পুত্রই জন্মিয়া থাকে।" (৩) যাহা হউক এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। (৪)

এস্থলে যতদূর উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে প্রাক্তনসংস্কারশক্তি বা সূক্ষ্মশরীর ও পিতৃমাতৃজশক্তি সহায়ে তাহার স্থূলবিকাশ,—এই তত্ত্ব বুঝান আছে। শাস্ত্রে এই উভয়শক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই উভয় শক্তিক্রিয়ার সুন্দর সামঞ্জস্য করা আছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আর যাহাতে যাহা আছে, তাহারও, অনুকূল অবস্থার সাহায্য ব্যতীত, স্বতঃবিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এই পিতৃমাতৃজ শক্তি—আমাদের অনুকূল অবস্থা মাত্র। ইহাকে কখন আমাদের মূল স্বাভাবিক শক্তি বলা যাইতে পারে না। এজন্য আমাদের মধ্যে যে শক্তি নাই,—প্রাক্তনজন্মজ যে সংস্কারবীজ বা ধর্ম্ম নাই, তাহা আমাদের

---

(১) সুশ্রুতসংহিতা,—শারীরস্থান,—৩। ৩।

(২) "কর্ম্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েদ্ধৃদি॥"
সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—৩। ১৫।

(৩) "আহারাচার চেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রী পুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃপুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥"
সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান,—২। ৪৬।

(৪) স্থূলশরীর সম্বন্ধে সুশ্রুত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, "গর্ভে যে শরীর বিকাশ হয়, তাহা পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্বজ ও সাত্ম্যজ। ইহার মধ্যে কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গ সকল পিতৃজ। আর মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র প্রভৃতি মৃদু অঙ্গ সকল মাতৃজ।"
সুশ্রুতসংহিতা। শারীরস্থান,—৩। ১৯।

পিতৃমাতৃজ শক্তি বা কোন শক্তি সহায়েই বিকাশিত হইতে পারে না। আর যে সংস্কার এ জীবনে ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, তাহাও পিতৃমাতৃজ শক্তির সহায়তা বিনা বিকাশিত হইতে পারে না। এই উভয়ের মধ্যে সহায়তা বা সংযোগকে আমাদের শাস্ত্রে দৈবসংযোগ বলে। ইহাই আধিদৈবিকশক্তি। আমরা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তি দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি ফলোন্মুখ হইলে, বিধাতা বা মহাপ্রকৃতি তাহার বিকাশ জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ করিয়া দেন। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকেই আমাদের কর্ম্মফলদাতা বলা হইয়া থাকে। বলিয়াছি ত, সমুদায় জগৎটা এক অখণ্ড সনাতন নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান তাহার নিয়ন্তা। সমস্ত জগৎই এক সুরে বাঁধা। সর্ব্বত্র এক মহাসঙ্গীতের মহাবিকাশ। এই বহুত্ব মধ্যে সর্ব্বত্র সেই মহা একত্বের লীলা। এজন্য ভগবানের অনুগ্রহে, বা তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তি সহায়ে, আমাদের সংস্কারানুযায়ী বিকাশের জন্য অনুকূল অবস্থার সংযোগ সর্ব্বত্রই সম্ভব। আমাদের অদৃষ্ট অনুকূল হইলে, আমাদের উপর সুদূর গ্রহগণের বা জড়জগতের যে ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাও অনুকূল হয়। কিন্তু সে সকল অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, দৈব অনুগ্রহে, অনুকূল পিতৃমাতৃশক্তি ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থার সহায়ে, আমাদের ফুটনোন্মুখ পূর্ব্বসংস্কার বা অদৃষ্টের অনুরূপ শরীরাদি বিকাশিত হয়। (১)

মানবজীবাত্মা যখন এই পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে মানবজন্ম লাভ করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা যখন তাহার সেই সংস্কার তাহাকে উপযুক্ত মানবজন্ম লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে, তখন সে অন্যজাতীয় জীবশরীরে থাকিয়া, বা তথা হইতে সেই জাতীয় জীবমাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াও, সে জাতীয় জীবশরীর গ্রহণ করিবে না। যতদিন সে মানবপিতার শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, মানবপিতা হইতে মানবমাতৃগর্ভে গিয়া মাতৃশোণিতস্থ অণ্ডে প্রবেশ করিতে না পায়, ততদিন তাহার স্থূলশরীর গ্রহণ সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নহে। যে মানবজীবাত্মা তাহার ফুটনোন্মুখ শ্রেষ্ঠ সংস্কার বলে শ্রেষ্ঠবর্ণের মানবগৃহে জন্মিবার অধিকারী, সে

---

(১) আমাদের শাস্ত্রে আছে,—

"জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তদেবাভ্যসতে নরঃ॥"

যতদিন সেই শ্রেষ্ঠবর্ণের পিতারশরীরে প্রবেশ করিতে না পায়, ততদিন তাহার জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। তেমনই যে বীজ হইতে শৃগাল বা কুক্কুর শাবক জন্মিতে পারে, মানবমাতৃগর্ভে স্থান পাইলেও তাহার শরীরগ্রহণ সম্ভব হইবে না। অতএব অনুকূল অবস্থা ও উপযুক্ত পিতামাতা লাভ করিতে না পারিলে, মানবজীবাণু শরীরগ্রহণ করিতে পারে না, ইহা আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যদি বাহ্য ঘটনা-স্রোতের উপর বা আকস্মিক্ সংযোগের (বা chance এর) উপর এই ব্যাপার নির্ভর করিত, তবে বুঝি অধিকাংশ মানবজীবাণু আর জন্মগ্রহণ করিতে পাইত না। এইজন্য দৈব অনুগ্রহে, যথাসময়ে, অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার ফুটনোন্মুখ হইয়া শরীর-গ্রহণের জন্য স্বাভাবিক অন্ধ চেষ্টার সময়ে, মানবজীবাণু অনুকূল পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, একথা আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (১)

২৮। এইরূপে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে মানবজীবাণু শরীর গ্রহণ করে। পিতামাতার দেহ যত পরিপুষ্ট হয়, যত ব্যাধিহীন সবল ও কান্তিমান হয়, সন্তানের শরীরও সেইরূপ পরিপুষ্ট নিরোগ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। পিতামাতার মনোবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি যত পরিণত হয়, সন্তানেরও এই সকল অন্তঃ-করণ বৃত্তির ততদূর পরিণতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি পিতামাতার শরীর রুগ্ন ক্ষীণ দুর্ব্বল বা অল্পায়ু হয়, সন্তানও সেইরূপ রুগ্ন জীর্ণ ও বলহীন হয়। পিতামাতার মনোবৃত্তি অপরিণত হইলে, সন্তানের মনোবৃত্তিও প্রায় অপরিণত হইয়া থাকে। যে পিতামাতা সাত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার সন্তানের সাত্বিকস্বভাব হইতে পারে। আর যে পিতামাতা তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত, তাহার সন্তানও তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে পিতামাতার ধর্ম্মে মতি থাকে, ও জ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্তি থাকে, তাহার

(১) আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পাইয়াছি যে, এজন্মে যে যোগভ্রষ্ট হয়, সে পরজন্মে শুচী শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদৈহিক বুদ্ধি লাভ করে। গীতার শ্লোক এই,—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
* * * *
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।"

গীতা, ৬। ৪১—৩।

সন্তানেরও মতিগতি ও প্রবৃত্তি কতকটা সেইরূপ হইতে পারে। আর যে পিতামাতা স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব, তাহার সন্তানও প্রায় সেইরূপ স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব হইবার প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ সংস্কার স্ফুট-নোন্মুখ হয়,—যেরূপ স্বভাব বিকাশের উপযোগী হয়, দৈবানুগ্রহে মানুষ সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন পিতামাতা পাইয়া থাকে। অন্যদিক্ হইতে দেখিলে আমরা একথাও বলিতে পারি যে, যখন মানুষে পশুত্ব ও মানবত্ব উভয়বীজই নিহিত আছে, মানবে সাধারণ জীবভাব আছে, নানাজাতীয় জীবজন্মের সংস্কারবীজ নিহিত আছে,—তখন তাহার পিতামাতা পাশবপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায় সেইরূপ হেয় পাশব সংস্কারের বিকাশ হয়, পিতামাতা সাধুপ্রকৃতি হইলে, তাহারও প্রায়ই উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইয়া থাকে। আর তাহার অন্য সংস্কারগুলি পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে বিকাশের সুবিধা না পাইয়া বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

অতএব মানুষ সাধারণতঃ পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মনুষ্যত্বের উপযুক্ত বিকাশের জন্য মানুষের উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতার প্রয়োজন। সমাজসহায়েই আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়,—আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য হইলে, সমাজসহায়েই আমাদের পিতা-মাতার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ যত উন্নত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ হইতে পারে,—আমরাও সেই পরিমাণে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতা লাভ করিতে পারি। অসভ্য রাক্ষস-প্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্যমাংসভুক্ লোকের সমাজে, মানুষ এইরূপ রাক্ষস-প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতামাতাই পাইয়া থাকে। কাজেই সেখানে মানবশিশু এই রাক্ষস-প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের জন্মগ্রহণ সময়, আমাদের স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার বিকাশের অনুকূল পিতামাতা দিয়া, সমাজ আমা-দের গড়িয়া লয়। অথবা সমাজ আমাদের যেরূপ পিতামাতা দেয়, আমাদের সেই পিতামাতার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতিরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রথমে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতে, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজ আমাদের সহায়তা করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—•—*—•—

সমাজ সহায়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ।

২৯। দৈবযোগে, উপযুক্ত পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে, স্ফুটনোন্মুখ প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে, মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সমাজসহায়ে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। এক অর্থে মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমাজগর্ভে প্রবেশ করে, ও সমাজশরীর দ্বারা ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মানবশিশু বড় নিরাশ্রয়। অন্য জীবশাবক পূর্ণবিকাশিত সহজাতসংস্কার লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করে, ও পরে মাতাপিতার বিনা সাহায্যে বা সামান্যমাত্র সাহায্যে, সেই সহজজ্ঞান বশে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মানবশিশু সম্বন্ধে নিয়ম সেরূপ নহে। নিরাশ্রয় মানবশিশু, পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা বিনা, স্বাবলম্বন শক্তির অভাবে, আদৌ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এজন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, সমাজশরীরান্তর্গত পিতামাতা বা আত্মীয়দের দ্বারা, পরিবার মধ্যে, তাহাকে লালিত পালিত হইতে হয়। সেই পিতামাতা ও পরিবার, এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমাজ ও বাহ্যপ্রকৃতির সহায়ে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। এই শৈশব কালে তাহার বিকাশের সময়েই সমাজ তাহাকে গড়িয়া লয়। সেই সময়েই সমাজ, তাহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া,—নিজস্ব করিয়া লইয়া, তাহাকে সমাজের সেই অঙ্গের বিশেষত্ব অনুসারে সেই জাতীয় চরিত্রের ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার তদনুরূপ সংস্কারের বিকাশ করিয়া লইয়া, একরূপ 'হল্ মার্কা' দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে সমাজসহায়ে শৈশবকাল হইতেই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। সমাজ না থাকিলে, মানবশিশুর কোন উন্নতির

সম্ভাবনা, বা তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। মানবশিশু যদি সমাজ মধ্যে মাতাপিতা ও পরিণতবয়স্ক আত্মীয়গণের দ্বারা লালিত পালিত হইতে না পাইত, সমাজ যদি তাহাকে না গড়িয়া লইত, তবে তাহার জীবিত থাকার বড় সম্ভাবনা ছিল না। আর জীবিত থাকিলেও, তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়া কখন মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারিত না। সমাজ না থাকিলে, মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। আমরা প্রথমে দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩০। আমরা অনেক সময় ইতর পশু দ্বারা মানবশিশুর লালনপালনের কথা শুনিয়া থাকি। অবস্থা বশে মানবশিশু পিতামাতা বা আত্মীয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, কোন কোন সময় হিংস্র জন্তুও তাহাকে লালনপালন করিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু মানবশিশুকে খাদ্যের জন্য হরণ করিয়া লইয়া, পরে মায়াবশে তাহাকে আর ভক্ষণ করে না। সে তাহাকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে লালনপালন করে, তাহার নিজের সন্তানদের সঙ্গী করিয়া দেয়। রোম্ নগরের প্রতিষ্ঠাতা রমুলাস্ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক ব্যাঘ্রী তাহাকে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া জীবিত রাখিয়াছিল। এই জনশ্রুতি সত্য কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং এই ঘটনা হইতে রমুলাসের চরিত্রের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু অনেক পর্য্যটকের বিবরণ হইতে হিংস্র পশু দ্বারা মানব শিশুর প্রতিপালনের কথা, ও তাহার ফলে মানব শিশুর প[illegible] পরিণত হইবার কথা পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত [illegible] করিব। প্রথম দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"অনেকেই জানেন, কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫। ১৬ বৎসরের মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল, ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যে সমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটীকে বা আহারাদির দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃক দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য লোম অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং তাহাদের দন্ত সকল ঈষৎ সূক্ষ্মাগ্র

(সূচনা) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশুকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে মনুষ্যোচিত আকারের ও অবনতি হয়।”

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—সে দিনের কথা। আজ পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইল, জলপাইগুড়ীতে কোন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ভালুকের গহ্বরে এক সাত বৎসরের মানব শিশুকে পাইয়াছিলেন। সে আশৈশব সেই ভালুকের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়াছিল। সে ভালুকের অনুকরণ করিয়া শব্দ করিত, দুই হাতে দুই পায়ে চতুষ্পদের ন্যায় গমন করিত, আম মাংশ ভোজন করিত। সে ভালুকের ন্যায় ক্রুরস্বভাব হইয়াছিল। মানুষ কাছে যাইলে সে তাহাকে কামড়াইতে আসিত। পরে এই পশুপালিত মানবশিশুকে কলিকাতার অনাথাশ্রমে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহাকে কথা কহিতে বা দুই পায়ে ঋজু হইয়া হাঁটিতে কি কাপড় পরিতে শিখান যায় নাই। সে সিদ্ধ মাংস অপেক্ষা আম মাংস ভালবাসিত। তাহার শৈশবকালে বিকাশিত সেই ভালুকোচিত সংস্কার এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় নাই। অবশেষে তাহাকে ‘মানুষ করিবার’ চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, প্রায় এক বৎসর মধ্যেই সে মারা গিয়াছিল। এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ সেই সময়ের প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই, বিশেষতঃ ‘দাসী’ নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, পশু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলে, মানবশিশু ক্রমে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর অসভ্য সমাজ মধ্যে সভ্য সমাজের মানবশিশুর প্রতিপালনের কথা মনে করিতে হইবে। অনেক সভ্য সমাজের শিশু, ‘জাহাজ ডুবি’ প্রভৃতি দৈবঘটনাক্রমে অসভ্য সমাজে পরিত্যক্ত হইলে, সেই সমাজের দ্বারাই লালিত পালিত হয়। অনেক স্থলে অসভ্য সমাজের লোক সভ্য সমাজ হইতে শিশু হরণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রতিপালন করে। বেদিয়া বা জিপ্‌সিগণ অনেক সভ্য সমাজের শিশু চুরি করিয়া লইয়া গিয়া লালন পালন করিয়া থাকে,—তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উন্নত সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, উন্নত বা সাধুপ্রকৃতি সম্পন্ন পিতামাতা হইতে শক্তি লাভ করিয়া, মানবশিশুর উন্নত শুভ সংস্কার

স্ফুটনোম্মুখ হইলেও, সে যদি অসভ্য সমাজশরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সমাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে আর তাহার সে উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইতে পারে না। সে প্রায়ই সেই অসভ্য সমাজের লোকসাধারণের প্রকৃতি লাভ করে।

৩১। অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, বন্যপশুও গৃহপালিত হইলে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা শান্ত, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনেকটা মার্জ্জিত হয়। বন্য বিড়াল অপেক্ষা গৃহপালিত বিড়াল শান্ত ও বুদ্ধিমান। যে গৃহস্থের আদরের বিড়াল কেবল 'দুধে ভাতে' প্রতিপালিত হয়, সে অনেক স্থলে মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত খাইতে ভুলিয়া যায়, অনেকটা নিরীহ হয়। কোন কোন লোক ব্যাঘ্রশিশুকেও এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, তাহার জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজনা অভাবে অনেকটা লোপ হইয়া যায়, সে অনেক সময় কুকুরের মত প্রভুর অনুগামী হইয়া থাকে। এইরূপে পশুদের উপরও মনুষ্য সমাজের প্রভাব লক্ষিত হয়। আবার অসভ্য মানবশিশু শৈশবকাল হইতে সভ্য সমাজে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পরিবার মধ্যে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইলে, তাহার স্বভাবও অনেক পরিমাণে সেই পরিবারের অনুরূপ হইয়া থাকে। এক সমাজের শিশু অন্য সমাজে প্রতিপালিত হইলে, সে শিশুও পরিণামে সেই পরবর্ত্তী সমাজের লোকের স্বভাব ও আচরণ প্রভৃতি লাভ করে। বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আশৈশব বিলাতি সমাজে প্রতিপালিত হইলে, সে 'সাহেব' হইয়া যায়। অসভ্য অশিক্ষিত শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়ের ঘরে শৈশবকাল হইতে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হয়, তবে সেও অনেকটা সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। এইরূপে সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হয়। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশু হয়। যে সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব ততদূর বিকাশিত হইতে পারে। যে সমাজ যেরূপ, মানবশিশু সে সমাজের যে অঙ্গে লালিত হয়, মানুষও তদনুরূপ হয়। আমরা একথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৩২। মানবশিশু সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। প্রথম হইতেই পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় ও পরিবারবর্গের সহিত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই মানবশিশু পিতামাতা ও আত্মীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতেই মাতাপিতা প্রভৃতির স্বভাব ও কার্য্য সে অজ্ঞাতে অনুকরণ

করিতে থাকে। এই অনুকরণবৃত্তি বলে, আনুসঙ্গিক অবস্থা ও দৃষ্টান্ত প্রভাবে, মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তদভিমুখী হইয়া তদনুরূপ ভাবে বিকাশিত হইতে থাকে। তখন আমাদের স্বাভাবিক বিকাশশক্তি বড় প্রবল থাকে। সে প্রকৃতিজ শক্তি আমাদের জ্ঞান পরিচালিত নহে। আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে তাহা কার্য্য করিতে থাকে। তখন বাহিরের যে সকল অবস্থা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, অথবা দর্শনের কথায় তখন 'বিষয়ী' আমরা যে 'বিষয়' পাই, সেই বিকাশশক্তি বলে তাহাই গ্রহণ করিয়া তাহারই সহায়ে, এই 'বিষয়বিষয়ীর' সম্মিলনে, বা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে। তখন বাছিয়া বাছিয়া, আমাদের স্ফুটনোম্মুখ পূর্ব্বজন্মজ সংস্কার অনুযায়ী, আমাদের অনুকূলবেদনীয় বা সুখজ বিষয় গ্রহণ, ও প্রতিকূলবেদনীয় বা দুঃখজ বিষয় পরিহার করিবার শক্তি বড় অধিক বিকাশিত হয় না, এবং সে শক্তি তখন আমাদের জ্ঞানবলে পরিচালিত হয় না। কিন্তু তখন আমাদের অজ্ঞাতে, আমাদের এই সাধারণ বিষয়গ্রহণ শক্তির প্রভাবে এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরেই আমাদের মনুষ্যত্বের যেরূপ বিকাশ হয়, যেরূপ ব্যবহারিক চরিত্রের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড় বদ্ধমূল হইয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে তাহার বড় অধিক পরিবর্ত্তন হয় না। শৈশবকালে চারি পাঁচ বৎসরে আমরা যাহা শিক্ষা করি, পরবর্ত্তী কালে কুড়ি পঁচিশ বৎসরেও বোধ হয় তত শিক্ষা করিতে পারি না। সেই প্রথম চারি পাঁচ বৎসর বয়স মধ্যে আমাদের যে ব্যবহারিক চরিত্রের বিকাশ হয়, অজ্ঞাত অভ্যাস-বলে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয় না।

শৈশবকালে বালক মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্তন্যের সহিত কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার অলক্ষ্যে গ্রহণ করে। তাহার দুই কি তিন বৎসর বয়স হইতে না হইতে, সে মাতৃভাষা অনায়াসে আয়ত্ত করে—বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। আমরা বড় হইয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে কত বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করি, তথাপি সে ভাষা বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা অতি শৈশবে পরিবার মধ্যে মাতার নিকট হইতে মাতৃভাষা সহজে লাভ করি। সুধু তাহাই নহে। সেই ভাষা কত যুগযুগান্তরের কত লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণাবয়বযুক্ত হইয়াছে। তাহার কত জটিলতা, তাহার ব্যাকরণ কত কঠিন, তাহার শব্দভাণ্ডার কিরূপ পরিপূর্ণ! সেই জটিল মাতৃভাষা আমরা কত সহজে, কত অল্পদিনে বিনা

আয়াসে বিনা চেষ্টায় শিক্ষা করিয়া ফেলি। মাতার নিকট হইতে, পরিবারের নিকট হইতে বা সমাজের নিকট হইতে, যদি এই ভাষা অলক্ষ্যে শিক্ষা করিতে না পাইতাম, যদি কোন ভাষা শিক্ষা করিতে আমরা সমাজের সাহায্য না পাইতাম, যদি আমাদের নিজের চেষ্টায়, অন্যের সহিত সমাজবদ্ধ হইবার জন্য, আমাদের ভাষা গড়িয়া লইতে হইত, তবে আমাদের ভাষা আদৌ লাভ হইত না। আমাদের ভাষা শিক্ষার শক্তি আছে বটে, আমাদের বাক্‌যন্ত্র ইতর জীব অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট বটে, কিন্তু মাতাপিতা ও সমাজ আমাদের ভাষা শিক্ষা না দিলে, আমরা প্রকৃত ভাষা লাভ করিতে পারিতাম না। অসভ্য সমাজেও পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য সামান্য কয়েকটী কথা বা শব্দ মাত্র সংগৃহীত হইয়া একরূপ নামমাত্র ভাষা প্রচলিত থাকে। আর কতকগুলি ভাব অসভ্য সমাজের লোক সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশ করে। এই অস্পষ্ট বা অস্ফুট ও সাঙ্কেতিক ভাষাও সেই অসভ্য সমাজে কত কালে কত পুরুষের চেষ্টায় সংগৃহীত, অথবা দৈবঅনুগ্রহে বিকাশিত। অতএব মানুষ, সমাজ বা পরিবার মধ্যে শিক্ষা না পাইলে, তাহার কোন ভাষাই লাভ হইত না,—পূর্ণ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ভাষা ত দূরের কথা। আর সমাজ-সহায়ে মানুষ ভাষা শিক্ষা করিতে না পারিলে, মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে, মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

৩৩। এইরূপে শৈশবে আমাদের অলক্ষ্যে, আমাদের অজ্ঞাত চেষ্টায়, মাতা-পিতা ও সমাজের সহায়ে আমরা ভাষা লাভ করি। আর শুধু কি ভাষা! এই শৈশবেই মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্কার, কত বিষয় অলক্ষ্যে আয়ত্ত করিয়া লই। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ, কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টি অকর্ত্তব্য—তাহাও মানবশিশু অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাতাপিতার কাছে শিক্ষা করে, পরিবারের মধ্যে শিক্ষা করে। শিশুর পিতামাতা যে কাজ ভাল মনে করে, শিশুও সেই কাজ ভাল ভাবিতে শিক্ষা করে। আমাদের স্বভাবতঃ ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি বা সংস্কার থাকিতে পারে, এবং স্বভাবতঃ আমরা ভাল কাজও করিতে পারি। কিন্তু সমাজ যদি নরহত্যা ভাল কাজ, বা চুরি করা ভাল কাজ বলিয়া আমাদের শিক্ষা দেয়, তবে আমি ভাল কাজ মনে করিয়াই নরহত্যা করিব বা চুরি করিব। অতএব আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান ও ভাল কাজে প্রবৃত্তি থাকিলেও, ব্যবহারিক ভালমন্দ জ্ঞান, আমরা পিতামাতা ও

সমাজ হইতে লাভ করি। সে জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। সমাজ যত উন্নত হয়, সে জ্ঞানের তত বিকাশ হইতে থাকে। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। (১) আর মানবের মধ্যে পাশবপ্রকৃতিবীজ, মানবপ্রকৃতিবীজ ও দেবপ্রকৃতিবীজ—এ সকলই প্রাক্তন সংস্কার হেতু নিহিত থাকিতে পারে। কেহ কেহ এই সংস্কারবীজকেই মানুষের পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (২) এই সংস্কার মধ্যে জন্মকালে যে গুলি বিকাশোন্মুখ হয়, তাহার কতকগুলি মাতৃগর্ভে পিতৃমাতৃশক্তি সহায়ে বিকাশিত হইতে থাকে। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব শিশু, পিতামাতা ও তৎসংসৃষ্ট পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ যেরূপ আচার ব্যবহার, যেরূপ প্রকৃতিঅনুযায়ী কার্য্য, যেরূপ ভাব লক্ষ্য করে, সে শিশুর ফুটনোন্মুখ সংস্কার বশে তাহার তদনুরূপ আচার ব্যবহার প্রবৃত্তি প্রকৃতি প্রভৃতিরই বিকাশ হইতে থাকে। পিতা মিথ্যাবাদী হইলে, স্বার্থপর হইলে, সন্তানও মিথ্যা কথা কহিতে শিখে, সে স্বার্থপর হয়। পিতা মদ্যপ হইলে, সন্তানের মদ্যপানপ্রবৃত্তি অলক্ষ্যে বিকাশিত হইতে থাকে, মদ্যপান যে দূষণীয় বা ঘৃণার্হ—তাহা তাহার বড় ধারণা হয় না। চোর বা দস্যুপিতামাতার গৃহে পালিত শিশুও সেই জন্য প্রায়ই চোর বা দস্যু হইয়া থাকে। (৩) অতএব পিতার ও পরে মাতার শরীর মধ্যে অবস্থান হইতে—শৈশবকাল পর্য্যন্ত বরাবর মানব শিশু—পিতামাতার অনুরূপ প্রবৃত্তি বিকাশের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎবিপরীত প্রবৃত্তিবীজ বিকাশ সম্বন্ধে প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(১) বাক্‌ল্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আমাদের এই ব্যবহারিক জ্ঞানের ও ধর্ম্মনীতির ক্রমবিকাশশীলত্ব দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(২) দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—১। ৩৪৯।

(৩) ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল :—

"The Jukes family, starting from a drunkard, produced in 75 years, 200 thieves and assassins, 248 invalids, and 90 prostitutes."

The Criminal—by Havelock Ellis.

Quoted by Guyan in his work on 'Education and Heredity.'

শিশুর সৎপ্রবৃত্তিবীজ বা সুসংস্কার স্বভাবতঃ প্রবল থাকিলেও, সে যদি সেই বীজের বিকাশের অনুকূল অবস্থা না প্রাপ্ত হয়, তবে দৃষ্টান্ত বা উত্তেজনা অভাবে, তাহার সেই সৎপ্রবৃত্তিবীজ আর বিকাশিত হইতে পারে না। আর তাহার অসৎপ্রবৃত্তি-বীজ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকিলেও, যদি তাহার পিতামাতা অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়, তবে অনবরত দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া স্বাভাবিক অনুকরণশক্তি বলে মানবশিশু পিতামাতার সেই অসৎ প্রবৃত্তিই প্রায় লাভ করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

৩৪। এইরূপে শৈশবে পিতামাতা ও পরিবারবর্গের দ্বারা অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে বিনা চেষ্টায় আমাদের বিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে আমাদের ব্যবহারিক চরিত্র (habit) সংগঠিত হয়। আমরা তাহা জানিতেও পারি না। বড় হইলে, এই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসরের কথা আমাদের প্রায় কিছুই মনে থাকে না। এখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া তখনকার দুই এক কথা মনে আনিতে পারি মাত্র। তখন যে বিশেষ ঘটনাগুলি বড় জোরে আমাদের প্রাণে আঘাত করিয়াছিল, যাহার সহিত আমাদের মনের বিশেষ সংযোগ হইয়া মনকে বড় জোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি কখন কখন আমাদের মনে উত্তেজনা বলে জাগিয়া উঠে—এই মাত্র। আমরা তখনকার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বটে, তখনকার মনকে অলিখিত পুস্তকের মত মনে হয় বটে, যে স্মৃতির সূত্র ধরিয়া আমাদের বর্ত্তমান 'আমি'কে বা আমাদের সূত্রাত্মাকে অতীতে লইয়া গিয়া আমাদের অতীত শৈশব কালের 'আমি'র সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া সেই শৈশবের 'আমি'র সঙ্গে বর্ত্তমানের 'আমি'র একত্ব অনুভব করিতে পারি—আমাদের শৈশবের প্রথম চারি পাঁচ বৎসর আমার সেই স্মৃতির সূত্রকে,—আমার সেই 'আমি'কে খুঁজিয়া পাই না বটে, সেই শৈশব কালের কথা মনে আনিতে আমাদের সেই ধারাবাহিক 'আমি'র মালা ছিঁড়িয়া যায় বটে, সেখানে গিয়া আমার আমিত্বের ধারা ফল্গু নদীর ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যায় বটে, তখন যে আমি ছিলাম আমি কিছু করিয়াছিলাম তাহা বড় মনে হয় না বটে,—কিন্তু সেই শৈশবের চারি পাঁচ বৎসর আমার অজ্ঞাতে আমার অলক্ষ্যে আমার আমিত্বের বিকাশ হইয়াছিল, পিতামাতা পরিবার ও সমাজ আমাকে গড়িয়া লইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারি না। শৈশবে পিতামাতা ও পরিবার প্রমুখ সমাজ আমাদের গড়িয়া লয়—একথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

৩৫। বীজের বিকাশের পক্ষে যেমন ক্ষেত্র, এক অর্থে, আমাদের বিকাশের পক্ষেও তেমনই সমাজ। কেবল সমাজক্ষেত্রেই মানববীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—অথচ দুই তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না, মানববীজও সেইরূপ উপযুক্ত পিতামাতা ও সমাজ না পাইলে বিকাশিত হইতে পায় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে বৃক্ষবীজে ও মানববীজে প্রভেদ আছে। ক্ষেত্রের প্রভেদে বীজে যে বৃক্ষত্ব থাকে তাহার বিকাশে বিশেষ প্রভেদ হয় না,—কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশ পক্ষে পিতামাতা ও সমাজের প্রভেদে অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা ব্যতীত আদৌ আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর তাঁহারা আমাদের যেরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করেন, আমাদেরও সেইরূপ মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এক অর্থে, সমাজ আমাদের মাতাপিতা। কেননা, সমাজই আমাদের মাতাপিতা গড়িয়া দেন, সমাজ আমাদের মাতাপিতার মধ্যে যেরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ করেন, আমাদের মাতাপিতাকে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করেন, আমাদেরও সাধারণতঃ তদনুরূপ মনুষ্যত্বের ও তদনুরূপ প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। মাতাপিতা কেবল আমাদের জন্ম দেন না, কেবল আমাদের স্থূলশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করেন না। মাতাপিতাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে অনেকটা তাঁহাদের অনুরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশের মূল কারণ। তাঁহাদের হইতে আমরা ভাষা লাভ করি, ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ব্যবহারিক হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি প্রথমে লাভ করি। আমরা এ সকল কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তাহার পর সেই শৈশবের 'অল্পবিষয়ামতি' আমাদের শুভাদৃষ্টবশে, মাতাপিতার পর পরিবারস্থ আত্মীয়, পরিবারের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির পর গ্রাম, তাহার পর দেশ, তাহার পর সমাজ, তাহার পর সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে যত বিস্তার হইয়া পড়ে, ততই আমাদের বিষয়জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া আমাদের আমিত্বের বিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে পিতামাতা, স্বজন, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বসমাজ, সমগ্র মানবজাতি ক্রমে ক্রমে আমাদের শিক্ষক আমাদের জ্ঞানদাতা হইয়া, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি বা আত্মীয়তা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের পরার্থ কর্ম্মচেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের সহায়

হন। (১) যাঁহারা পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে সেই গ্রামে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, ক্রমে নগরে আসিয়া নিজের যত্নে সুশিক্ষা লাভ করিয়া পরে সমগ্র দেশকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছেন, দেশের জন্য সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তিগণ একথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করেন।

সমাজ আমাদের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন সমাজে বা স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া, বা তাঁহার পূর্ণমনুষ্যত্বকল্পনা মায়াশক্তি-বলে শরীরী হইয়া, তাঁহার অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সেই সমাজের উন্নতির উপ-যোগী জ্ঞানরত্ন আনিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (Revelation)। কোন সমাজে সাধনাসিদ্ধ নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের অন্তরে মহাজ্ঞানজ্যোতি বিকীরিত হইয়া, তাহা সমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা মহাপুরুষগণ সাধনাবলে কত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া তাহা সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে বিভিন্ন সমাজে কত যুগযুগান্তর হইতে কত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া, আমাদের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হইলে, আমাদের হাতে সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি দিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন। আমরা ক্রমে সমগ্র মানবসমাজের বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানরত্ন লাভ

---

(১) এ সম্বন্ধে মার্টিনো যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল

"But the internal history, which brings fresh instincts into operation and enlarges our psychological view, itself depends upon the play of new influences upon us from the external scene: as the relations of the family, the village, the clan, the state and at last the *genus humanum*, become included within the circle of cognisance, corresponding affections wake into life and enrich the personality with motive energies unfelt and unappreciated before;.........And this process so implicate together the agent and his fellows, that we can scarce divide the causal factors into individual and social, inner and outer: *bodily* no doubt, he stands there by himself, while his family are grouped separately round him: but *spiritually* he is not *himself* without them, and the major part of his individuality is relative to them as theirs is relative to him."

J. Martineau's Types of Ethical Theory.

Vol. II. P. 402,

করিয়া—উন্নতির পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে, আত্মসম্প্রসারণের পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হইতে থাকি। (২) সুতরাং সমাজই আমাদের জ্ঞানলাভের; আমাদের আত্মসম্প্রসারণ শিক্ষার; আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃত ভূমি। সমাজই আমাদের কর্ম্মপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তিসাধনার উপায় করিয়া দিয়া, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত, সমাজের সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি হইতে আমাদের কর্ম্মশক্তি বিকাশের সুবিধা হয়। সমাজের সমষ্টি চেষ্টা হইতে, সেই 'কার্য্যসাধিকা সংহতি'র যত্নে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টায় যাহা দূর করা অসাধ্য, এরূপ আত্মসংকোচকারী বিভিন্নরূপ দুঃখের হ্রাস হইয়া গিয়া, আমাদের আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। আমরা সাধারণতঃ সমাজের শ্রেষ্ঠ লোককে আদর্শ ধরিয়া তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি। এইরূপে আজীবন সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হন।

৩৬। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ ব্যতীত মানুষ পশুর অধিক কিছুই নহে। সমাজের সহায়তা ব্যতীত মানুষ নিরাশ্রয়। সমাজই মানুষকে মানুষ করে, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাই মানুষ, মানুষ হয়। আবার, যে সমাজ যতদূর উন্নত, সে সমাজে ততদূর উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। সমাজে আমরা যেরূপ পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পাই, সমাজের যে অঙ্গের

---

(২) এ সম্বন্ধে ইটালীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ম্যাট্‌সিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"God has placed beside you a Being, whose life is continuous, whose faculties are the results and sum of all the individual faculties that have existed for perhaps four hundred ages;......This Being is Humanity. A thinker of the past century has described Humanity as *a man that lives and learns for ever*. Individuals die but the amount of truth they have thought, and the sum of good they have done, dies not with them.........

Each of us is born today in an atmosphere of ideas and beliefs, which has been elaborated by all anterior Humanity.

We pass along, the voyagers of a day, destined to complete our individual education elsewhere, but the education of Humanity......is progressively and continuously evolved through Humanity......"

J. Mazzini.—"On the Duties of Man."

সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, সেই পরিমাণে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, পশুপালিত মানবশিশু, তাহার প্রাক্তন মানবোচিত সংস্কার বিকাশোন্মুখ হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সে ক্রমে পশু হইয়া যায়। অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত মানবশিশু, সেই সমাজে যতটুকু মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব, তাহার অধিক, বা তাহা অপেক্ষা অধিক বিকাশিত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজান্তর্গত ব্যক্তির সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে। অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংস-ভোজী আণ্ডামানবাসী বা অষ্ট্রেলেসিয়ার আদিনিবাসী লোকসমাজ মধ্যে সেইরূপ অসভ্য মানুষই জন্মিয়া থাকে, কেবল সেইরূপ হেয় মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ অসভ্য সমাজের শিশু, সেই সমাজে বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়া, পরে সভ্য সমাজ মধ্যে তাহাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও—সে তাহার স্বাভাবিক বা সহজাত ও বাল্যকালে অঙ্কুরিত সেই অসভ্য সমাজের লোকের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না,—ইহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

অতএব আমরা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে শৈশবকালে পিতামাতা বা আত্মীয়ের নিকট শিক্ষিত হই, আমাদের চরিত্র সেই সমাজের অনুরূপ হয়। সে সমাজে যে পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব—তাহার অধিক আর আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। অসভ্য সমাজে, কালিদাস প্রভৃতি সেক্ষপীয়র কি মিল্‌টনের মত কবি, শঙ্কর কি ক্যাণ্টের স্থায় পণ্ডিত জন্মিতে পারেন না। আর যদি দৈববিপাকে, কোন অসভ্য সমাজের পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেক্ষপীয়র কি গেটির প্রেতাত্মার, সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর তাঁহাদের সেক্ষপীয়র কি গেটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহাদিগকে সেই অসভ্য সমাজে অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হয়, বড় জোর তাঁহারা গ্রাম্য-কবি রূপে সেই অসভ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। আর যদি তাঁহারা নিতান্ত অসভ্য আণ্ডামানবাসীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেরূপ গ্রাম্য কবি হওয়াও আর সম্ভব হয় না। তবে হয়ত তাঁহারা কখন কখন পশু শিকার কালে, প্রাক্তন সংস্কার বশে, প্রকৃতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই প্রকৃতির পূর্ণশোভায় আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে মহিমাময়ী লীলাবিলাসে আকৃষ্ট হইয়া, মুহূর্ত্ত জন্য প্রাণের একরূপ অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আবেগ বলে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া যাইবেন।

বিশেষ উন্নত সমাজ ব্যতীত যে সমাজে ব্যাস বাল্মিকী বা শাঙ্কর ক্যাণ্টের জন্ম হইতে পারে না। যেমন ফল হইতে বৃক্ষকে জানা যায়, তেমনই কোন্ সমাজ কত উন্নত, কোন্ সমাজ কতদূর আদর্শের অভিমুখে যাইতে পারিয়াছে, তাহা আমরা সেই সমাজের প্রকৃত 'বড় লোক' বা মহাপুরুষদের কথা হইতে জানিতে পারি। যে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব শ্রীরাম চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে সমাজে ব্যাস বাল্মিকী, কপিল পতঞ্জলি, বশিষ্ট বিশ্বামিত্র, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন, সীতা সাবিত্রী, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন, সে সমাজ যে কত উন্নত হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আমরা ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারি।

৩৭। সে যাহা হউক, এই মহাপুরুষ প্রসঙ্গে আমাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ লোকের কথা হইতে ইহাঁদের কথা ভিন্ন। ইহাঁরা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার। কোন সমাজে সহস্র কি দশসহস্র লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত শক্তিধর বা প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিতে পারেন। আর কোন সমাজে কদাচিৎ কোন কালে, লক্ষ বা কোটী লোকের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম,—তাঁহার রাজ্যে অপব্যয় বা অপব্যবহার নিতান্ত অল্প। এজন্য প্রকৃতির অনুগ্রহে, বা ভগবৎকৃপায়, এই সকল শক্তিধারী লোক বা মহাপুরুষগণ জন্ম হইতেই, তাঁহাদের প্রকৃত বিকাশের উপযোগী অবসর ও অনুকূল অবস্থার সহায়তা প্রাপ্ত হন। সাধারণ লোক অপেক্ষা, ইহাঁদের জীবনে এই ভগবদনুগ্রহের বা অনুকূল অবস্থা সংযোগের অনেক অধিক চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, সাধারণ লোক অপেক্ষা এই সকল মহাজন বা শক্তিশালী পুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের সংস্কারবীজের বিকাশশক্তি অত্যন্ত বেগবতী। এজন্য সাধারণ প্রতিকূল অবস্থায়ও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে নিয়মিত বা পরিচালিত কি কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহারা অতি শৈশব হইতেই এই বিশেষত্বের পরিচয় দেন। তখন হইতেই, তাঁহারা বাহ্য-বিষয় দ্বারা বিশেষ অভিভূত হন না। তাঁহারা অসত্য ও অকল্যাণের মধ্যে থাকিয়াও সত্যপথ বা কল্যাণপথ বাছিয়া লন।

এই সকল মহাপুরুষদের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি, তাঁহাদের স্বাভাবিক চরিত্রের (intrinsic character এর) বল বড় অধিক, ও বড় পরিস্ফুট। ইহাঁদের

লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রবল ও আমাদের অন্তরে অনন্ত অপৌরুষের জ্ঞানশক্তি ও তাহার বিশেষ বিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁদের অন্তরেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি বা আনন্দবৃত্তির বিশেষ পরিণতি হয়,—মনুষ্যত্বের মহা আদর্শ ইহাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হয়। ইহাঁদের নির্ম্মল অন্তরে, ইহাঁদের সমাজের উন্নতি ও রক্ষার উপযোগী ভগবানের যে অনন্ত জ্ঞানালোকের কয়েকটী রশ্মি প্রতিফলিত হয়—পরমপুরুষের অন্তরস্থ যে সকল মহাভাবের (বা Idea র) বিকাশ হয়,—তাহা সমগ্র সমাজ মধ্যে বিকীর্ণ বা প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র সমাজকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে, আদর্শের পথে লইয়া যাইতে থাকে। ইহাঁরা সমাজের নেতা—সমাজের মস্তক।

বলিয়াছি ত, এই মহাপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র। 'ক্ষুদ্রসত্ব' সাধারণ লোকের সহিত ইহাঁদের তুলনা হয় না। সাধারণ লোকদের সংস্কারশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। সেইজন্য তাহাদের উপর বাহ্য অবস্থার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেইজন্য তাহাদের পিতৃমাতৃশক্তি, তাহাদের সমাজ—তাহাদের যে যে সংস্কারবীজের বিকাশ সম্বন্ধে সহায় হয়—বা অনুকূল হয়, কেবল সেই সেই সংস্কারবীজই বিকাশিত হইয়া তাহাদের চরিত্র সংগঠন করে। এজন্য সাধারণ মানুষকে সমাজ গড়িয়া লয়, একথা বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে। আর উল্লিখিত শক্তিশালী মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও একথা প্রযুজ্য। তাঁহারাও দৈবানুগ্রহে অনুকূল পিতামাতা বা অনুকূল সমাজ প্রথমে না পাইলে, তাঁহাদের বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না, একথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব মানুষ সমাজবৃক্ষের ফল, সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, একথা সর্ব্বথা বলা যাইতে পারে।

৩৮। অতএব সমাজ যেরূপই হউক, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি যতই অধিক হউক, সমাজ যে তাহার নিজের উপযোগী মানুষ গড়িয়া লয়, একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের সহায়তা বিনা, কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই। তুমি গর্ব্ব করিতেছ, মনে করিতেছ তুমি নিজশক্তি বলে নিজ প্রভাবে আজ বড় হইয়াছ—বুঝি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছ। তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিতেছ। হয়তঃ তোমার সমাজ নানা কারণে শক্তিহীন হইয়াছে, সমাজ আর তোমাকে শাসন করিতে পারে না। তাই তুমি সমাজকে অবজ্ঞা করিতেছ—সমাজশাসন উপেক্ষা করিতেছ। তাই তুমি যথেচ্ছাচার

করিতেছ,—যাহাতে আপনার সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করিতেছ। সমাজের প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেছ না, তোমার কাজে সমাজের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা একবার দেখিতেছ না। সমাজের আর দশ জন লোক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছ না। মূর্খ তুমি, তুমি জান না—সমাজ তোমার পিতামাতা, অথবা পিতামাতা অপেক্ষাও বুঝি বড়। তুমি পণ্ডিত, বিদ্বান হইয়াছ,—তুমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া 'বড়লোক' হইয়াছ,—তুমি জান না যে তুমি সেই সমাজবৃক্ষেরই ফল। তুমি সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাতা হইয়া তোমাকে যেরূপ গড়িয়াছে, তুমি তেমনই হইয়াছ। সমাজ তোমাকে মানুষ করিয়াছে—তাই তুমি মানুষ হইয়াছ। না হইলে—তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিলে পিতামাতাকে উপেক্ষা করা অপেক্ষা অধিক অন্যায় করিবে,—তুমি সমাজদ্রোহী হইলে পিতৃমাতৃদ্রোহী অপেক্ষাও অধিক দুষ্কৃতভাগী হইবে,—তুমি তোমার স্বার্থপর আচরণ দ্বারা সমাজঘাতী হইলে পিতৃমাতৃহন্তার ন্যায় পাতকগ্রস্ত হইবে। সমাজ হইতে তুমি তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তোমার সবই তুমি সমাজ হইতে পাইয়াছ। তুমি 'বড়লোক' হইয়াছ, জ্ঞানী হইয়াছ,—উত্তম। যাহার জন্য তুমি 'বড়লোক', শক্তি থাকে, তুমি তাহার সেবা কর। মনে রাখিও, যে 'বহু'র আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্থক।(১) কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্য কর্ম্ম না কর, যদি নিজের স্বার্থ বা সুবিধার জন্য সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি ভ্রান্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাপী। (২) তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার নিজস্ব যাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্য্য করিতে, তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র

---

(১) দক্ষ সংহিতায় আছে :—

"স জীবতি য এবৈকো বহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীয়ন্তোমৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।
বহ্বার্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুম্বার্থে তথাহপরৈঃ ॥" ৩৩।

(২) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আছে :—

"তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।" ৩। ১২।
"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥" ৩। ১৩।

হইতে সংসারে আসিয়াছে। ভগবানের কার্য্য করি[illegible] উপযোগী হইবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহায়ে গড়িয়া লইয়াছে। জগন্নাথের রথের ন্যায় ভগবানের এই সমাজরথ—এই সমগ্র সংসাররথ, তুমি আমি সকলে মিলিয়া জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত্র স্বরূপে টা[illegible] লইয়া চলিয়াছি। তাই সংসাররথের চক্র নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইতেছে। যে সে রথের মহাডোর ধরিয়া না টানিতে চাহে—যে একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চাহে, তাহার জীবন বৃথা,—সে একদিন না একদিন সেই মহা রথের মহা গতিতে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে (১)।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত মানবের স্বরূপ ও তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেন না, একথা না বুঝিলে সমাজের সহিত মানবের সম্বন্ধ বুঝা যায় না। এই আলোচনা হইতে আমরা ইহা আরও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সমাজ কখনই আমাদের উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহয়। সমাজই আমাদের গড়িয়া লইয়াছেন, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সমাজশরীর বা সমাজাত্মা কাল্পনিক কথা—আমরা ইহাও বলিতে পারি না। মানুষ পরস্পর নিজের সুবিধার জন্য মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া সমাজ গড়িয়া লয়, বা [illegible]জের পরিবর্ত্তন করে, এবং সমাজের ব্যক্তিমানবদের চৈতন্যসমষ্টিই সমাজ[illegible] বা সমাজাত্মা আমরা একথা আর স্বীকার করিতে পারি না। যখন মানুষকেই সমাজ গড়িয়া লইয়া আপনার উপযোগী করিয়া আপন অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তখন সেই মানব-চৈতন্য সমষ্টি সে সমাজচৈতন্য হইতে পারে না, সমাজাত্মা সেই ব্যক্তিচৈতন্য-সমষ্টি হইতে পৃথক্,—আমরা একথা বলিতে বাধ্য হই। এই সমাজাত্মা কে, তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই সমাজাত্মা কে—তাহা জানিতে পারিলে, মানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ আমরা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব।

---

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে :—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥" ৩। ১৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানবসমাজ,—মনুষ্যত্ব,—মানবজাতি।

৩১। আমরা যে সব আত্মার কথা বলিয়াছি, এই সমাজাত্মা কে, তাহা জানিতে হইলে, আমাদের আরও অনেক কথা বুঝিতে হইবে, অনেক দার্শনিক কূট তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। কঠিন ও নীরস হইলেও, আমরা এক্ষণে তাহার সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে সমগ্র মানবজাতির সহিত ব্যক্তিমানবের সম্বন্ধ কি, ব্যষ্টি সমাজের সহিত সমষ্টি সমাজের সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব।

সমস্ত 'ব্যক্তি'র সমষ্টিতে জাতি। আর সমস্ত মানবসমাজ সমষ্টিতে মানবজাতি। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সভ্য অসভ্য সমাজ অনেক আছে। অসভ্য ক্ষুদ্র মানবসমাজ হইতে সভ্য বিস্তৃত মানবসমাজের প্রভেদ বিস্তর। সমাজের আবার বিভিন্ন স্তর আছে। বিভিন্ন মানবসমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই সব বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ। সকল সমাজ একীভূত হইলে, সমস্ত মানব এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত হইতে পারে। সকল সমাজের পূর্ণবিকাশ হইয়া যদি কখন তাহাদের এরূপ একীভূত হওয়া সম্ভব হয়, অথবা যদি সব বিভিন্ন সমাজ মধ্যে একত্বের ভাব বিকাশিত হয়, যদি সব সমাজ একত্রসম্বদ্ধ হয়, তবে এইরূপ বিরাট সমাজের ধারণা হইতে পারে। তখন মানবসমাজে ও মানবজাতিতে প্রভেদ থাকিবে না। বিবর্ত্তন নিয়মে যেমন একত্ব হইতে বহুত্বের বিকাশ হয়, তেমনই তাহার ক্রমপরিণতিতে বহুত্ব পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া—মূল একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বহুত্বে একত্ব জ্ঞান, ও একত্বে বহুত্ব জ্ঞান,—এবং সর্ব্বত্র একত্ব জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ একত্বের ধারণা হইতে পারে। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির ধারণা, ও সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির ধারণা,—আমাদের জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। অতএব

যতক্ষণ আমরা বিভিন্ন সমাজকে ভিন্ন ভাবে দেখিব, ততক্ষণ আমরা আংশিক সমাজবিজ্ঞান লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত সমাজতত্ত্ব জানিতে পারিব না। এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পরস্পর আপাত বিভক্ত অনেক সমাজ হইতে আমরা এক সমষ্টি বিরাটসমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিব।

৪০। আমরা বলিয়াছি,—সমস্ত ব্যষ্টিমানবের সমষ্টি করিয়া, বিভিন্ন মানব সমাজ একত্র করিয়া মানবজাতি। ব্যক্তিসমষ্টি হইতে কিরূপে জাতির ধারণা হয়, তাহা এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা ব্যষ্টির সমন্বয়ে সমষ্টির, ও সমষ্টির বিশ্লেষণে ব্যষ্টির ধারণা করি। এবং উভয় হইতে জাতির ধারণা করি। আবার জাতি হইতে আমরা ব্যক্তির ধারণা করি। জাতি ও ব্যক্তি পরস্পর নিত্য সম্বদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিজ্ঞানের সহিত জাতিজ্ঞান নিত্য অনুস্যূত। জাতিজ্ঞান ব্যতীত ব্যক্তি-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের জাতিজ্ঞান যত বিকাশিত হয়, ব্যক্তিজ্ঞানও তত পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইনি মানুষ,—একথা বলিলে যেমন আমরা ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করি, তেমনই তাহাকে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত মনে করি, তাহাতে মনুষ্যত্বের আংশিক বা বিশেষ বিকাশ ধারণা করি। আর আমাদের জাতিজ্ঞান ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা অনুসারে, সেই মানবে মনুষ্যত্বের বা জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহারও পরিমাণ করিতে পারি। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জাতির অন্তর্গত রূপে ধারণা না করিলে, সেই ব্যক্তিকে আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাহার জাতিত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে, আমরা সে ব্যক্তির ঠিক ধারণা করিতে পারি না। এই জাতি হইতেই জাতিত্বের ধারণা হয়। সমষ্টি মানবজাতি হইতেই মনুষ্যত্বের (বা humanity র) ধারণা হয়। এই জাতি বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনুষ্যত্ব বলিলে, আমরা সাধারণতঃ মনুষ্যের বিশেষভাব, সাধারণ জীবত্ব হইতে তাহার বিশেষত্ব, অথবা মানবজাতির সত্তা কিম্বা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম বুঝিয়া থাকি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা কোন বস্তুর সত্তা স্বভাব বা স্বরূপ জানিতে পারি না। আমরা কেবল তাহার ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি। অর্থাৎ অন্যের সহিত ও আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে, তাহার যে সকল গুণ প্রতিভাত হয়, আমরা কেবল সেই সকল গুণই জানিতে পারি। তাহার গুণ সমষ্টি আমাদের জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হয়, সেই গুণসমষ্টির আধার রূপে

আমরা সে বস্তুর বা দ্রব্যের ধারণা করি। কেন না, আমরা আশ্রয়বিহীন গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। গুণ হইতেই আমরা গুণী বস্তুর অনুমান করি। আর যে শক্তি বলে এই গুণসমষ্টির বিকাশ হয়, বা কার্য্যে পরিণতি হয়, সেই শক্তির আধারকেই বস্তু বলিয়া মনে করি। এইরূপে মানুষের বিশেষ গুণসমষ্টি হইতে মানুষের ভাব বা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। এবং মনুষ্যত্বকে মানবের বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই মানুষ্যভাবের নিম্নতম বিকাশ হইতে উচ্চতম বা আদর্শরূপে বিকাশ—সমুদায় একীভূত না করিলে,—মানুষের সমুদায় গুণের কাল্পনিক পূর্ণ বিকাশ একত্র ধারণা না করিলে, পূর্ণমনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্য মধ্যে যে পশুত্ব আছে—যে সাধারণ জীবধর্ম্ম আছে, তাহার স্থলে যাহাতে, বা যে শক্তি বলে, কেবল মানবধর্ম্মের বিকাশ করে, মানুষকে নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম আদর্শে লইয়া যায়, তাহাই মনুষ্যত্ব। যাহা মানুষের বিশেষ গুণ বা শক্তি, যাহা মানুষকে ধারণ করে, ক্রমোন্নত করে, আদর্শ অভিমুখে লইয়া যায়, তাহাই মানবধর্ম্ম, তাহাই মনুষ্যত্ব। (১) প্রতি মানুষে এই মনুষ্যত্বের

(১) মনুসংহিতাতে এই মানবধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ বা ধর্ম্মের স্বরূপ এই ঃ—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

মনু,—৬। ৯২।

অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থেও এই কথা আছে। যথা ঃ—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,—১। ১২২।

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"

বিষ্ণু সংহিতা,—৬। ৭—৮।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' গ্রন্থে, এই ধর্ম্ম বিকাশে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, ও এই ধর্ম্মের অবনতিতে কিরূপে মনুষ্যত্বের অবনতি হয়, তাহা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে,

ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে। দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া, ও অবস্থাবিশেষের অধীন হইয়া, এই পৃথিবীতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ সম্ভব হয়, ব্যক্তিমানবে তাহার ততদূর বিকাশ হইতে পারে। মনুষ্যত্ব জীবত্বের অংশ। অথবা দেশকালাদি অবস্থা অনুসারে মনুষ্যত্বই এ পৃথিবীতে জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ। আমাদের পৃথিবীর অবস্থা অনুসারে, ইহাতে মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। আমরা অন্য পৃথিবীর কথা জানি না। এই সৌর জগতে অন্য কোথাও, অথবা অন্য সৌর বা নাক্ষত্র জগতের মধ্যে কোন স্থানে, অথবা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কোন কালে, মানব অপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের অভিব্যক্তির কথা আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ধারণা বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। দেবাদি সূক্ষ্ম শরীরী কোন উচ্চতর জীবের কথা সাধনাহীন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব না। আমরা এই পৃথিবীর কথা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠজীব, মনুষ্যত্বই জীবত্বের উচ্চতম বিকাশ।

মানবের বিশেষত্ব তাহার বিশেষ শক্তি বা গুণই তাহার মনুষ্যত্ব। যে সকল গুণের দ্বারা এই মনুষ্যত্ব বা মানুষভাব রক্ষিত ধৃত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহাই মানবধর্ম্ম; আর যে শাস্ত্রে এই ধর্ম্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। আমাদের ধর্ম্মসূত্র গৃহ্যসূত্র স্মৃতি প্রভৃতি এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র।

সে যাহা হউক, মানবধর্ম্মের উক্ত লক্ষণ কিছু সঙ্কীর্ণ। কেবল উক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণা হয় না। তাহা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির এবং চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ বুঝা যায় না। সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা, প্রকৃত মানবধর্ম্মের কথা, কেবল গীতা হইতেই পাওয়া যায়। আধুনিক Culture theory ও এই মনুষ্যত্বতত্ত্ব বিভিন্ন। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি আছে। গীতায় এই জ্ঞান কর্ম্ম ও চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের ও পূর্ণ পরিণতির কথা আছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞানমার্গে, কর্ম্মমার্গে ও ভক্তিমার্গে আমাদের গতি ও মুক্তি বা আদর্শলাভের কথা আছে। পূর্ণ নিত্য জ্ঞান—চিৎ, পূর্ণ কর্ম্ম—সৎ, ও পূর্ণ সুখ—আনন্দ। মানবের এই পূর্ণাদর্শ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান। তিনি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ধারণার উপযোগী এই আদর্শ দেখাইয়া দেন। সেই আদর্শ ধরিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। সেই আদর্শ লাভ হইলেই মানবের মুক্তি হয়। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গীতা হইতে কতকটা এইরূপ মনুষ্যত্বতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতায়, যে পূর্ণমনুষ্যত্বের এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা, সাধারণতঃ আমাদের ক্রমবিকাশশীল মনুষ্যত্ব ধারণা পূর্ণ বিকশিত হইলে, তবে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ব্যক্তিমানবে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বে আমরা যে ভাব শক্তি বা গুণসমষ্টির ধারণা করিতে পারি, কোন মানুষে তাহার পূর্ণবিকাশ আমরা কখন দেখিতে পাই না। অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংসভোজী আণ্ডামানবাসী মানবের ন্যায় জীবে, মনুষ্যত্বের বড় সঙ্কীর্ণ, বড় সীমাবদ্ধ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের মানুষ বলিতেই হয়ত আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। অন্য দিকে আধুনিক সভ্য সমাজে কোথাও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় না। একাধারে পূর্ণজ্ঞানী পূর্ণকর্ম্মী পূর্ণবীর পূর্ণধার্ম্মিক,—এরূপ আদর্শ মানুষ আমরা কোথাও পাই না। অবশ্য আমরা এখানে অবতারের কথা বলিতেছি না। অবতারেও সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের কোন এক বিশেষ ভাবের দেশকালপাত্রোচিত আপেক্ষিক পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সর্ব্বদেশীয় পূর্ণমনুষ্যত্বের পূর্ণআদর্শ—ভগবানের মনুষ্যত্ব কল্পনার পূর্ণরূপ, বুঝি তিনি একবার দেখাইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে সে কথার প্রয়োজন নাই। কোন মানুষে একাধারে পূর্ণমনুষ্যত্বের সকল গুণের পূর্ণবিকাশ কখন দেখা যায় নাই। তাহা অসম্ভব। তবে তাহাতে কোন বিশেষ গুণের দেশকালোচিত পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইতে পারে। তাহাও বুঝি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দেখাইয়া দেন। মানুষ বুঝি নিজের চেষ্টায় সে আংশিক আদর্শও লাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে দেশ কাল পাত্র অনুসারে, কাহারও জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ, কাহারও কর্ম্মশক্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির পূর্ণবিকাশ, কাহারও বা দেহের পূর্ণবিকাশ, কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। একাধারে সকল গুণের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় না। তাই বলিয়াছি, এই সকলের সমষ্টি হইতে আমরা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। আমরা প্রতি মানবের মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ হয়, তাহার সমষ্টি বা একীভূত ধারণা হইতে, আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারি।

৪১। এইরূপে আমরা ব্যক্তির সমষ্টি হইতে জাতির ধারণা করি। মানুষ গো, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তির সমষ্টি হইতে আমাদের সে জাতির ধারণা হয়। জাতি নিত্য, দেশ কাল বিভক্ত সমগ্র ব্যক্তির একীভূত সম্মিলিত রূপ,—সেই জাতির অন্তর্গত সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের ব্যক্তিসমষ্টির একীভূত ধারণা। ব্যক্তি বিশেষ,—সেই জাতির ব্যষ্টি রূপ, দেশ কালে তাহার অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ।

প্রকৃতির শক্তি বলে বিবর্ত্তন নিয়মে, সেই জাতিত্ব হইতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হয়। জাতি কাহাকে বলে? জাতি সমানপ্রসবাত্মক। (১) ভাব বা সত্ত্বার ক্রমানুবৃত্তি বা ক্রমাভিব্যক্তি হেতু—জাতি বা সামান্য। (২) প্রাদুর্ভাব ও বিনাশাত্মক রজঃ ও তমঃ এই দুই শক্তির গুণ দ্বারা যে এক সামান্য সত্ত্বা বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই জাতি। (৩) নিত্য একানুগত প্রত্যয় হেতু অনেকের সমবায়েই জাতি। (৪) ব্যষ্টি অনেক—এই অনেকের সমবায় হইতে পরিজ্ঞাত জাতিভাব বা সত্ত্বার ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র। গোমহিষাদিতে সম্বন্ধি ভেদে ভিদ্যমান সত্ত্বাই জাতি,—সত্ত্বা এক, তাহাই জাতি,—সম্বন্ধিভেদে ব্যক্তিতে তাহা বিভক্ত হইয়াছে। (৫)

ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বাদ দিয়া, কেবল তাহার সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া—অর্থাৎ এক প্রকারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা লক্ষ্য করিয়া (generalisation, abstraction অথবা concept দ্বারা) আমাদের জাতিত্বের ধারণা হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বৈধর্ম্ম্য অপেক্ষা সাধর্ম্ম্য অধিক, তাহাদের সেই স্বধর্ম্ম হইতে, সেই সকল ব্যক্তিকে এক জাতির অন্তর্গত করা যায় না। জাতিবিশেষের সাধারণ আদর্শ প্রথমে কল্পনা করিয়া (type হইতে) তাহা হইতেও সে জাতিজ্ঞান আমরা লাভ করি না। কেন না সে জাতির ব্যক্তি সমষ্টির ধারণা ব্যতীত আমরা সে আদর্শও স্থির করিতে পারি না। আবার কেবল ব্যক্তিগণিত সমষ্টিতেও জাতির ধারণা হয় না। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাহাকে অনন্ত সংখ্যাপর্য্যায়ের যোগফল (বা summation of infinite series) বলেন, ঠিক তাহা হইতে জাতিত্বের ভাব পাওয়া যায় না। বৃক্ষের সমষ্টিতে বন, বা জলের সমষ্টিতে অর্থাৎ জলকণার সম্মিলনে জলাশয়—জাতিবাচক নহে। আমাদের স্মৃতিস্থিত একরূপ বহু ব্যক্তির প্রতিকৃতির একীকরণে ("images

(১) "সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।" ন্যায়দর্শন,—২।২।৩১।।

(২) "ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।" বৈশেষিকদর্শন,—১.২.৪।

(৩) "প্রাদুর্ভাব বিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপৎ গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥"—মহাভাষ্য।

(৪) "নিত্যৈকানুগত প্রত্যয়হেতুরনেক সমবায়িনী জাতিঃ॥"—দশমী।

(৫) "সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥"—বাক্যপদীয়।

of things in the memory melted into one".) হইতেও ঠিক জাতির ধারণা হয় না।

বলিয়াছি, জাতিবিশেষের অন্তর্গত, ব্যক্তিগণের গুণ (১) সমুদায়ের সমষ্টি হইতে আমরা সেই সকল গুণের পূর্ণত্ব ধারণা করি। এবং তাহা হইতে সে জাতি বা জাতিত্ব ও জাতির আদর্শ ব্যক্তির ধারণা করিতে পারি। কোন জাতির একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া একটী ব্যক্তি দেখিয়া তাহা হইতে জাতির ধারণা হয় না। একটী গরু দেখিলে গোত্ব বা গোজাতির ধারণা হয় না। কেন না, সেই ব্যষ্টি গো—গোজাতিত্বের বিশেষ সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। আমরা নানা শ্রেণীর গো দেখিয়া তাহাদের গুণসমষ্টি হইতে, গোত্ব কি তাহা সিদ্ধান্ত করি। এবং তাহা হইতে গো জাতির ধারণা করি। সুধু তাহাই নহে। বৃক্ষত্ব বলিলে আমরা বৃক্ষের সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম মাত্র বুঝি না,—সমগ্র বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের বিশেষ গুণের ও সমষ্টি বুঝিয়া থাকি, এবং যে সামান্ত বা সাধারণ শক্তির দ্বারা কোন বিশেষ বৃক্ষে অবস্থানুসারে এবং বীজে অন্তর্নিহিত সেই শক্তিবলে এই সমষ্টি গুণের বা বৃক্ষত্বের বা বৃক্ষসত্বার বা বৃক্ষভাবের বিশেষ বিকাশ হইয়া থাকে, সেই শক্তির ধারণা হইতে আমরা বৃক্ষজাতির ধারণা করি, এবং সেই শক্তিবলে কোন বিশেষ বৃক্ষে এই বৃক্ষত্বের পূর্ণবিকাশ কল্পনা করিতে পারি। প্রকৃতিঅধিষ্ঠিত জাতিশক্তি বলেই সেই জাতিসত্বা বহুরূপে ব্যক্ত হয়, ও সেই জাতির ব্যক্তি বিশেষে সেই জাতিত্বের বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি হয়, ইহা অনুমান করিতে পারি।

৪২। অতএব এই জাতিত্বই ব্যক্তিত্বের মূল। কিন্তু আমরা কেবল আমাদের সাধারণ জ্ঞানে এই ব্যক্তিত্বই ধারণা করি। এবং ব্যক্তিত্ব হইতে জাতিত্ব কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু প্রকৃত জাতিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। জাতি-সত্বার স্বরূপ বা তাহার শক্তি আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। মায়াবদ্ধ আমরা, আমাদের সসীম অপরিস্ফুট অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে আমরা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির অনুমান করি, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, তাহা হইতে যথাশক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের কল্পনা করি, ব্যক্তি হইতে জাতির ধারণা করি, কতকগুলি দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞানের স্বতঃ সিদ্ধ শক্তি বলে 'ব্যাপ্তি'-

(১) এই গুণের ইংরাজী কথা connotation। ইহা কোনরূপ accident নহে। এই accident বা আগন্তুক ধর্ম্মকে বস্তুর গুণ বা প্রকৃত ধর্ম্ম বলে না।

জ্ঞান লাভ করি, বিশেষ হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, বহুত্ব হইতে একত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যতই অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞান-জড়িত হউক, তাহা সেই এক অনন্ত জ্ঞানেরই আংশিক মায়াবদ্ধ বিকাশ। ভগবানের জ্ঞান পূর্ণ, অনন্ত, মায়াতীত। যিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানে অতীত পূর্ণরূপে প্রতিভাত, সেখানে অতীতও বর্ত্তমান। মহাকাশে যে অতীতের ছাপ্ চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত। যিনি অনন্ত শক্তিরূপ, যাঁহার শক্তি নিত্য অক্ষয়, যাঁহার শক্তিকণা অতীতে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার সেই শক্তি বশে সেই কার্য্যফলই সঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমানে কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার কারণরূপে লীন হইয়া ভবিষ্যতে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত হইবে। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিকাশ। অনন্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতিভাত, অথবা সেখানে ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান। ভগবনের জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ন নহে। সেখানে অতীত ভবিষ্যৎ—সকলই বর্ত্তমান। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ--সমগ্র কালই সে অনন্ত জ্ঞানে সান্ত—সীমাবদ্ধ। সমগ্র দেশকালেই জীবত্বের সকল রূপ বিকাশই সে অনন্ত জ্ঞানে প্রতিভাত। ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে, সমষ্টিরূপে জাতিকল্পনা নিত্য প্রতিষ্ঠিত,—সমগ্র কালে তাহার সমুদায় ব্যষ্টি বিকাশ প্রতিভাত,—এবং দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম আদর্শের বিকাশ পরিকল্পিত। তাহা না হইলে, জ্ঞান অনন্ত হইতে পারে না। যাহা ভগবানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিকল্পিত, তাহাই তাঁহার প্রকৃতিঅধিষ্ঠিত কালশক্তি বশে ক্রমে বিবর্ত্তিত হয়।

মানবজাতিজ্ঞানও এইরূপে ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত। ব্যষ্টি মানবও তাঁহার জ্ঞানে পরিকল্পিত। ব্যষ্টি মানবে তাঁহারই জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। মানুষ ভগবানের অনুগ্রহ সর্গ। বলিয়াছি ত, মানুষই এই পৃথিবীতে জীবকল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষেই ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞানরূপী ভগবান মানুষের হৃদয়মন্দিরে বাস করিবার জন্য তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান তাঁহার উচ্চতর জীবকল্পনাকে শরীরী করিয়া, সত্তাযুক্ত করিয়া, তাঁহার বিরাট জগৎশরীরের এই পৃথিবীরূপ একাঙ্গে অভিব্যক্ত করেন, নিম্নতর জীবকে প্রকৃতির আপূরণে এই মানবরূপ উচ্চতর জীবে পরিণত বা বিবর্ত্তিত করেন। এজন্য মানবাতিরিক্ত ইতর জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের বিকাশের সীমা

সেরূপ আবদ্ধ নহে। ব্যষ্টিমানব, মানবত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। ব্যক্তিমানব—মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ, ও মনুষ্যজাতি-কল্পনার দেশকালসীমাবদ্ধ আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র হইলেও, তাহাতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানরূপী ভগবান মানবহৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মানবজাতির পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণারূপী ভগবানের জ্ঞান প্রত্যেক ব্যষ্টিমানবঅন্তরে অধিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে ধারণ করে। মানুষের এই মনুষ্যত্বের জ্ঞান, এই আদর্শের ধারণা ব্যবহারিক। ব্যবহারিক জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের এই আদর্শ ও এই মনুষ্যত্বের ধারণা ক্রমবিকাশশীল। যত সেই আদর্শজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যতই মানুষের অন্তর সাধনাবলে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে নির্ম্মল হইয়া, অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, মানুষের অন্তরে ততই সেই আদর্শের ধারণা সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই মানুষ সেই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে,—ততই মানব ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া সমষ্টি মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই ব্যক্তিত্বভাব আমাদের মায়ার বন্ধন। (১) জাতিত্বভাবই সত্য,—ব্যক্তিত্বভাব অসত্য। এই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে :—

"সত্যং তত্ত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়োমতাঃ।"

যাহা হউক, ব্যক্তিত্ব ভাব অসত্য, একথা পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে তাহা সত্য, একথা বলা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে ব্যষ্টি-সমষ্টি, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আছে। ব্যক্তিচৈতন্য জীব—প্রাজ্ঞ, সমষ্টিচৈতন্য ঈশ্বর—বিরাট। এই সৃষ্টিতে বহুত্ব ব্যক্তিত্ব নিত্য অভিব্যক্ত। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্ব উভয়ই আছে। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবাত্মা (ব্যক্তিরূপ) ও পরমাত্মা

---

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত সপেনহর, এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানকে মায়ার বন্ধন বলিয়াছেন। ইহাই *principium individuationis*। তিনি বলিয়াছেন,—"If that veil of *Maya*—the *principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all being his own inmost true self......"

World as Will and Idea. Sec. 64.

(জাতিরূপ) বাস করেন। (১) সুতরাং জীবাত্মার ব্যবহারিক অস্তিত্ব সিদ্ধ। অতএব আমাদের শাস্ত্রে—উল্লিখিত ব্যক্তিবাদ (individualism) ও জাতিবাদ (communism)—ইহার মধ্যে বিরোধ নাই। এই উভয় বাদের উপরে উঠিয়া, উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তবে আমরা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারি।

৪৩। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই জাতিত্ব ভাব হইতেই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং ভগবতী দেবী নারায়ণী সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা আছেন। (২) মানুষের এই ব্যক্তিত্বভাবের মধ্যে জাতিত্বের অভিব্যক্তি হইতেই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ, ব্যক্তিমানবকে পূর্ণ মানবত্বের দিকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যায়,—ব্যষ্টিকে সম্মিলিত করিয়া সমষ্টিতে পরিণত করিতে, ও মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। সমাজ, বহুত্বকে সম্মিলিত করিয়া দিয়া একত্বের দিকে মানুষকে লইয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র জ্ঞান মিলাইয়া, সমষ্টিরূপে এক বিরাট শক্তির, এক বিরাট জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লয়, ব্যক্তিত্বকে স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া জাতিত্বের ও পরার্থচেষ্টার বিকাশ করে। বলিয়াছি ত, অনেক মানবের সম্মিলনে এক ব্যষ্টিসমাজ। সমস্ত ব্যষ্টিসমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানব সমাজ—সমগ্র মানবজাতি। জ্ঞানরূপী 'নারায়ণে' মানবজাতির বা সমষ্টিমানবের যে কল্পনা নিত্য অভিব্যক্ত, সমষ্টি বিরাটসমাজের যে ধারণা পরিকল্পিত,—অথবা দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার ক্রমবিকাশের যে ধারণা—মানবত্বের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত যে কল্পনা—হিরণ্যগর্ভরূপী নারায়ণজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত, তাহাই 'নর' (জীবাত্মা) বা মানবজাতি। 'নরোত্তম' সেই কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি—তাহাই আদর্শ মানব। আর সমষ্টীভূত বিরাট সমাজই মানবজাতি বা মানবসমাজ-জ্ঞানময় ব্রহ্মের শরীর,—সেই জ্ঞানের সৎ-রূপ—ভগবানের বিরাট রূপ। অতএব আমরা এই 'নারায়ণ' 'নর' ও 'নরোত্তমকে' স্মরণ করিয়া (৩) ভগবানের এই বিরাট রূপের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

---

(১) 'দ্বে সুপর্ণা ...' এই ঋক্ মন্ত্র—(১.১৬৪.২১) এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—৫।৪১।

(৩) "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।"—এই শ্লোক এস্থলে স্মর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

সমষ্টি মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীর,—
ভগবানই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ,—তিনিই সমাজাত্মা।

৬৪। আমরা পূর্ব্বে যে এক বিরাট সমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই বিরাট সমাজ ভগবানের বিরাট রূপ,—এই মহা তত্ব এক্ষণে আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ তত্ব না বুঝিলে আমরা সমাজ মধ্যে বিরাটরূপী ভগবানের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না, তিনিই যে সমাজাত্মা—তাহা বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ব জানেন, তাঁহাদের একথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে ধারণা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত মনে করেন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন সত্বার ধারণা করিতে পারেন না, যাঁহারা এই ব্যবহারিক জগৎকে ভগবানের বিরাটরূপ বলিয়া ধারণা করেন, যাঁহারা সাধনাসিদ্ধ জ্ঞানবলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা সমাজাত্মা যে ব্রহ্ম তাহা সহজে ধারণা করিতে পারেন। (১) এই সমাজাত্মা যে ভগবান

(১) আধুনিক জড়বাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ এ তত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের Realism এবং Nominalism মধ্যে বিবাদের কথা স্মরণ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন—জাতিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা ব্রহ্মের জাতিকল্পনা বা Idea কে ব্যক্তিত্বের মূল বলিতে চাহেন না, যাঁহারা জাতিজ্ঞানবাচক শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মনুষ্যত্বের তত্ব ও সমাজাত্মার কথা, এবং বিরাটরূপী ভগবানের কথা স্বীকার করিবেন না। যাঁহার ভগবানকে জগতের বাহিরে, অথবা পৃথিবীর বাহিরে স্বর্গে অবস্থিত, পৃথিবীর নিয়ন্তারূপে ধারণা করেন, অথবা

এবং বিরাট মানবসমাজ যে ভগবানের বিরাট শরীর, এ কথা বুঝিবার জন্য, আমরা এস্থলে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমরা বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু জগৎ হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্মেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, অথচ ব্রহ্ম তাহাতে অবস্থিত নহেন। আবার ভূত সকলও তাঁহাতে অবস্থান করে না। (১) ইহাই ব্রহ্মের ঐশ্বরীয় যোগ। আশ্চর্য্য!—ধারণার অতীত! বিলাতী দর্শনের কথায়,— আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম transcendental এবং immanent—উভয়ই। জগদতীত, জ্ঞানাতীত (transcendental) ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত। অক্ষর (absolute, transcendental) পরম ব্রহ্ম—সীমাবদ্ধ দেশকাল নিমিত্ত রূপ মায়া দ্বারা আবৃত মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। শ্রুতিতে আছে, সর্ব্বময় ব্রহ্মের চারি পাদ। (২) তন্মধ্যে এই অক্ষর পরমব্রহ্ম চতুর্থ পাদ। তাহা কালাতীত, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য্য। তাঁহাকে সৎ কি অসৎ, (৩) জ্ঞানময় কি অজ্ঞানময়, (৪) বাস্তব কি শূন্য, (৫) Being কি Naught—কিছুই বলা যায় না।

যাঁহারা ব্রহ্মকে অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত, জগদতীত, transcendental বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা ভগবানের এই বিরাটরূপ স্বীকার করেন না। যাঁহারা নাস্তিক জড়বাদী প্রত্যক্ষপ্রমাণসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের ত কথাই নাই। এস্থলে তাঁহাদের অভিমতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আমরা একথা বলিতে পারি যে, এ সম্বন্ধে ইহাঁরা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, আমাদের মূল আলোচিত বিষয়ের সহিত ইহাঁদের মতভেদ না থাকিতে পারে।

(১) ময়া ততং ইদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। গীতা, ৯। ৪—৬।

(২) এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদসংহিতার পুরুষসূক্ত ও মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ শ্রোতব্য। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছেঃ—"সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুস্পাৎ।" ২।

(৩) অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।—গীতা, ১৩। ১২।

(৪) "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং।"—মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। ৭।

(৫) প্রজ্ঞাপারমিতার শূন্যের লক্ষণা, ও বেদান্তের অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণা এক।

ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাঁহার স্বরূপ—আমাদের এই সীমাবদ্ধ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। কেন না, তাহা 'একাত্মপ্রত্যয়সার'। তবে আমাদের সহিত ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহার অন্য তিন পাদ বা তিন সগুণ রূপ,—অর্থাৎ তাঁহার পুরুষোত্তম বা পরমপুরুষ রূপ (Idea রূপ), হিরণ্যগর্ভ রূপ (Essence রূপ), ও বিরাট রূপ (Being রূপ), আমরা বিশেষ সাধনাবলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারি। আমরা ব্রহ্মের জগৎরূপে বিবর্ত্তিত রূপ ও জগৎ স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা রূপ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই তটস্থ লক্ষণাযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি মাত্র। এবং আমাদের জ্ঞাতারূপে বা জ্ঞাতার জ্ঞাতা রূপেও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি।

আমরা জ্ঞান দ্বারাই তত্ত্বলাভ করিয়া থাকি। সাধনাবলে চিত্তদর্পণ যত নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই জ্ঞানসূর্য্য তাহাতে পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হয়। প্রকটিত বা অপ্রটিত সকল অবস্থাতেই জ্ঞান দ্বৈতাত্মক। জ্ঞানের দুই নিত্য ভাব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। বলিয়াছি ত,আমরা এই 'জ্ঞেয়' বা জগৎতত্ত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা, ও 'জ্ঞাতা'বা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম জ্ঞেয় জগতের পরম কারণ। ব্রহ্ম জ্ঞাতার জ্ঞাতা। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়—প্রজ্ঞাঘন। আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইলে, আমরা জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমায় গিয়া, বা 'বেদান্ত'জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিতে পাই যে, সগুণ ব্রহ্মেরও দুইরূপ,—পরম জ্ঞানময় পরম পুরুষ, আর পরাশক্তিময়ী পরমাপ্রকৃতি। ব্রহ্ম অসীম অনন্ত প্রপঞ্চাতীত। কিন্তু, কি-জানি-কি-রূপে ব্রহ্ম আপনাকে আবরিত পরিমিত বা সীমাবদ্ধ করেন। অথবা তিনি অসীম হইয়াও নিত্য এইরূপ সীমাবদ্ধ। অনন্তের মধ্যে সান্ত নিত্য অভিব্যক্ত। অসীমের মধ্যে 'সসীম' নিত্য অনুস্যূত। এই জন্য ব্রহ্ম—অসীম-সসীম, অনন্ত-সান্ত, সগুণ-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, জ্ঞেয়-অজ্ঞেয়। তিনি এ সকলই, বা এ সকলের অতীত, অথচ এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট। অনন্তের মধ্যে সমুদায় সান্ত ভাবই অভিব্যক্ত। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না, অনন্তের অনন্তত্ব থাকে না। সে যাহা হউক, অনাবৃত অসীম ব্রহ্মের, আপনাকে এইরূপে আবরিত বা সীমাবদ্ধ (limitation) করিবার স্বভাব বা শক্তিই—মায়া। পরিমাণার্থক 'মা' ধাতু হইতে 'মায়া'। যাহা দ্বারা পরিমিত বা সীমাবদ্ধ হওয়া যায়—তাহাই মায়া। অতএব যাহা দ্বারা ব্রহ্ম আপনাকে সীমাবদ্ধ বা পরিমিত করিয়া বিবর্ত্তিত হন, তাহাকেই মায়া বলে। মায়া দ্বারা ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হইয়া, 'সসীম' 'সগুণ' হন। তখন তিনি জ্ঞানময়

পরমপুরুষ ও শক্তিময়ী পরমাপ্রকৃতিরূপে বিবর্ত্তিত হন। তাহার পর, সেই পরম জ্ঞানময়ের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে বিবর্ত্তন হয়। ইহাই মায়ার প্রথম বিকাশ। (১) কিন্তু জ্ঞানময় পরমপুরুষের জ্ঞান এক অখণ্ড অবিকৃত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় একীভূত। সে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে প্রভেদ থাকে না। অথবা সে জ্ঞান—জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই দ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অতীত। সে জ্ঞান আমাদের ধারণার অতীত। যাহা হউক, সৃষ্টিকালে সেই জ্ঞান ব্যাকৃত হয়,—পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় রূপে বিবর্ত্তিত হয়। সেই জ্ঞাতার মায়িক দিক্‌কালরূপে বিবর্ত্তিত আধারে—তখন জ্ঞেয় জগৎ কল্পিত হয়। আমাদের জ্ঞানে সুষুপ্তির পর স্বপ্নে যেমন কাল্পনিক জগৎ প্রতিভাসিত হয়, কতকটা সেইরূপ ভাবে কল্পিত হয়। এইরূপে পরম জ্ঞাতার পরম জ্ঞেয় রূপে বিকাশই,—তাঁহার পরম 'কল্পনা'', 'ভাবনা', 'সঙ্কল্প', 'ঈক্ষণ' বা 'ইচ্ছা''। তাহাই জগৎবীজ হিরণ্যগর্ভ। তাহাই জ্ঞাতার 'বহু' হইবার কল্পনা-রূপে ক্রমাভিব্যক্ত হয়। এজন্য হিরণ্যগর্ভ জগৎকারণ। তিনি অক্ষর—দ্বিতীয় পুরুষ। ব্রহ্মের মায়াজাত এই হিরণ্যগর্ভই পরমজ্ঞাতার দ্বিতীয় অভিব্যক্তি। তিনিই পরমপুরুষের পরম জ্ঞেয়।

৪৫। এই পরম জ্ঞাতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের আরও দুই এক কথা চিন্তা করিতে হইবে। আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, স্ফুট বা অস্ফুট শব্দময়ী ভাষা ব্যতীত—কল্পনা, চিন্তা বা জ্ঞান [illegible]র সম্ভাবনা নাই। 'রূপ' (percept) 'ব্যক্তি'—আমরা ভাষা ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে একরূপ ধারণা করিতে পারি। কিন্তু 'নাম' বা জাতি (বা concept, abstract notion) আমরা শব্দ ব্যতীত চিন্তা বা ধারণা করিতে পারি না। এই জন্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পরম জ্ঞাতার জ্ঞানে যে কল্পনা বা যে ভাবনা অভিব্যক্ত,—তাহা শব্দ ব্যতীত বা নাম ব্যতীত সাধ্য নহে। তাই, ব্রহ্মের বা পরম

---

(১) জর্ম্মণ পণ্ডিত সপেনহর, তাঁহার World as Will and Idea গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধেও জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতভাবই প্রথম অজ্ঞানাবরণ বা মায়ার বন্ধন (Veil of Máyá)। তাহার পর দেশকাল ও নিমিত্ত বা কার্য্যকারণজাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়াই জ্ঞানের দ্বিতীয় আবরণ। তাহার পর (প্রাক্তন জন্মজ ?) বাসনা (বা will) দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জ্ঞানের তৃতীয় আবরণ। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সপেনহরের পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ জ্ঞানের এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপ দ্বৈতাবরণের কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝান নাই।

পুরুষের সে কল্পনা 'নাম'ময়ী—শব্দরূপা। তাই কার্য্যব্রহ্ম নামরূপ শব্দময়। এ কারণ ব্রহ্মকে—ওঙ্কার—শব্দব্রহ্ম—Idea—*Idee*—Logos—Word—*Sophia*—বলা যায়। এবং কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের শক্তিকে সরস্বতী বলা হয়।

শব্দার্থক বা বৃদ্ধ্যর্থক বৃহ্ ধাতু হইতেই ব্রহ্ম। যিনি 'কল্পনা', Idea, Logos, বা পরমপুরুষরূপে ব্যাপ্ত বা বিবর্ত্তিত হন,—অথবা যাঁহার কল্পনা বা Idea অনুসারে তদনুরূপ জগৎ ব্যক্ত বা বিবর্ত্তিত হয়,—তিনিই ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে বহু হইবার সঙ্কল্প নিত্য বিকাশিত। এই জন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"স অকল্পয়ৎ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।" এইরূপে পরমপুরুষের জ্ঞানে অসংখ্য অনন্তরূপ কল্পনা বা Ideaর বিকাশ হয়। তাই তাঁহার হিরণ্যগর্ভরূপে এই কল্পনা অসংখ্য হইয়া পড়ে। এই সব মূল Ideas বা বহু কল্পনাই 'নাম', ইহাই মূল জাতিজ্ঞান। আর পরম পুরুষের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি অনুসারে, এবং তাঁহার কর্ম্মশক্তি বা প্রকৃতি বলে, তাঁহার এই বহুধাকৃত সঙ্কল্প তাঁহারই কালশক্তি প্রভাবে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত (realised) হয়। তাঁহার ভাবনা—ভাবরূপ হইতে সৎরূপে পরিণত হয়। ইহা হইতে 'রূপ'। ইহা হইতেই নামরূপময় জগৎ। এই নাম—জাতি, আর রূপ—ব্যক্তি। যাহা হউক, সেই জ্ঞাতা ব্রহ্মের কল্পনাই দিক্‌কালময়ী ব্রহ্মজ্ঞান হেতু জ্ঞেয়রূপে ব্যাকৃত হয়,—ও ক্রমবিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্পযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রথমে যাহা জ্ঞেয়রূপ পরিকল্পিত, ব্রহ্মের মায়া বা ইচ্ছাশক্তি বলে তাহাই ব্রহ্মসত্তায় সৎরূপে বিবর্ত্তিত। ব্রহ্মজ্ঞানস্থ কাল্পনিক বা মায়িক বা প্রতিভাসিক জগৎ, তাঁহার শক্তিবলে ব্যবহারিক সত্য জগতে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে তাঁহার 'বাক্' অর্থসম্পৃক্ত হয়। এই জন্য ব্রহ্মে 'Thought' এবং 'Being' বা 'Extension' একই। (১) এবং এই জন্য

---

(১) বিলাতী পণ্ডিতদের মধ্যে স্পাইনোজা ও হেগেল্ এই কথা বুঝাইয়াছেন। হেগেল্ আরও বুঝাইয়াছেন যে, যে নিয়মে ব্রহ্মের অব্যাকৃত জ্ঞান ক্রমে ব্যাকৃত হয়, মূল এক কল্পনা—বহু হইয়া বিকাশিত হয়, জগৎ ও সেই নিয়ম অনুসারে তাঁহারই কালশক্তিবশে ক্রমাভিব্যক্ত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেই ব্রহ্মজ্ঞানের (Absolute Reasonএর) সহিত একস্বভাব। এই জন্য জ্ঞানের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বুঝিলে, আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগতের ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝিতে পারি। হেগেল্, তাঁহার লজিক্ (Logic) গ্রন্থে এই কথা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার লজিক্ ও Logos-বিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান একই।

তাঁহার Thought ও Extension দুই নিত্য ভাব। 'ওঁ' অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ বা চিৎস্বভাব জ্ঞানময় ব্রহ্মে, 'তৎ' বা জ্ঞেয়রূপে কল্পিত 'ইদং' বা জগৎবীজ, 'সৎ'-রূপে পরিণত হয়। অতএব 'ওঁ তৎসৎ'ব্রহ্মের সেই নামরূপময়ী সংকল্প অনুসারে ব্রহ্মের মহাশক্তির কার্য্যরূপে বিকাশই তাঁহার বিরাটরূপ। এই বিরাটই তৃতীয় পুরুষ। পরম পুরুষের বহুকল্পনাময়ী হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে, তাঁহার পরাশক্তিবলে সেই বহুকল্পনার সৎরূপে বা কার্য্যরূপে যে অভিব্যক্তি, তিনিই এই বিরাট। তিনিই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয়। তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ। (১)

এই রূপে পরমজ্ঞাতাই পরম জ্ঞেয় রূপে অভিব্যক্ত হন। জ্ঞাতা পরমপুরুষই শব্দব্রহ্ম হইয়া—বা মায়া বলে পরমজ্ঞেয়রূপে পরমাপ্রকৃতিরূপিনী মহৎব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হন। তখন প্রকৃতি সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু—চৈতন্যরূপিনী হন। এবং ব্রহ্মের সংকল্প অনুসারে জগৎকে ক্রমে তাঁহার কালশক্তি বশে সৎরূপে বিবর্ত্তিত করেন। অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাঁহার জ্ঞানময়তপোযুক্ত ইচ্ছা বা ঈক্ষণশক্তি বলে, তাঁহার (Ideas বা) বহুসংকল্পবীজ অথবা হিরণ্যগর্ভরূপ মহাতেজোময় বীজ—মহৎব্রহ্মরূপিনী পরমাপ্রকৃতিতে নিষেক করিলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষের মায়িক কল্পনা তাঁহার প্রকৃষ্ট কর্ম্মশক্তি বা প্রকৃতি (২) বলে কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইলে,—পরমজ্ঞান ও পরমকর্ম্মশক্তি একীভূত হইয়া কার্য্যোন্মুখ হইলে, বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্বের বা হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি হয়। এই হিরণ্যগর্ভই এক অর্থে চিন্ময়ী প্রকৃতির প্রথম বিকাশ। ক্রমে তাহা হইতে এই বিরাটরূপ জগতের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মের এই কল্পনা বা জ্ঞানই

(১) বিলাতী দার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেল্ বোধ হয় কতকটা আমাদের শাস্ত্রের এই গূঢ় অর্থ অবলম্বনে, তাঁহার Philosophy of Religion গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের 'Trinity'বাদ বুঝাইয়াছেন। এই 'ত্রিত্ব' মধ্যে God, the Father—পরমপুরুষ। God, the son বা খ্রীষ্ট—দ্বিতীয় অক্ষরপুরুষ। তিনিই পরমপুরুষের জ্ঞেয়। আর Holy Ghost বা Procession of the Spirit, তৃতীয় পুরুষ,—জগতের ক্রমবিকাশ শক্তি—বিরাট। তিনি দ্বিতীয় পুরুষের—জ্ঞেয়। হেগেল্ এই জন্য Procession of the Spirit কে সমাজাত্মা—বিশেষ-রূপে খ্রীষ্টানসমাজের আত্মা বলিয়াছেন, এবং এই শক্তিবলে সমাজের ক্রমবিকাশ হয়, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা স্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে।

(২) প্র পূর্ব্বক কৃ ধাতু হইতে প্রকৃতি।

কেবল 'শব্দ' বা 'নাম' দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে। তাই জ্ঞাতা পরমপুরুষের হিরণ্যগর্ভ বা শব্দব্রহ্মরূপে প্রথম বিকাশ হয়। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা আরও এক তত্ত্বের উল্লেখ করিব। যেমন সেই 'শব্দ' দ্বারা এক দিকে জ্ঞানের বিকাশ হয়—ব্রহ্মের সংকল্প 'বহু' হইয়া পড়ে, যেমন মায়াশক্তি বলে, অথবা নানারূপে বিকাশিত মায়া দ্বারা, বিভিন্নরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকল্পনা বহু হইয়া বিবর্ত্তিত হয় (১), তেমনই ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া সেই শব্দ, তাহার 'এজৎ' বা অনুকম্পন ক্রিয়া দ্বারা, এক দিকে 'প্রাণ'শক্তি রূপে ও অন্য দিকে আকাশ-রূপে, ও তাহা হইতে জীবজড়ময় ভৌতিক জগৎরূপে বিকাশিত হয়। (২) এইরূপে ব্রহ্ম নিজশক্তিবলে 'কার্য্যব্রহ্ম' হইয়া, তাঁহার সেই শব্দময়ী কল্পনাকে বিকাশ করেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, অক্ষরপুরুষের প্রথম বিকাশ—শব্দব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভরূপে, এবং তাঁহার দ্বিতীয় বিকাশ—কার্য্যব্রহ্মরূপে বা বিরাট রূপে হইয়া থাকে। (৩) এই হিরণ্যগর্ভরূপী শব্দব্রহ্ম হইতে বেদের অভিব্যক্তি হয়। শব্দ দ্বারা প্রকটিত ব্রহ্মের কল্পনা যে নিয়মে বহু হইয়া বিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী অক্ষরপুরুষের জ্ঞান যে নিয়মে বহুরূপে ব্যাকৃত হয়,—তাহাই বেদ। সেই বেদ অনুসারে ও ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি বলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। এই জন্য এই বেদই জগতের মহাগ্রন্থ—এই বেদানুসারেই জগৎ বিবর্ত্তিত হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেই মহাবেদ লাভ করিতে পারি না। তবে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন সর্ব্বজ্ঞ তাহা আংশিকরূপে লাভ করিতে পারে,—এবং সেই বেদ লাভ করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব কতকটা ধারণা করিতে পারে। (৪)

(১) "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২। ৫। ১৯।

(২) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। কঠশ্রুতি, ৬। ২।

(৩) "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।"—গীতা, ৩। ১৫।

(৪) জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের Transcendental Logic বা Logos-বিজ্ঞান কতকটা যে এই অর্থে ব্যবহৃত, তাহা পূর্ব্বের টীকায় (৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত হইয়াছে। হেগেলের মতে, Logic is the theory of thought and being in one. (Falckenberg's History of Philosophy দ্রষ্টব্য।) "Logic is the science of the pure Idea......of God or the Logos...Logic considers the self movements of the Absolute from the most abstract conceptions......to the most concrete conceptions." (Ueberweg's, History of Philosophy দ্রষ্টব্য।)

পরমপুরুষের যে জ্ঞান এইরূপে বহু হইয়া ক্রমে ব্যাকৃত হয়,—ব্যাপ্ত হইয় সৎ-রূপে বা জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়—বলিয়াছি, যে জ্ঞান হইতে জগৎবীজ হিরণ্যগর্ভের বিকাশ হয়,—তাহাই জগতের পিতৃশক্তি। আর ব্রহ্মের যে পরাশক্তি বলে, তাঁহার পরমাপ্রকৃতিরূপিনী 'মহৎ'গর্ভে তাঁহার সেই সংকল্প বীজের পুষ্টি ও সৎরূপে অভিব্যক্তি হয়,—যে পরমাপ্রকৃতির মমতাময়ী শক্তিবলে, কার্য্যরূপে জাত—সেই বহু কল্পনার পোষণ বর্দ্ধন ও ক্রমপরিণতি হয়, তাহাই মাতৃশক্তি। এই পিতৃমাতৃশক্তি বলেই এই অনন্ত জড়জীবময় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পরিণতি হয়। (১)

যাহা হউক, সেই বিরাটরূপী ভগবানের এই বিরাট অভিব্যক্তির কথা, পিতৃমাতৃশক্তি রূপে এই জীবজড়ময়ী জগতের রক্ষণ ও পালনের কথা আমাদের এস্থলে আলোচ্য নহে। মহৎব্রহ্মে উপ্ত—ভগবানের এই বহুসংকল্পবীজময়

---

(১) আমরা এস্থলে ব্যবহারিক জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছি। যাঁহারা আমাদের নিজের কল্পনা হইতে নিজজ্ঞানে উদ্ভাসিত জগৎ মাত্র স্বীকার করেন, যাঁহারা প্রতিভাসিক জগৎ ব্যতীত ব্যবহারিক জগৎ স্বীকার করেন না,—তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে কল্পিত জগৎ মাত্র স্বীকার করেন, জগতের ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিভাসিত কাল্পনিক অস্তিত্ব ব্যতীত তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা জীবজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ বা প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়া, ব্রহ্মের জগৎকল্পনা জীবজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাসিত—একথা সিদ্ধান্ত করেন,—তাঁহারা মায়াবাদী। আর যাঁহারা ব্রহ্মের জগৎকল্পনাকে ব্রহ্মশক্তিবলে ব্রহ্মসত্তায় সৎ-রূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত বলিয়া স্বীকার করেন, ও এইরূপে জড়জীবময় জগতের নিত্যত্ব ও সত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেবল সগুণ (বা Immanent) ব্রহ্মবাদী। আর যাঁহারা ব্রহ্মের এই সগুণভাবকে—এই জগৎকে কেবল ব্যবহারিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মের অদ্বয় জগদতীত (transcendental) ভাবই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। এই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে উঠিয়া, Transcendont ও Immanent ব্রহ্মবাদের বাহিরে গিয়া, উভয়কে একীভূত (বা synthesis) করিয়া, তবে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। প্রকৃত তত্ত্ব—দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে।——

'ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পরমার্থিকং।'—দক্ষ সংহিতা, ৭।৪৮। আমরা যথাসাধ্য এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, এবং মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও শক্তিবাদ সামঞ্জস্য করিয়া, তন্মূলে সমাজাত্মা ও সমাজশরীরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্মের—কিরূপে ব্রহ্মের কালশক্তি বা পরিণতি করিবার শক্তি বলে জন্ম বৃদ্ধি ও লয় হয়, কিরূপে সেই এক নিয়মে সৃষ্টির পর লয়, ও লয়ের পর সৃষ্টি অনাদি অনন্তকাল চলিতে থাকে, সে তত্ত্ব এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। এস্থলে আমরা কেবল পরমপুরুষের পরম জ্ঞানে হিরণ্যগর্ভরূপে সংকল্পিত মানবজাতি ও মানবসমাজ রূপ মহাভাব বা মহাকল্পনা (Idea,) এবং এই বিরাট জগতের একাংশে মাতৃরূপিনী পরমাপ্রকৃতির পরাশক্তি বলে সে কল্পনার অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ তত্ত্ব যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

৪৬। এ কথা বুঝিবার জন্য, আমাদের এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আলোচনা করিতে হইবে। ব্রহ্মের কার্য্যশক্তি বা পরাপ্রকৃতি বলে ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞেয় বা পরিকল্পিত জগতের দুই রূপ অভিব্যক্তি হয়। জীব ও জড়, বা আত্মা ও অনাত্মা, অথবা চিৎ ও অচিৎ—সেই দুই রূপ। এই জন্য, অর্থাৎ এই প্রকৃতির কার্য্য জন্য, এ উভয়কেও প্রকৃতি বলে। ইহার মধ্যে জীব—পরাপ্রকৃতি, আর জড়—অপরাপ্রকৃতি। জীব—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই, জড়—সুধু জ্ঞেয়। জীব অনেক ও অনেক জাতীয়। আব্রহ্মস্তম্ব সমুদায়ই জীব। দেশকালে সীমাবদ্ধ হেতু পরম পুরুষের সেই জীবরূপী কল্পনা বিকাশের ক্রম আছে। এই জন্য অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনার অভিব্যক্তি হয়। বলিয়াছি ত, সেই কল্পনা ব্রহ্মপ্রকৃতি বলে সৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়। জাতিরূপিনী সেই প্রকৃতির জাতিশক্তি বা জাতিরূপের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বলা উচিত যে, এই জাতি দ্বিবিধ—পর ও অপর। পর জাতি অবিশেষ। সেই এক অবিশেষ সত্তার বিবর্ত্তনে এই জগতের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা হইতেই বিশেষ সত্তা বা অপর জাতির অভ্যুদয় হয়। সেই অপর জাতি আবার সামান্য বিশেষ ভাবে আমাদের জ্ঞানে অবস্থা বিশেষে গৃহীত হয়। মানুষ—আমাদের সম্বন্ধে সামান্য জাতি, কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বিশেষ জাতি। যাহা এক অবস্থায় সামান্য জাতি (*genus*), তাহাই অন্য অবস্থায় আমাদের জ্ঞানে উচ্চতর জাতির (*genus* এর) অন্তর্গত হইয়া বিশেষ জাতি (*species*) হয়। আমাদের জ্ঞানে যে রূপেই এই জাতিজ্ঞানের বিকাশ হউক, ব্রহ্মজ্ঞানে এক পরজাতিকল্পনা হইতেই তাহা ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইয়া বহুজাতিকল্পনার বিকাশ হয়—তাহা হইতে প্রকৃতির জাতিশক্তিবলে বহু জাতির ক্রমবিকাশ হয়। এই রূপে পরমপুরুষের এক অবিশেষ কল্পনা বা পরজাতি ভাব, বহুরূপে ব্যাকৃত হইবার

সংকল্প বশে, হিরণ্যগর্ভ রূপে বিশেষ ভাবে ও বহুরূপে প্রকৃতিবলে ব্যাকৃত ও বিবর্ত্তিত হয়, ও এই প্রকারে বিরাটরূপে বহু জাতীয় জীবের বিকাশ হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞাতারূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট। হিরণ্য-গর্ভই সেই জ্ঞাতা অক্ষরপুরুষ রূপ। জীবেও তিনি অধ্যাত্মরূপে, অনুচৈতন্যরূপে, কূটস্থরূপে, ক্ষরপুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। জীবেই পরমপুরুষের জ্ঞাতাস্বরূপের আংশিক অভিব্যক্তি হয়,—অপরিস্ফুট, সীমাবদ্ধ, দেশকালনিমিত্তরূপ মায়াবশে ব্যষ্টিভাবে তাহার বিকাশ হয়। এই আংশিক খণ্ডিত জ্ঞাতারূপ জন্যই—জীব পরাপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি—তাহারও জ্ঞেয়। এইরূপে ব্যক্তিজীবে ব্রহ্মজ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট। জীবত্বের ক্রমবিকাশ ও জাত্যন্তরের সহিত প্রত্যেক জীবজ্ঞানে তাহার সত্তারূপে নিম্নতর জাতিজ্ঞান ও জাতিভাব হইতে উচ্চতর জাতিজ্ঞান ও জাতি-ভাবের ক্রমবিকাশ হয়। মানবে সেই জীবজ্ঞান পূর্ণ বিকাশিত। মানবই জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ। মানবের হৃদয়েই জ্ঞানরূপী ভগবান তাঁহার উপযুক্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন—বলিয়াছি। যাহা হউক, ব্রহ্মের কালশক্তি বশে ও এই ক্রমবিকাশ নিয়মে—প্রত্যেক জীবপ্রকৃতির আপূরণের সহিত ও জীবজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হেতু, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবের ক্রমে জাত্যন্তরপ্রাপ্তি হয়, (১) এবং জীবকে ক্রমে ক্ষুদ্র-জীবাণু অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশিত মানব জাতিতে উন্নীত হইতে হয়,—এবং মানবত্ব লাভ করিবার জন্য জীবকে নানাজাতীয় জীব স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। (২) জীবজ্ঞানকে, জীবাণুতে সুপ্ত অবস্থা হইতে, ইতরপ্রাণীতে স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া, পরে মানবেই পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আসিতে হয়। এবং সে জন্য, হয়ত কত যুগযুগান্তর, কত কোটী কোটী বৎসরের প্রয়োজন হয়। (৩)

(১) "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"—পাতঞ্জলদর্শন,—৪। ২।

(২) বিলাতী পণ্ডিত (Darwin) ডারুইন্ সাহেব, জাতির ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, বহু জাতির মধ্যে একত্ব সংস্থাপন, ও এক পরজাতির বহুরূপে ক্রম-বিকাশতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝান নাই। তাহা এপর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধারণা করিতে পারেন নাই।

(৩) A spirit which sleeps in the stone, dreams in the animal, and awakes in man."

Schopenheaur's "Fourfold Root."

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি বলে,—ব্রহ্মের এই অসংখ্য জাতীয় জীবকল্পনাসমষ্টির বহুরূপে প্রথম বিকাশই মহত্তত্ত্ব। তাহাই হিরণ্যগর্ভ,—তাহাই জ্ঞানরূপে এ জগতে অনুপ্রবিষ্ট ও বিবর্ত্তিত। তাহাই এক অর্থে ব্যষ্টিজীবে অনুপ্রবিষ্ট—ব্রহ্মজ্ঞানসমষ্টি বা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে, প্রথমে যে নানা জাতীয় জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হয়,—তাহাই সে হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। সেই বহুরূপে ব্যাকৃত জাতিকল্পনা—অপরা প্রকৃতিতে বা জড়জগতে অধিষ্ঠিত ও দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া, বহুরূপে বিভক্ত হইয়া, বা ব্যষ্টি রূপে শরীরী হইয়া যে অভিব্যক্ত হয়, বা পরমাপ্রকৃতির সহায়ে বিবর্ত্তিত হয়, বলিয়াছি ত, ইহাই হিরণ্যগর্ভের বিরাট সৃষ্টি। হিরণ্যগর্ভের প্রত্যেক জাতি কল্পনা এইরূপে ব্রহ্মের পরাশক্তি বলে, দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্যষ্টি বা বহুরূপে বিরাটশরীরে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার মানবজাতিকল্পনাও এই বিরাট শরীররূপে অভিব্যক্ত। সমাজরূপে সেই মানবত্বের বা মানবজাতিত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপেরও ক্রমাভিব্যক্তি হয়। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালে, ও সমগ্র দেশে সেই মানবকল্পনার ব্যষ্টি বা বিশেষ অভিব্যক্তির সমষ্টিতে এক বিরাট মানবসমাজ। এই জন্য সেই বিরাটসমাজ ভগবানের বিরাট রূপ। হিরণ্যগর্ভের সমষ্টিমানবকল্পনা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত বা শরীরী হইবার জন্যই বিভিন্ন মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি সমাজ সেই বিরাট সমাজশরীরের অঙ্গ বা অংশ মাত্র। প্রত্যেক মানবসমাজ ভগবানের সেই ব্যষ্টি সমাজশরীরের অংশ বা উপকরণ। বলিয়াছি ত, প্রত্যেক মানবের মানবত্ব সেই সমাজ সহায়েই ক্রমবিকাশিত হয়।

৪৭। আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবানের অনন্ত জ্ঞানে সমগ্র মানবজাতি বা সমস্ত মানবসমাজ এক। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—সমগ্র কালের মানব সমষ্টির কল্পনা হইতে, আমরা সেই এক অখণ্ড বিরাট মানবসমাজের কতকটা ধারণা করিতে পারি। এই বিরাট সমাজে মানব-প্রবাহ অনন্ত। প্রতিদিন লক্ষাধিক লোক জন্মিতেছে, প্রায় লক্ষ লোক মরিতেছে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজ অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নিত্য মানবপ্রবাহ মধ্যে এক অখণ্ড মানবত্ব, এক অনন্ত মানবসমাজ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। বলিয়াছি ত, এই সমগ্র মানবসমাজ ভগবানের বিরাট শরীরের এক অংশ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজ

সেই এক বিরাটসমাজের আংশিক ব্যষ্টি বা সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। ভগবানের সমষ্টিমানব বা মানবজাতির ধারণা হিরণ্যগর্ভের মানসসৃষ্টি রূপে ক্রমে প্রকট হইয়া, এই বিরাটরূপে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের কথায়, ইহা স্বয়ম্ভুর শরীর গ্রহণ। ক্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে থাকে। যেমন নিম্নতর জীবত্ব হইতে উচ্চতর জীবত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ক্রমবিকাশিত হইতে থাকে, তেমনই মনুষ্যত্বের নিম্নতম বিকাশ হইতে, উচ্চতম বা কাল্পনিক আদর্শের বিকাশ সমুদায়ই যথাসম্ভব অভিব্যক্ত হইতে থাকে। দেশকাল ও নিমিত্ত অনুসারে সেই মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যধর্ম্মের যেখানে যখন যেরূপ বিকাশ নিয়মিত হয়, সেখানে সেইরূপ বিকাশ হইতে থাকে। সমষ্টি মানবত্বের ক্রমবিকাশ জন্য—খণ্ড মানবসমাজ। ব্যষ্টি মানবে এই সমষ্টিমানব বা পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি জন্য—এক কথায় মানুষের ক্রমোন্নতি জন্য, তাহার ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার ও বাসনা সংযত করিয়া জ্ঞানস্বরূপে অধিষ্ঠান জন্য—এই ব্যষ্টি খণ্ড মানবসমাজ। আমরা দেখিয়াছি যে, সমাজ মাত্রেই পরার্থ সংহত, অর্থাৎ তদন্তরস্থ আত্মা বা চৈতন্যের প্রয়োজন জন্য অভিব্যক্ত। আমরা দেখাইয়াছি যে, কেবল সমাজ সহায়েই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। যে ব্যষ্টিসমাজ যেরূপ পরিণত, সে সমাজে ব্যক্তিমানবে তদনুরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। বিরাটরূপী ভগবান যখন যে সমাজে যেরূপ মনুষ্যত্ব বা মানবধর্ম্ম সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, সে সমাজে সেইরূপ মনুষ্যত্বই বিকাশিত হইতে পারে। সুতরাং এই মনুষ্যত্ব বিকাশ জন্যই সমাজ সংহত। ভগবান সমাজশরীর রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া সমাজাত্মা রূপে সেই সমাজশরীরে অধিষ্ঠিত হন। ভগবান তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিকাশ জন্য সমাজাত্মারূপে তাঁহার প্রত্যেক ব্যষ্টি সমাজশরীরে অবস্থান করেন।

আমরা এতদূর যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, সমাজ-শরীরান্তর্গত এই চৈতন্য, এই সমাজাত্মা—হিরণ্যগর্ভ, অথবা পরমপুরুষ। প্রত্যেক দেহকে ক্ষেত্র বলে। এবং তদধিষ্ঠিত চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। স্বয়ং ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রতিশরীরে (সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে) অধিষ্ঠিত। বিরাট সমাজক্ষেত্রে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার মনুষ্যত্ব কল্পনার সৎরূপে পরিণতি জন্য, ক্রমবিকাশ জন্য, প্রকৃতির সহায়ে তিনি সমাজশরীর সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিমানব ভগবানের সেই সমাজশরীরের উপকরণ মাত্র। ভগবান পরম জ্ঞাতারূপে সেই সমাজক্ষেত্রে

ক্ষেত্রজ্ঞ। আর সমাজশরীর সেই শরীরাভিমানী আত্মারূপে—বা পূর্ণ অখণ্ড মনুষ্যত্ব ভাবে--তিনি হিরণ্যগর্ভ। সমগ্র মানবসমাজ সেই হিরণ্যগর্ভের বিরাট রূপ। হিরণ্যগর্ভের বিভিন্ন জীব সৃষ্টি কল্পনা বীজই—মনু। 'মনু'—জীব ভাবের ও সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় জীবকল্পনার সমষ্টি। সেই মনু—বিরাট হইতেই অভিব্যক্ত। এই জন্য মনু বিরাটের সন্তান। মনু হইতেই প্রজাপতি দেব গন্ধর্ব মানুষ কীট তৃণ প্রভৃতি সকল জাতীয় জীবত্বের অভিব্যক্তি হয়। (১) বলিয়াছি ত, মানবই এ জগতে জীবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এজন্য মানবজাতিই বিশেষরূপে মনুর সন্তান। প্রত্যেক মানব এই সমষ্টি মনুষ্যত্বের,—শ্রেষ্ঠ জীবত্বের বা এই মনুভাবের ব্যষ্টি বিকাশ। এই জন্য মানব—মনুর সন্তান। (২)

এইরূপে আমরা বিরাট মানবসমাজের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝিতে পারি। এইরূপে আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব ধারণা করিয়া, তাহা হইতে এক বিরাট সমাজশরীরের কথা ও সমাজাত্মা ভগবানের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহারা, বর্ণতত্ত্ব অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বা বর্ণ ও তাহার কার্য্য-বিভাগতত্ত্ব বুঝাইবার সময়, এবং ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণ যে বিরাট সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাহা হিরণ্যগর্ভ হইতে অভিব্যক্ত—ইহা বুঝাইবার সময়, এই কথা আরও পরিষ্কার রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সে যাহা হউক, আর্য্যঋষিগণের উল্লিখিত, এই বিরাট সমাজশরীর ও সমাজাত্মার কথা, আজ কাল কোন্ কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ সমগ্র মানবজাতির একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র বিভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিয়া—'Humanity' বা মনুষ্যত্ব রূপ বা মানবজাতি রূপ বিরাট মানবসমাজের আভাষ দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জন দার্শনিক পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফরাসি দার্শনিক কোম্‌ত্—ইহাঁদের অগ্রণী। তাঁহার ধারণা অপরিস্ফুট বটে। কিন্তু বলিয়াছি ত, তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সমাজের ধারণার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের উন্নতির পথ

---

(১) মনুসংহিতা,—১। ৩৩—৪১। দৃষ্টব্য।

(২) কেহ কেহ বলেন, দক্ষকন্যা মনু হইতে মানুষের জন্ম বলিয়াই 'মানব' নাম হইয়াছে। একথা সঙ্গত ঠিক নহে।

উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই 'হিউম্যানিটি' ব্যতীত অন্য ঈশ্বরই স্বীকার করেন নাই। ইহাঁর পর, জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রচারিত চুক্তিমূলে সমাজসৃষ্টিবাদ তাদৃশ—সঙ্গত বিবেচিত না হইলেও, তিনিও সমগ্র মানবসমাজ মধ্যে একত্ব (১) ধারণা করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন ব্যষ্টি সমাজ সেই একত্বের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে (২), ইহাও বুঝিয়াছিলেন। জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্তে বোধ হয় আরও বিশদরূপে সমগ্র মানব জাতির এই একত্ব ধারণা করিয়াছিলেন। মানবজাতি যে সেই সগুণ (Immanent) ব্রহ্মের প্রাণশক্তির বিকাশ,—তাহা যে ব্রহ্মের মহাকল্পনার একমাত্র সার অভিব্যক্তি, মনুষ্যত্ব যে এক—অবিভক্ত,—দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া নানারূপে বিভক্ত হইলেও মূলতঃ মানুষ যে এক,—মানবজাতি অপেক্ষা উচ্চতর জাতিকল্পনা যে ব্রহ্মজ্ঞানে, কখন বিকাশিত হয় নাই—তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন। (৩) জর্ম্মাণ

---

(১) ক্যাণ্টের কথা এইরূপ:—

"In other words, Kant allows that, in order to give rational meaning to the history of man, we are obliged to take the point of view of humanity, and treat the whole life of the race, as if it were the continuous development of one immortal being, who could realise its "Idea" as a being endowed with reason, "only in the species and not in the individual;" but he maintains that if we take this point of view, it is possible to regard the whole of History as a process towards an end, determined by the "Idea of Man."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 549.

(২) এ সম্বন্ধে ক্যাণ্টের কথা এইরূপ:—

"We must also remember that the same necessity which makes the individual submit to the rules of law in one society, is working to drive all societies into an alliance, and that ultimately it points to the Idea of Universal Civil Society, by which alone a perfect equillibrium of man's impulses—of his impulse towards unity and his impulse towards liberty—can be secured."

E. Caird's Critical Philosophy of Kant. Vol. II. P. 552.

(৩) ফিক্তের (Fichte) কথা এই:—

"*This living and visible Manifestation of the Devine Life,* we call Human race. * * * As Being—absolute Being, constitutes Devine Life, and is wholly exhausted therein, so does

পণ্ডিত হেগেল, তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ববিচার গ্রন্থে, সমাজশরীর দ্বারা আত্মার ক্রমিক বিকাশতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। (১) আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের প্রকাশিত এই তত্ত্ব,—ইটালির অসাধারণ কর্ম্মবীর মহামতি ম্যাট্‌সিনি তাঁহার প্রচারিত "মানুষের কর্ত্তব্য" আখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থে অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। (২) ইহা হইতেই আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই এক বিরাট

---

existence in Time or Manifestation of the Divine Life constitute the whole united Life of Mankind and is thoroughly and entirely exhausted therein. Thus in its Manifestation the Divine Life becomes a continually Progressive Existence. * * The progressive culture of the human Race is the object of the Divine Idea. * * The Life of Man which in truth is essentially one and indivisible, is divided into the life of many proximate individuals."

Fichte,—"On the Nature of the Scholar."

(১) নিম্নোদ্ধৃত কথা হইতে এ সম্বন্ধে হেগেলের মতের আভাস পাওয়া যায় :——

"Objective Spirit is realised in legal right, morality and ethicality, which latter unites in itself the former two, and in which the person recognises the spirit of the community, the ethical substance in the family, in civil society and in the state, as his own essence."

Ueberweg's History of Philosophy.

"History is the development of the rational state: the world spirit—the guiding force in the development: its instrument—the spirit of the nations and great men. A particular people is the expression of but one determinate moment of the universal spirit......"

Falkenburg's History of Modern Philosophy.

(২) ম্যাট্‌সিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :——

"Humanity is the Word (Logos) living in God. The spirit of God fecundates it, and manifests itself through it. * * * Humanity is the successive incarnation of God. In our terrestrial existence, limited both in education and capacity, the *realisation of this Divine Idea can only be most imperfect* and momentary. *Humanity only......is capable of gradually evolving applying and glorifying the Divine Idea.* * * *

সমাজ সম্বন্ধে ধারণার কতক আভাস পাই। এই বিরাট সমাজশরীর যে ভগবানের বিরাটরূপ, সমাজাত্মা যে ভগবান, তাহা আমরা ইহাঁদের কথা হইতে জানিতে পারি। আর কোন পণ্ডিতের কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

৪৮। এইরূপে কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক বিরাট মানব-সমাজের কথা,—Humanity বা মনুষ্যত্বের কথা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মের বিরাটরূপ বুঝিতে না পারিলে, এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা সহজে সম্ভব হয় না। একেশ্বরবাদ লাভ করিয়াও—যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলেন, মানুষকে ঈশ্বরের দাস রূপে কল্পনা করেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে এ পৃথিবী হইতে দূরে—স্বর্গে অবস্থিত বলেন, ঈশ্বরকে পৃথিবীর নিয়ন্তারূপে ধারণা করেন, তাঁহারা মানুষের মধ্যে প্রকৃত একত্বের কোন মূলসূত্র ধরিতে পারেন না, তাঁহারা বিরাট সমাজ-শরীরতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেন না।

ভক্তাবতার খ্রীষ্ট ঊনবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন,—সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সকলে সমান, সকলে ভাই ভাই, অতএব সকলকে ভালবাস। তিনি এই মহাসাম্যবাদ সংস্থাপন করিয়া প্রথমে সে দেশে মানুষের মধ্যে একত্বের আভাস দিয়াছিলেন—এবং এইরূপে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া, ঈশ্বরের সহিত আপনার একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি শব্দরূপে—Sophia বা Word রূপে—জ্ঞানরূপে জগতে বিবর্ত্তিত সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছিলেন। তাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মপুস্তকে এই সমাজশরীরের আভাস পাওয়া যায়। (১) কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান ইউরোপ

"We have yet to teach mankind that as humanity is one sole body, we all being members of that body, are bound to labour for its development. * * * we can only elevate ourselves towards God through the souls of our fellow men."

Mazzini,—"On the duties of man."

(১) সেণ্টপল্ বলিয়াছেন :—

"For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members, one of another."

The Bible—New Testament.—Romans, XII. 4—5.

এই তত্ত্ব সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। রুসো যখন ফরাসী দেশে তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করেন, তখনও এই তত্ত্ব অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ছিল। কেবল গত শতাব্দীতে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা করিতে কতক সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতক্ষণ সনাতন ধর্ম্মের সহায়ে আমরা সেই অদ্বিতীয় একের তত্ত্ব লাভ করিয়া প্রকৃত একত্বের ধারণা করিতে না পারি, যতক্ষণ সেই মহা একত্বজ্ঞানমূলক প্রকৃত সাম্যবাদ শিক্ষা করিতে না পারি, যতক্ষণ মানুষে মানুষে পৃথক্—তুমি আমি ভিন্ন—আমাদের এই ভেদজ্ঞান দূর হইয়া না যায়, ততক্ষণ আমরা সমষ্টি মানবের বা প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা করিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা কেবল 'ভাই ভাই' নহে—শুধু এক পিতা বা এক মাতার সন্তান নহে—কিন্তু আমরা মূলতঃ সকলে এক অভিন্ন—একথা না বুঝিতে পারি, যতক্ষণ তুমি আমি এক—আমরা স্বরূপতঃ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তোমার আমার তুমিত্ব আমিত্ব—এ প্রভেদ বস্তুতঃ ব্যবহারিক—আমাদের এই তুমি আমি ভেদজ্ঞান ব্রহ্মের মায়াময় কল্পনাজাত ও আমাদের অজ্ঞান প্রসূত—একথা না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত সমাজশরীরতত্ত্ব প্রকৃত মনুষ্যত্বকথা বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ আমরা 'সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা' না হইতে পারি, যতক্ষণ আমরা সর্ব্বভূতকে আমাদের মধ্যে ও আমাদিগকে সেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করিতে না পারি, (১) যতক্ষণ আমরা এই প্রকৃত সাম্যে অবস্থান করিতে না পারি, যতক্ষণ আমরা সকল পরকে আপনার করিয়া না লইতে পারি, স্বার্থ অহঙ্কার সব বিসর্জ্জন দিয়া বাসনাবীজ নষ্ট করিয়া নিষ্কাম ভাবে—পরার্থে—ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিতে না শিক্ষা করি, যতক্ষণ আমরা আমাদের 'অহঙ্কার'কে 'ওঙ্কারে' বিলীন করিয়া দিতে না পারি, ততক্ষণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা ব্যষ্টি সমাজশরীর দ্বারা মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা

---

(১) "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

গীতা,—৬। ২৯—৩০।

বিভিন্ন সমাজমধ্যে পার্থক্যজ্ঞান দূর করিয়া সকল সমাজ মধ্যে সেই মহান্ একত্ব দর্শন করিয়া এক বিরাট সমাজশরীরের ধারণা করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের দর্শন আমাদিগকে এই মহান্ একত্বতত্ত্ব শিক্ষা দেন। আমরা সাধনাবলে সেই শাস্ত্রজ্ঞান প্রকৃতরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ক্রমে আমাদের মধ্যে 'তুমি' 'আমি' এই পার্থক্যজ্ঞানের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিব। কিন্তু সে ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেও, নেত্ররোগবিশেষে দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায়, অথবা পীতরোগে সর্ব্বত্র পীত বর্ণ দর্শনের ন্যায়, কিম্বা নিরয়ণ সূর্য্যের বার্ষিক ও আহ্নিক গতি দর্শনের ন্যায়, অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে সংসারী আত্মার কখন সে ব্যবহারিক ভ্রান্তি একেবারে দূর হইতে পারে না। তাহা না হইলেও, বিশেষ সাধনাবলে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হইতে থাকে, ততই আমরা সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। আমাদের ব্যষ্টি সমাজ সেই একত্বজ্ঞান সাধন করিবার ভূমি, সেই একত্বজ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার প্রকৃত ক্ষেত্র। (১)

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিক প্রসিদ্ধ সপেনহর আমাদের শাস্ত্রের এই কথা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,——

"To him who does the work of love, the veil of *Maya* has become transparent—the illusion of the *principium individuationis* has left him. He recognises himself in everything—in the sufferer......"

"Good conscience is the satisfaction which we experience after every disinterested deed, which proceeds the knowledge that our true self exists in everything that lives. By this the heart is enlarged. Hence peace and virtuous disposition......"

"Whoever is able to say this *tat twam asi* (তত্ত্বমসি) to himself with regard to everything he comes in contact, with clear knowledge and firm inner conviction is certain of all virtue and blessedness, and is on the direct road to salvation. Thus love leads to salvation by the entire surrender of the will to live *i. e.*, of all volition...... Besides all love is sympathy."

Schopenheaur's—World as Will and Idea.—Vol. II. Sec. 69.

বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) তাঁহার *Elements of Metaphysics* গ্রন্থে (১৩৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,——

"......the celebrated (তত্ত্বমসি) *tat twam asi* (that art thou) a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality : as

৪১। অতএব এই মহা একত্বজ্ঞান আমরা সহজে লাভ করিতে পারি না। আমরা সহজে আমাদের ব্যক্তিত্বকে—মমত্বকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়া, সকল 'তোমাতে' 'আমাকে' অনুভব করিয়া পূর্ণ একত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমরা সমাজাত্মা ব্রহ্মকে সহজে ধারণা করিতে পারি না। সেই পরম জ্ঞান বিকাশের জন্য, আমাদের প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ, আমাদের সাধনার ক্রমসঞ্চিত শক্তির অপেক্ষা করিতে হয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে ব্যক্তিজীবের হয়ত কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া যায়। সুতরাং সমাজ সংগঠন বা সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যদি আমাদের সেই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিত, তবে বুঝি কখন মানবসমাজ সংগঠিত হইত না। আর সমাজ সংগঠিত হইলেও, তাহার কোন উন্নতি হইত না। যেমন ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষা সংগঠিত ও ক্রমবিকাশিত হইতে পারে, যেমন ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা ব্যতীত লোকে বিচার করিতে পারে, যেমন শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ব্বে শিল্পী তাহার প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, যেমন সে সম্বন্ধে মানুষ প্রথমে তাহার প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হইয়া থাকে, তেমনই সমাজবিজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে সমাজের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি হইতে পারে, প্রকৃতিই মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়া লন।

বলিয়াছি ত, প্রকৃত জ্ঞানের বীজ আমাদের সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে। প্রকৃতি সহায়ে—আমাদের প্রকৃতির ক্রম আপূরণে—সেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়।

---

an interpretation of this great truth we may consider as in a wider sense, our whole work......"

তিনি অন্যত্র (Philosophy of Vedanta প্রবন্ধে) বলিয়াছেন :——

"The highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly as the highest law of morality—'love your neighbour as yourselves.' But why should I do so ?......The answer is not in the Bible... but it is in the Veda, is in the great formula, *tat twam asi* which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves—because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the 'Bhagbat Gita.' he who knows himself in everything and everything in himself, will not injure himself by himself......"

পরের সঙ্গে সহানুভূতিতে, আমাদের স্নেহ দয়া প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, আমরা সেই একত্বজ্ঞানের আভাস পাই। প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাতে এই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের এই জ্ঞানের দিকে লইয়া যান। আমাদের প্রবৃত্তির মলিনতা যত দূর হইতে থাকে, ততই আমাদের অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। আমাদের প্রকাশাত্মক স্বত্বগুণের বিকাশে আমাদের জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এইরূপে সেই জ্ঞানের যত বিকাশ হয়, ততই আমাদের অজ্ঞানমূলক মোহময় ব্যক্তিত্বজ্ঞান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া আমাদের জাতিত্ব জ্ঞানের—একত্বজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়। এইরূপে প্রকৃতি সহায়েই আমাদের সামাজিকতার ক্রমবিকাশ হয়, পরের সঙ্গে সহানুভূতি বলে পরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া আমাদের পরার্থকর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়, ক্রমে পরকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা হয়, এবং সেই ভাবনাবলে শেষে আমরা আপনাকে ও অন্য সকলকে ব্রহ্ম মধ্যে দর্শন করিয়া, সেই জ্ঞান পরিপাকে আমরা প্রকৃত একত্বজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করি। সমাজ যে ব্রহ্মের বিরাটশরীর—তিনিই যে সমাজাত্মা তাহা বুঝিতে পারি। সেই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিই আমাদের সমাজশক্তি। তাঁহা হইতেই সমাজের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আমরা এ তত্ত্ব ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সমাজ ও তাহার আদর্শ।

———*:০০:*———

দ্বিতীয় খণ্ড—সমাজশক্তি।

প্রথম অধ্যায়।

সমাজশক্তি প্রকৃতি,—ব্যক্তিরক্ষায় প্রকৃতির কার্য্য,—জাতিরক্ষায় প্রকৃতির কার্য্য,—মাতৃরূপা প্রকৃতিশক্তি,—জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ।

৫০। আমরা পূর্ব্বে যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে সমগ্র মানবজাতি এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত। ভগবান স্বয়ং সেই বিরাট সমাজশরীরের আত্মা—তিনিই সমাজক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার জন্তই এই সমাজশরীর সংহত। ব্যষ্টিসমাজ—ক্ষুদ্রবৃহৎ সভ্যঅসভ্য নানারূপ সমাজ—সেই সমষ্টি বিরাট সমাজের অংশ—বা আংশিক বিকাশ মাত্র। ব্যষ্টিসমাজ—দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া পরমপুরুষের মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিবর্ত্তিত বিকাশ,—ভগবানের বিরাট-শরীরে—হিরণ্যগর্ভের মানস সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি। ভগবানের বৈষ্ণবী শক্তি বলে, এই সমাজের সৃষ্টি রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে। সেই পরমাপ্রকৃতি 'দেবী ভগবতী'র মহাশক্তিবলে, সেই সর্ব্বভূতা মহাশক্তি হইতে অভিব্যক্ত, ভগবানের জগৎরূপ বিরাটশরীরে, হিরণ্যগর্ভের মানবজাতিরূপ মানসসৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি হয়। 'যে কোথায় যা কিছু বস্তু ছিল আছে বা হইবে, সে সকলের যিনি শক্তি—সেই অখিলাত্মিকা' মহাশক্তি বলেই ভগবানের কল্পনাধিষ্ঠিত জগতের সৎরূপে বিকাশ হয়,—সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। জ্ঞানময় ব্রহ্মের মহাকল্পনা অনুসারে, তাঁহার সেই বিশ্ববীজ পরাশক্তিবশে, এ সৌরজগতে ক্রমবিকাশ নিয়মে,আকাশ বায়ু প্রভৃতি ক্রমে এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া পরে তাহা মানুষের বাসের উপযোগী হইলে, কিরূপে পৃথিবীতে সেই পরমাপ্রকৃতি, ভগবানের মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিকাশ করেন, আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। সেই মহাশক্তিই নিজ শক্তি বলে সমাজ সংগঠন

করেন—সমাজের রক্ষণ ও পোষণ করেন। তিনিই মানবের অন্তরে জাতিরূপে, স্নেহরূপে, দয়ারূপে, সহানুভূতিরূপে (১) অধিষ্ঠিত থাকিয়া, মানবদের মধ্যে মহা আকর্ষণবীজ উপ্ত করেন—মানবদের নানারূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করেন, এবং এইরূপে সমাজশক্তির বিকাশ করিয়া মানুষদের সমাজবদ্ধ করেন। তিনিই সর্ব্বভূতে চেতনারূপে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিয়া, মানবে জ্ঞান ক্রমবিকাশিত করিয়া দিয়া, মানবকে সেই মহা একত্ব জ্ঞানের দিকে লইয়া যান।

সেই মহাশক্তি হইতেই জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই জীবজগতের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়। সেই মহাশক্তি হইতেই প্রত্যেক জীবের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু হয়। তাঁহা হইতেই জীবজাতির রক্ষা ও পোষণ হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পারমার্থিক ভাবে জীবের ব্যক্তিভাব অসত্য, জাতিভাবই সত্য। এই জন্য প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যস্ত, জাতি রক্ষার জন্য ততোধিক ব্যস্ত। মানবজাতি সম্বন্ধেও এই কথা। মানুষ জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করে, পুরুষকারের স্পর্দ্ধা করে, স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলে, কিন্তু মানবও যন্ত্রের ন্যায় সেই প্রকৃতিচালিত। ভগবানের এই মহাপ্রকৃতির কথা—এই মহা বৈষ্ণবী শক্তির তত্ত্ব আমরা সম্যক্ বুঝি না। সেই 'সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশশক্তিভূতা ত্রিগুণময়ী ত্রিকালময়ী' প্রকৃতির কথা, সেই 'বিশ্বেশ্বরী বিশ্বাত্মিকা বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বব্যাপিনী সনাতনী মহাশক্তির মহাক্রিয়ার কথা,—আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া—অদ্ভুত কৌশল আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যাহা প্রকৃতির কার্য্য—মানুষ তাহা প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ কার্য্য মনে করিয়া আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করে। মানুষের নিজের প্রকৃতিরূপে—স্বভাবরূপে সেই মহাপ্রকৃতির যে অভিব্যক্তি, মানুষ তাহা নিজের প্রকৃতি—তাহা মানুষের নিজের জ্ঞানপরিচালিত, নিজের আয়ত্তীভূত প্রকৃতি বলিয়া মনে করে। মানুষ সেই প্রকৃতি চালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া নিজে স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম করিয়াছে মনে করে। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে নিজ প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য জন্মিতে পারে বটে,—কিন্তু সে অনেক সাধনার কথা, পুরুষ-কারের বিশেষ বিকাশের কথা। মানুষ সাধারণতঃ তাহার প্রকৃতিরূপেই অবস্থিত

(১) "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি......রূপেণ সংস্থিতা,"—সেই মহাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সেই মহাপ্রকৃতিবলে চালিত হয়। প্রকৃতি তাঁহার কার্য্য করিবার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ মানুষকে কিঞ্চিৎ সুখ—কিঞ্চিৎ আনন্দ দান করেন। আর মানুষ সেই সুখ—সেই আনন্দ টুকু পাইবার জন্য নিজ প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নিজ কর্ত্তব্য—বিবেকের নির্দ্দিষ্ট পথ হারাইয়া ফেলে, দাসের ন্যায় প্রকৃতির অনুসরণ করে। সকল প্রকার সুখ সম্বন্ধেই প্রায় এই নিয়ম।

৫১। বলিয়াছি ত জাতিরক্ষা ও জীবরক্ষা প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। আমরা যখন শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় থাকি, তখন মাতৃগর্ভ হইতে প্রকৃতি স্বয়ং—মাতার ন্যায় যত্ন করিয়া আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুসারে, অথবা স্বয়ং সেই সংস্কারশক্তিরূপে আমাদের উপযোগী শরীর গড়িয়া দেন। সেই শরীর সংগঠনে—সেই আশ্চর্য্য কৌশলময় শরীর সংগঠন ব্যাপারে, আমাদের কোন হাত নাই। এই জ্ঞাতা আমি, কর্ত্তা আমি বা ভোক্তা আমি'র কোন হাত নাই। সে কৌশল আজি পর্য্যন্ত কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সম্যক্ বুঝিতেও পারেন নাই। সে অদ্ভুত শরীর সংগঠন, আমাদের সেই অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা সংসাধিত হয়। যখন আমাদের জ্ঞান হয়, আমাদের 'আমিত্বের, বিকাশ হয়, তখনও সেই প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের শরীর রক্ষা ও পোষণ ভার বহন করেন। যখন শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে বিকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। তিনিই জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের পরিপাক করিয়া লন। যখন শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়—তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লন। তিনিই প্রাণ রূপে—জীবনীশক্তি রূপে আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোকবিষাদমগ্ন আর্ত্ত শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাহাদের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহাদিগকে শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহার অন্বেষণ জন্য কর্ম্ম বা শরীর রক্ষার্থ কর্ম্ম আমাদের নিজের কর্ম্ম—আমাদের নিজের

স্বার্থ মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম্ম, তাহার জন্য আমাদের সহজজ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহার সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে—মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। প্রকৃতি এমনই মোহযুক্ত করিয়া মানুষকে স্বকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। এমনই করিয়া প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে তাহার শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্তিত করেন। স্বার্থকর্ম্মের ন্যায় পরার্থ কর্ম্মেও আমরা প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া নিযুক্ত হই। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিরূপে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, আমাদিগকে পরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বলিয়াছি ত, প্রকৃতি তাঁহার এই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ আমাদিগকে একরূপ সুখ ও আনন্দ দান করেন। প্রকৃতির নানা কাজ,—আমাদিগকে দিয়া প্রকৃতি নানা কাজ করাইয়া লন। তাহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ব্যক্তিত্ব ভাব রক্ষণ ও পোষণ জন্য কর্ম্ম, আর কতকগুলি জাতি রক্ষা ও পোষণ জন্য কর্ম্ম। বলিয়াছি ত, জাতিরক্ষার ন্যায় ব্যক্তিরক্ষা প্রকৃতির প্রয়োজন। ব্যক্তিরক্ষা ব্যতীত জাতিরক্ষা হয় না। ব্যক্তিরক্ষা ও জাতিরক্ষার জন্য আমাদের নানারূপ কাজ করিতে হয়। সকল কাজেরই পরিমাণ আছে। এজন্য এক কাজে অব[illegible] করিয়া যদি অ[illegible] এক কাজে আমরা অযথা যত্ন করি, তবে সে স্থলে প্রকৃ[illegible] [illegible]খের পরিবর্ত্তে দুঃখ বা অবসাদ আনিয়া, আমাদিগকে সেই কাজ হইতে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া, প্রকৃতির অন্য কাজে নিয়োজিত করেন। ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে। সন্তানউৎপাদন বা জাতিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ কামবৃত্তি চরিতার্থের প্রয়োজন, সে পরিমাণে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলে আমাদের সুখ হয়, কিন্তু তাহার অধিক সে বৃত্তি পরিচালন করিলে পরিণামে আমাদের দুঃখ হয়। শরীর রক্ষা ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যে পরিমাণ ও যেরূপ আহার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ আহারে আমাদের সুখ হয়। তদধিক আহারে আমাদের দুঃখ ও পীড়া হয়। এইরূপে প্রকৃতি অলক্ষ্যে সুখরূপ পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের সহায়ে আমাদিগকে তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত করেন। আমরা অবশ হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় কার্য্য করি। যতক্ষণ আমাদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ না আমরা মুক্ত হই, ততক্ষণ

আমরা এইরূপে প্রকৃতির অধিকারে—বাসনারূপ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া 'প্রবৃত্তি মার্গে' কার্য্য করিতে বাধ্য হই,—আর প্রকৃতির কার্য্যকে আমাদের নিজের কার্য্য, আমাদের স্বার্থ মনে করি।

৫২। সে যাহা হউক, যেন আমরা দেহাত্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া দেহ রক্ষাকে আত্মরক্ষা ভাবিয়া—এই শরীর রক্ষাকে যেন নিজের স্বার্থ, নিজের কার্য্য মনে করিলাম। কিন্তু সন্তান পালন ও রক্ষা কার্য্যে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কেন না অনেক স্থলে সন্তানকে আমরা 'আত্মজ' মনে করি। আমাদের সন্তানে 'আত্মজ্ঞান' ও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত, আমাদের মধ্যে অনেক স্থলে পুত্র, বৃদ্ধ অক্ষম পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এজন্য সন্তান পালনে আমাদের স্বার্থ আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল লোক সন্তানকে আত্মজ মনে না করে, সন্তানকে দাম্পত্য সুখভোগের অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় ফল মনে করে, যেথানে সন্তান বড় হইয়া পিতামাতা হইতে পৃথক হইয়া যায়, সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন না করে, সেখানে সন্তান পালন কার্য্যে পিতামাতা কোন স্বার্থ থাকা মনে করে না। মানুষ যখন প্রকৃতির বশে কাজ করে, বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয়, তখন সে সন্তান পালনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। সেখানে মানুষ স্বার্থ নিঃস্বার্থের কথা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মানুষ যখন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করে, তখনও সে কর্ত্তব্য ভাবিয়া, ধর্ম্ম ভাবিয়া সন্তান পালন করে। কিন্তু মানুষ যখন সহজজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে শিখে, তখন বুদ্ধি তাহাকে কেবল স্বার্থচালিত হইতে যুক্তি দেয়। বড় অধিক, সে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যুক্তিবলে আমাদের কর্ত্তব্যের মূলসূত্র ধরিতে গিয়া (utilitarianism বা) হিতবাদ বা আত্মসুবিধাবাদে উপনীত হইতে পারি। (১) আমাদের বুদ্ধি আমাদের পরার্থবৃত্তি বিকাশ করে না,

---

(১) The fundamental error of utilitarianism is to find a sanction for right conduct in our inclinations....... It (philosophy) has urged from generation to generation the utilitarian doctrine that the all-sufficient sanction for right conduct is *simply enlightened self-interest.*

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

আমাদিগকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবার পরামর্শ দিতে পারে না। (২) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অনেকে পুত্র লালনপালন বড় কষ্টকর মনে করে, তাহাদের নিজের সুখ ও সুবিধার অন্তরায় মনে করে। অনেক সভ্য স্ত্রীপুরুষ যাহাতে সন্তান না হয় তাহার চেষ্টা করে। অনেক সভ্য স্ত্রীপুরুষ সন্তান লালনপালনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিশেষ লালায়িত হয়। (৩) তাই বলিতেছিলাম, সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদিগকে আত্মসুখ চরিতার্থ জন্যই প্রবৃত্ত করায়। পরার্থ আত্মত্যাগ, এই জ্ঞানজ নহে। সন্তানপালনবৃত্তি এই জ্ঞানজ নহে; তাহাতে প্রকৃতি প্রথমে অবশ করিয়া আমাদিগকে নিয়োজিত করেন।

৫৩। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর জীবে সন্তান পালন কার্য্যে কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। বংশ রক্ষা হউক, বা না হউক, তাহাতে তাহাদের কোন আসিয়া যায় না। তথাপি যে ইতর জীবে ও মানুষে বংশ রক্ষার জন্য, সন্তান—রক্ষার জন্য এত যত্ন করে, সে কেবল প্রকৃতির প্রেরণায়। জাতি রক্ষা বা জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রকৃতির কার্য্য—প্রকৃতির প্রয়োজন। সন্তান উৎপাদন ও রক্ষার দ্বারাই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। তাই সন্তান রক্ষার জন্য প্রকৃতি মাতার হৃদয়ে সন্তান পালন স্পৃহা এত বলবতী করিয়া দিয়াছেন। যে মমতাময়ী

---

(১) The ideal of average individual is not the effort and sacrifice, but the desire to live in the greatest possible ease and comfort with the least exertion......the maximum of ease, comfort and security with the minimum of effort and sacrifice.

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

(২) "A difference in his (man's) case is, that by the possession of reason he has become equipped with the power to obtain satisfaction of such instinct, without entailing the consequence. He has......particularly in this declining civilization engaged to circumvent even some of the most imparative of them, like the paternal instinct. He has......by the restriction of propagation, and by the *perversion* of the institution of marriage and the family, succeeded in obtaining its satisfaction for the individual while suspending its operations in furthering the interest of society and race."

B. Kidd,—on 'Social Evolution.'

প্রকৃতি সন্তান রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনিই মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য উৎকট মমতার—অদ্ভুত স্নেহের বিকাশ করিয়াছেন। তিনিই পিতাকে সন্তান স্নেহের বশবর্ত্তী করিয়া তাহাকে সন্তান পালন কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন। পিতামাতা সন্তান পালন করিয়া, আপনার স্নেহ বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করে। এখানেও প্রকৃতিজননী পরার্থবৃত্তির সহিত আমাদের স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। এখানেও প্রকৃতি আমাদের সুখ বা আনন্দরূপ পারিতোষিক দিয়া জাতিরক্ষা রূপ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপে আমরা নানাজাতীয় জীব মধ্যে প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলে স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থ বৃত্তির আশ্চার্য্য সম্মিলন দেখিতে পাই। এইরূপে জীব স্বার্থবশে সুখ আশায় বা অজ্ঞানমোহে, পরার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। অতি নিম্নজাতীয় জীবে অবশ্য এই সন্তান পালন রূপ মুল পরার্থ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ থাকে না। অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়া পরিত্যাগ করে, ওষধির ন্যায় অনেক নিম্ন জাতীয় জীব, সন্তান প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষা অপেক্ষা জাতি রক্ষার জন্য এমনি ব্যস্ত যে, মাতার দিকে তখন একবারও চাহিয়া দেখেন না, মাতার রক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করেন না। প্রকৃতি এইরূপে বাধ্য করিয়া সকল জাতীয় জীবের মাতাকেই সন্তানের জন্য অল্লাধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। স্তন্যপায়ী জীব (mammals) মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। পক্ষী প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সন্তান পালন বৃত্তিও যথেষ্ট প্রবল। নিম্ন জাতীয় জীব মধ্যেও সন্তান পালন ও সন্তান রক্ষার ব্যবস্থা প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছেন। মধুমক্ষিকাও সন্তান রক্ষার জন্য আশ্চর্য্য মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অনেক পক্ষী শাবকের জন্য কুলায় নির্ম্মাণ করে। তাহাদের প্রকৃতিপরিচালিত সহজজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কুলায় নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এইখানে আমরা মমতাময়ী প্রকৃতির কার্য্য, তাঁহার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া মোহিত হই। সে যাহা হউক, অনেক পক্ষীদের মধ্যে এই প্রকৃতিজাত সন্তান পালন চেষ্টা এত প্রবল যে, তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াও অনেক স্থলে ডিম্বে তাপ দিতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হয় না। যতদিন শাবক উড়িতে না শিখে ততদিন তাহাকে ত্যাগ করে না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, "পক্ষীদের জ্ঞান থাকিলেও তাহারা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহ বশত সাদরে

তণ্ডুল কণাদি শাবক চঞ্চুতে নিঃক্ষেপ করে।" (১) অতএব ইতর জীবগণও 'জ্ঞান বা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিজ-বুদ্ধি সত্ত্বেও জাতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। এবং জাতি রক্ষার জন্য সন্তান পালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইতর জীবে ও মানুষে পরার্থ বৃত্তির বীজ স্বয়ং মমতাময়ী প্রকৃতি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সন্তান পালনে সেই পরার্থ বৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানেও প্রকৃতি অদ্ভুত কৌশলে পরার্থ বৃত্তির সহিত স্বার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য—সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। যেখানে মানুষ নিজের জ্ঞানে কাজ করে, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্য—নিজের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ পরিহার জন্য কাজ করিতে চাহে,—তাহা বলিয়াছি। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। সুতরাং জীব যদি পরার্থবৃত্তি পরিচালনকে সাধারণতঃ নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ বৃদ্ধির উপায় বলিয়া না বুঝিত, তাহা হইলে জীব সহজে পরার্থবৃত্তি বশে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না।

ইতর জীবেও সন্তান পালন ও রক্ষা কল্পে, এই পরার্থবৃত্তি বড় প্রবল। অনেক জীব সন্তান রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। আমরা সচরাচর গার্হস্থ্য গো প্রভৃতি পশুগণের সন্তান হইলে, তাহাকে রক্ষার জন্য মাতাকে বড় চঞ্চল, বড় ব্যস্ত, বড় উগ্র হইতে দেখিয়া থাকি। অথচ সন্তান বড় হইলে, তাহার পালন বা রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে, ইতর জীবের মধ্যে মায়ের সহিত সন্তানের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। মা আর সন্তানকে চিনিতেও পারে না। সন্তান সম্বন্ধে মানুষে ও পশুতে অনেক প্রভেদ আছে। ইতর জাতীয় জীবশিশুগণ শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও পোষণে সমর্থ হয়, শীঘ্রই স্বাবলম্বন করে। কিন্তু মানবশিশুকে অনেক দিন লালন পালন করিতে হয়। সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা এ বিষয়ে মানবশিশু বড় অক্ষম বড় পরমুখাপেক্ষী। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার লালনপালন প্রয়োজন হয়। এজন্য মানবে সন্তানস্নেহ স্থায়ী। এই স্নেহবন্ধন সমাজ বন্ধনের মূল।

৫৪। সন্তান লালনপালন সাধারণতঃ মাতার কার্য্য। ইতর জীবে প্রায়শঃই মাতা সন্তান পালন করিয়া থাকে। কোন কোন ইতর জীবে পিতাও সন্তান

---

(১) জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
"কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপিক্ষুধা ॥"
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৬।

পালন কার্য্যে মাতাকে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে মাতাপিতা উভয়েই মিলিয়া সন্তান লালন পালন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। মানুষের মধ্যে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ হীনবল। এজন্য তাহারা বিনা সাহায্যে আত্মরক্ষা বা সন্তান রক্ষা করিতে পারে না। তাই সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য পিতার প্রয়োজন হয়। তাই পিতামাতাকে মিলিয়া সন্তান পালন করিতে হয়। মানুষের সহজজ্ঞান ইতর জীবের ন্যায় প্রবল নহে। মানুষ সাধারণ জ্ঞানবলে প্রবৃত্তিকে আয়ত্ব করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। বলিয়াছি ত, কেবল এই সাধারণ জ্ঞান বলে মানুষ স্বার্থচালিত হয়। এই জন্য সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য মানুষও প্রথম অবস্থায় নিজ বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া স্বার্থচালিত হইত। অসভ্য মানুষ সন্তানকে গরু ছাগলের ন্যায় নিজের সম্পত্তি মনে করিত। নিজের স্বার্থের জন্য—দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, পিতা সন্তান পালন করিত,—বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্য পাইবার জন্য সন্তান পালন করিত,—সন্তান পালনে সামান্যরূপে মাতার সহায় হইত। এইরূপে মহামমতাময়ী প্রকৃতি এখানেও স্বার্থের সহিত পরার্থবৃত্তির অদ্ভুত সম্মিলন করিয়া দিয়া, পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে স্বার্থের আবরণেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ হয়। এইরূপে স্বার্থমোহে মোহিত হইয়া প্রথমে আমরা পরার্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে যে, 'মানুষও প্রত্যুপকার লোভে (বা বৃদ্ধ বয়সে নিজের সেবার সুবিধার জন্য) পুত্রের প্রতি স্নেহযুক্ত হয়।' (১) কিন্তু সন্তান পালন জন্য মানুষ আপাততঃ স্বার্থচালিত মনে হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থবৃত্তি বিকাশের দ্বারা—মমতার বশে প্রকৃতিই তাহাকে পরিচালিত করেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, 'এ স্বার্থজ্ঞান সত্বেও সংসার স্থিতিকারিণী মহামায়া প্রভাবে, মানুষ মমতাগর্ত্তে ও মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে।' (২)

---

(১) মানুষাঃ মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্‌প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৭।

(২) তথাপি মমতাগর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৪৮।

৫৫। এইরূপে সেই মহামমতাময়ী প্রকৃতি আমাদের প্রথমে মোহযুক্ত করিয়া, আমাদের অন্তরে সন্তানের প্রতি 'মমতার' বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের অন্তরে পরের প্রতি মমতার ক্রমাভিব্যক্তি করিয়া দিয়া, সেই মমতাবশে আমাদিগকে পরের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন। তাহার পর যখন আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, যখন আমরা বুদ্ধিবলে সেই মমতার মোহ বুঝিতে পারি, জ্ঞানের প্রথম বিকাশে—'পর' পরই আপনার নহে—এ কথা বুঝিতে পারি; যখন সেই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানবলে পরের মধ্যে আমাকে দেখিতে না পাই, তখনও সেই মহাপ্রকৃতি আমাদের সেই বুদ্ধিকে—সেই সাধারণ জ্ঞানকে 'মমতার' মোহে অভিভূত করিয়া আমাদিগকে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। শুধু পরার্থ কর্ম্ম বলিয়া নহে,—প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞানজড়িত করিয়া আমাদিগকে স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মে,—ব্যক্তিজীব রক্ষার্থ কর্ম্মে ও জাতিরক্ষার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন।

এইরূপে প্রকৃতিবশে আমাদের মধ্যে স্বার্থের সহিত পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। সেই মহাপ্রকৃতির সহায়ে স্বার্থবৃত্তির সহিত এই পরার্থবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। প্রথমে স্বার্থবৃত্তি বড় প্রবল থাকে। তখন সেই স্বার্থবৃত্তির মধ্যে পরার্থবৃত্তি কোথায় ডুবিয়া যায়। কেবল সন্তান পালন ও রক্ষা কর্ম্মে মানবের জাতি বা বংশরক্ষা প্রবৃত্তিতে সেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে প্রকৃতির সহায়ে আমাদের প্রকৃতির যত ক্রম-আপূরণ হইতে থাকে, যতই জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, আমরা আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা যত পরকে আপনার করিয়া লইতে শিখি, যতই মমতার গণ্ডী বাড়াইয়া লইতে পারি, ততই আমরা পরের জন্য কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম মনে করিতে শিখি। যতই আমাদের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ব্যক্তি রক্ষার্থ যে টুকু কর্ম্মের প্রয়োজন—তাহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আমাদের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমরা পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। প্রথমে স্বার্থবৃত্তির সহিত পরার্থবৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়া উভয়ের সহায়ে উভয়েরই বিকাশ হয়। অবশেষে জগতে সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিতে শিখিয়া আমাদের আমিত্বের পূর্ণপ্রসার হইলে, ক্ষুদ্র স্বার্থবৃত্তি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া পরার্থবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হয়। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, মানুষ পূর্ণ উন্নত হইলে, তাহার স্বার্থবৃত্তি ও পরার্থবৃত্তি একীভূত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ পরার্থবৃত্তি পরিচালনই তাহার স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, তাহার

সুখ ও আনন্দ লাভের প্রধান উপকরণ হইবে। তখন মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করিয়াই আপনার আনন্দবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। (১) এ কথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৫৬। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মজ্ঞানে মনুষ্যত্বের ধারণা তাঁহার কালশক্তি বশে ক্রমবিবর্ত্তিত হয়, ও তাঁহার মহামহিমাময়ী মহাশক্তি বলে পৃথিবীতে ক্রমবিকাশিত হয়। সেই মহাপ্রকৃতিই মানুষের মধ্যে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশের দ্বারা এবং ক্রমে সে বৃত্তিকে জ্ঞানপরিচালিত করিয়া মানবসমাজের ক্রমবিকাশ করেন, বিশেষ দেশকালে ব্রহ্মের মানবসমাজরূপ বিরাটদেহের ক্রমবিবর্ত্তন করেন। বলিয়াছি ত, তিনি সর্ব্বভূতে জাতিরূপে মাতৃরূপে দয়ারূপে অবস্থিত হইয়া আছেন। মানুষের মধ্যে তিনি সেই সকল বৃত্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা সমাজশরীরের ক্রমবিকাশ করেন—মনুষ্যত্বের ক্রমোন্নতি করেন। তিনিই জ্ঞানীকে বলে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিত্ত মোহযুক্ত করেন। (২) তিনিই মানবের অন্তরে, স্বার্থের মোহময় আবরণে আবরিত করিয়া, অলক্ষ্যে সন্তান পালনাদি কর্ম্মে পরার্থবৃত্তির বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করেন। তিনিই মানবের অন্তরে দয়া প্রীতি ভক্তিরূপে সহানুভূতিরূপে পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ করেন। তিনিই মানবকে সমাজশরীরের অন্তর্গত করিয়া তাহার পরার্থবৃত্তির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি করেন, তাহার মনুষ্যত্বের স্ফুর্ত্তি করেন, তাহার স্বার্থ ও পরার্থ একীভূত করিয়া দিয়া, পরার্থ কর্ম্ম দ্বারা তাহার সুখ ও সন্তোষ বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তিনিই 'প্রসন্না হইয়া' পরকে আপনার করিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়া, তাহার সেই মহা একত্বজ্ঞানের বিকাশ করেন—মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যান।

অতএব পরার্থবৃত্তির প্রধান ও প্রথম বিকাশ—বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি মাতাপিতার অন্তরে সন্তান পালন ও রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি। এই পরার্থবৃত্তির মাতৃ-

---

(১) পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

"An ideal social being may be conceived as so constituted that his spontaneous activities are congruous with the conditions imposed by the social environment formed by such other beings."

H. Spencer's—Data of Ethics. P. 275.

(২) "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥" মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—১। ৫০।

রূপা প্রথম বিকাশ হইতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। মাতাপিতার হৃদয়ে সন্তান পালন ও রক্ষা প্রবৃত্তিই সুধু মাতৃশক্তি নহে। সাধারণভাবে ধরিলে, এই পরার্থবৃত্তিকেই মাতৃশক্তি বলা যায়। এই পরার্থবৃত্তিবশেই জীব মাতার ন্যায় অন্য জীবে স্নেহযুক্ত হইয়া সহানুভূতি বশে তাহার জন্য কর্ম্ম করে। আর যেখানে জীবের চৈতন্য বিকাশিত হয় না, সেখানেও জীব প্রকৃতির মহামাতৃশক্তি বশে পরার্থ কর্ম্ম করে। প্রকৃতি স্বয়ং মাতৃশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। মানুষে মাতৃশক্তিরূপা এই পরার্থবৃত্তির বিকাশ হইতেই সমাজের বিকাশ হয়। তিনি মানুষকে পরার্থবৃত্তিবশে অলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সমাজবদ্ধ করেন, সমাজশরীরের বিকাশ করেন। কোন বিলাতী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এ জগতে মাতৃত্ব বিকাশ করাই যেন প্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কতকটা তাঁহার কথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (১)

---

(১) পণ্ডিত Drummond তাঁহার Ascent of Man নামক গ্রন্থে এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"Is it too much to say that the one motive of organic nature is to make Mothers? It is at least certain that this was the chief thing she did......The machinery of Nature is designed in the last result to turn out Mothers......It is a fact which no human mother can regard without awe, which no man can realise without a new reverence for women and a new belief in the higher meaning of nature, that the goal of the whole plant and animal kingdom, seems to have been the creation of a family which the very naturalist has had to call *Mammalia—Mothers*."

:00:

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্ব্বভূতে মাতৃত্বের বিকাশ,—সর্ব্বজীবের পরার্থ কর্ম্ম,—সর্ব্বত্র ত্যাগ-গ্রহণ কর্ম্ম,—প্রকৃতির মহাত্যাগ কর্ম্ম,—পরার্থ কর্ম্মে ক্ষতি ও দুঃখবোধ।

৫৭। এই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির আশ্চর্য্য তত্ত্ব আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। সর্ব্বভূতে এই মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপে অবস্থিতিতত্ত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। সর্ব্বজীবে জাতিরক্ষা বৃত্তিতে, সন্তানরক্ষা ও পালন প্রবৃত্তিতে আমরা এই মাতৃশক্তির মহাবিকাশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেবল এই সন্তান পালন বৃত্তিতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। কেবল জাতিরক্ষা বৃত্তিতেও তাহা পর্য্যবসিত হয় না। সহানুভূতিবশে স্বজাতিরক্ষাবৃত্তিতে তাহা চরিতার্থ হয় না। সর্ব্বজীবরক্ষা ও পালনকর্ম্মে সেই মহামাতৃশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই মাতৃশক্তিরূপা পরার্থবৃত্তি জ্ঞানপরিচালিত হউক, অথবা অজ্ঞানপরিচালিত হউক, সর্ব্বজীবে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। সর্ব্বজীব এই প্রকৃতির মাতৃশক্তির মোহে পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, তাহাতেও এই মহামাতৃশক্তির বিকাশ দেখা যায়। সুধু জীব বলিয়া নহে—জড়ও পরার্থ কর্ম্ম করে। জগতে সর্ব্বত্রই সকলে প্রকৃতিবশে স্বার্থকর্ম্ম ও পরার্থকর্ম্ম করিতে বাধ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জড়ও সেই প্রকৃতিবশে আত্মত্যাগ করিয়া—জীবশরীর সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য আপনাকে অভিভূত করিয়া, নিজের নিজত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জড় জীব—সকলের মধ্যেই প্রকৃতি মাতৃরূপে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। জড়ের কথা এস্থলে কাজ নাই। সর্ব্বজীবই যে পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য, আমরা এ কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৫৮। এক জাতি অন্য জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্ম করে। প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষা, স্বজাতিরক্ষা ও পরজাতিরক্ষার জন্য কর্ম্ম করে। প্রত্যেক জীব আত্মরক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক জীব সেই মহাশক্তি হইতে যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, সেই শক্তিবলে সে আত্মরক্ষার্থ কর্ম্ম করে, এবং সেই কর্ম্ম করিয়া তাহার যে পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা সে পররক্ষার্থ কর্ম্ম করে। অথবা জীব প্রথমে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অন্নরূপে প্রকৃতি হইতে শক্তি গ্রহণ করে। তাহার পর যখন তাহার বিকাশ কর্ম্ম একরূপ শেষ হইয়া আসে, তখন সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পরার্থ দান করে। তখন জীব পরার্থ কর্ম্ম করে। ওই যে ওষধি বনস্পতি দেখিতেছ, ও প্রথমে সৌরতেজ সহায়ে ক্ষিতি অপ্ বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে আপনার বিকাশোপযোগী উপকরণ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার পর ঐ দেখ তাহারা ফলভরে অবনত হইয়াছে। সে ফল কিসের জন্য? উহা কি কেবল তাহার বংশরক্ষার জন্য—জাতিরক্ষার জন্য? তাহা নহে। তাহার জাতিরক্ষার জন্য যে পরিমাণ ফলের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা লক্ষ কি কোটী গুণ ফল সে প্রসব করিতেছে। কেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে! এ কি প্রকৃতির অপব্যয়! না অপরিণামদর্শিতা! প্রকৃতি কি, সেই বৃক্ষের বংশরক্ষার উপযোগী যে কয়টী ফলের প্রয়োজন তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বা অক্ষম বলিয়া তাহাকে এত অধিক ফল প্রসব করিবার শক্তি দিয়াছেন? তাহা কখন সম্ভব নহে। সে বৃক্ষের একটী ফলেরও ধ্বংস নাই—তাহা অপব্যয় নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্য যতগুলি ফলের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অবশিষ্ট সকল ফলই সে অন্য জাতীয় জীবের আহার জন্য অকাতরে দান করে। সকল ফলে সে বৃক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্য সামান্য কয়েকটী ফলের আবশ্যক! আর অন্য জীব রক্ষার জন্য, অন্যজাতীয় জীবের আহার জন্য তাহার অধিকাংশ ফলের প্রয়োজন। (১) ওই যে ধানের গাছ অসংখ্য ধান্য

---

(১) উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণীর আহার জন্য অন্ন আর কেহ সংগ্রহ করিতে পারে না। উদ্ভিদই অন্য জীবের জন্য অন্ন সংগ্রহ করে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মাংসাশী জীব যে মাংস অন্নরূপে গ্রহণ করে, সে মাংসও—উদ্ভিদখাদ্যে পরিপুষ্ট। অতএব মূলত উদ্ভিদই জঙ্গম জীবের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহা আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উৎপাদন করিয়া মরিয়া যাইতেছে, উহার মধ্যে কয়টী ফল তাহার নিজের প্রয়োজন ? কয়টী তাহার জাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন ? তাহার অধিকাংশই আমাদের খাদ্য—অন্যজীবের খাদ্য। আমাদের আহার যোগাইতেই ত সে এত ধান্য উৎপাদন করে ? শস্যজীবি জীবের খাদ্য উৎপাদন জন্য যে কত উদ্ভিদ্ কত ফল উৎপাদন করে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে ?

উদ্ভিদের কথা ছাড়িয়া দাও। সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা। ঐ যে মৎস্য প্রভৃতি জীব অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে, তাহার মধ্যে কয়টী দ্বারা তাহার বংশ রক্ষা হয় ? তাহার অধিকাংশই ত অন্য জীবের আহার! এক জাতীয় জীব—অন্য জাতীয় জীবের আহার। জীব জীবের ভোজ্য। (১) নিম্ন জাতীয় জীব উচ্চতর জীবের অন্নের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে। সামান্য amœba, protoplasm প্রভৃতি জীবাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে সমুদায়ই জীব। সমুদায় জীবশ্রেণী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। স্থাবর জঙ্গম—সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্র জীবজগৎ—অন্ধ হইয়া সেই মহাপ্রকৃতির মহাশক্তিবলে—একদিকে নিজের রক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, অন্যদিকে পরকে রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। (২) এক দিকে আত্মরক্ষা, আর একদিকে আত্মত্যাগ। একদিকে স্বার্থকর্ম্ম,

---

(১) "প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥
চরানামন্নমচরা দংষ্ট্রীনামপ্যদংষ্ট্রীনঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥"
মনুসংহিতা,—৫। ২৮,২৯।

(২) মৃত্যুর পরেও বুঝি আমাদের অব্যাহতি নাই। মৃত্যুর পর শুধু আমাদের স্থূলশরীর জড় ও জীবের ভক্ষ্য হয় না,—আমাদের সূক্ষ্ম শরীরও উচ্চতর জীবের ভক্ষ্য হয়। কোন শ্রুতিতে পাইয়াছি যে, মৃত্যুর পর যে মানুষ পিতৃলোকে বা দেবলোকে গমন করিতে পারে, সে সেই লোকের পিতৃদের বা দেবতাদের আহার হয়।

এই অন্নতত্ত্ব ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে স্থানে স্থানে যেরূপ বিশদ ও সুন্দর রূপে বুঝান আছে, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। সে অন্নতত্ত্ব এখানে আলোচ্য নহে। অন্ন—ব্রহ্ম। অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি হয়, অন্ন হইতে প্রাণ রক্ষা হয়। আমরা যেমন একদিকে অত্তা তেমনই আর একদিকে অন্ন। জীব মাত্রেই এক অবস্থায় অত্তা আর এক অবস্থায় অন্ন। আমরা শুধু অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হই না—আমরা অন্ন হইতেই জন্ম গ্রহণ করি। আমাদের

আর একদিকে পরার্থকর্ম্ম। জীব স্বার্থকর্ম্ম করে—পরার্থকর্ম্ম করিবে বলিয়া, আত্ম-রক্ষা করে—পরকে রক্ষা করিবে বলিয়া। সকল জীবই এই মহাপ্রকৃতির মাতৃশক্তি বশে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,—অজ্ঞানবশে অন্ধ শক্তিবলে পরার্থ কর্ম্মে চালিত হয়। সকল জীবই সেই মহাপ্রকৃতি বলে—প্রয়োজন হইলে আত্ম-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য। প্রত্যেক 'এক' তৎসংসৃষ্ট প্রত্যেক 'অন্যের' জন্য নিয়ত কর্ম্ম করিতে—আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য। আত্মবিসর্জ্জনে পরার্থকর্ম্মের পূর্ণত্ব। প্রত্যেক জীব প্রয়োজন হইলে পরার্থ আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য।

৫৯। জগতে এক মহাচক্র নিয়ত চলিতেছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম জীব পর্য্যন্ত সকলে কি এক মহা বন্ধনে আবদ্ধ। কি এক মহা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'একের' অভাবে 'অন্যের' চলে না। এই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে একের তিরোভাবে তৎসংসৃষ্ট অন্যের ক্ষতি হয়। আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকল সময়ে আমরা সে ক্ষতির কথা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারি, তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সমস্ত জীবজগৎ এক মহাসূত্রে আবদ্ধ। সমস্ত জাতীয় জীব এই রূপে এক মহাবিরাট সমাজের অঙ্গীভূত। কেবল সমগ্র মানুষ ধরিয়া এক বিরাট মানব সমাজের ধারণা বুঝি যথেষ্ট নহে। সমস্ত জাতীয় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। (১) বুঝি সমস্ত জড় জীব মিলিয়া এক মহা সমাজ। ঐ দেখ জড়ের

প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীর যে অন্ন মধ্যে থাকে, সেই অন্ন আমাদের পিতা গ্রহণ করিলে তাহা রেতঃ রূপে পরিণত হয়, তাহা হইতেই আমাদের জন্ম হয়। সর্ব্বজীব সম্বন্ধে এই নিয়ম। যাহা হউক, এই সকল গুরুতর বিষয় এ স্থলে উল্লেখের বা আলোচনার প্রয়োজন নাই।

(১) কোন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন,—

"So there is in a certain sense, not only a universal brotherhood of man, although few recognise even this fact, but there is likewise a greater brotherhood, which includes not only man, civilzed man, savage man, Christian man, heathen man,—all men,—but likewise man's four-footed relatives, into whose nostrils, as well as into man's, God breathed the breath of life, thereby making each a living soul."

"There is a fraternity more comprehensive and universal than the brotherhood of man. Let us think and speak of the "brotherhood of being."

J. H. Kellogg's—"Shall we Slay to Eat?"

মধ্যে পরস্পর পরস্পরে আদান প্রদান দ্বারা জড়জগতের ক্রমবিবর্ত্তন হইতেছে। ঐ দেখ উদ্ভিদ্ জড় হইতে আপন শরীরগঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। ঐ দেখ জীব মাত্রে জল বায়ু তাপ তড়িৎ প্রভৃতি স্থূল ভূত ও শক্তি হইতে, আপনার শরীরগঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে,—আপনার কর্ম্মশক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আবার ঐ যে জীব জড় হইতে আপনার উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, তাহা কোন না কোন ভাবে জড়কে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ঐ যে উদ্ভিদ্ সৌরতেজবলে ভূবায়ু হইতে অঙ্গজান বায়ু আকর্ষণ করিয়া, তাহা হইতে অঙ্গার পৃথক্ করিয়া লইয়া, নিজের শরীর পোষণ করিতেছে, এবং সেই শরীর দ্বারা বা ফল উৎপাদন করিয়া অপর জীবের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে, সেই উদ্ভিদ্‌কেই আবার মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম জীব প্রশ্বাস দ্বারা অম্লজান বায়ু ত্যাগ করিয়া আহার দান করিতেছে। এই যে উচ্চজাতীয় জীব নিম্নজাতীয় জীবশরীরকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে, সেই উচ্চজাতীয় জীবশরীরই আবার নিম্নজাতীয় জীবের আহার হইতেছে,—নিম্নজাতীয় জীবশরীরের উপকরণ দিতেছে। এই মানুষের শরীরই যে কত কৃমি কীট কত জীবাণুর (germs) আহার—কত জীবাণুর আবাসভূমি—তাহা কে সংখ্যা করিতে পারে। সর্ব্বত্র সেই এক নিয়ম। এক জীব একদিকে একরূপে যাহা গ্রহণ করিতেছে,—অন্য জীবকে তাহা আর একদিকে আর একরূপে দান করিতে বাধ্য হইতেছে। একদিকে এক জীব পরকে তাহার জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিতেছে—পর হইতে গ্রহণ করিয়া নিজে রক্ষিত ও পোষিত হইতেছে—এমন কি নিজের খাদ্যের জন্য পরকে পূর্ণ আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য করিতেছে,—আর একদিকে আর একরূপে সে, স্বেচ্ছায় হউক বা বাধ্য হইয়া হউক, পরার্থে কর্ম্ম করিতেছে—পরকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছে—পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে,—এমন কি পরের খাদ্যরূপে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে! আবার যে তাহার সে জীবন গ্রহণ করিতেছে, সেও আর একদিকে আর এক জীবের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সর্ব্বত্র ত্যাগ গ্রহণ। একদিকে আয় বা সঞ্চয়, আর একদিকে ব্যয় বা ক্ষয়। একদিকে যোগ, আর একদিকে বিয়োগ। একদিকে আবির্ভাব, আর একদিকে তিরোভাব। একদিকে (+), আর একদিকে (−)। একদিকে হরণ, আর একদিকে পূরণ। একদিকে সঙ্কলন, আর একদিকে ব্যবকলন। একদিকে

অভাব, আর একদিকে ভাব। একদিকে ঘাত, আর একদিকে প্রতিঘাত। ইহাই জগতের মহাচক্র। ইহাই এ জগতের মহানিয়ম। (১) এই নিয়মবশে প্রত্যেক জীব নিজের জন্য কর্ম্ম করিয়া যাহা গ্রহণ করে, পরের জন্য অন্য ভাবে তাহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এ নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই—ইহাতে কোথাও পক্ষপাতিতা নাই,—ইহা হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই,—ইহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

৬০। এইরূপে জগতে সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণ বা যোগবিয়োগের লীলা—বিকাশ-বিনাশের লীলা চলিতে থাকে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সর্ব্বত্র এই ত্যাগগ্রহণের লীলা। সমষ্টিভাবে সেই মহাশক্তির মহা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি বিকাশ পরিণতি হয়। কিন্তু সেই মহা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে সে অনন্ত অবিনাশী শক্তির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সে মহা শক্তিভাণ্ডার অক্ষয়। সেই শক্তির স্বরূপ অবস্থায় বা ব্রহ্মে লীন অবস্থায় যখন জগৎ থাকে না, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যখন সেই মহাশক্তি জগৎকে ব্যক্ত বা বিকাশ করেন, জগৎকে

---

(১) জগতের এই মহানিয়ম—মহাপ্রকৃতির এই মহাকর্ম্মতত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক হইতে বহু ও বহু হইতে এক—ইহাই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ নিয়ম,—জগতের ক্রমবিকাশ নিয়ম। অবিশেষ হইতে বিশেষের বিকাশ, ও বিশেষের অবিশেষে পরিণতি,—ইহাই মহাবিবর্ত্তন [illegible]। জগৎ সৃষ্টি কল্পে—ভূমা 'এক' হইতে অনন্ত 'অণু' একের (units) বিকা[illegible] ও সেই অনন্ত অণু 'এক' ক্রমে সম্মিলিত হইয়া সেই ভূমা একের দিকে ক্রমশঃ গতি—ইহাই মূল জগৎতত্ত্ব। এইরূপে জগৎ ব্যাকৃত হইলে, সেই অণু 'একের' পরস্পর সঙ্কলন ব্যবকলন হইতে জগতের ক্রমপরিণতি হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে—'এক' (unit) বিন্দুর সঙ্কলন হইতে স্থান বা দিক্। 'এক' ক্ষণের সঙ্কলন হইতে কাল। এক পরমাণুর সঙ্কলন হইতে জড় জগৎ। ব্যষ্টি 'এক' জীবাত্মার সঙ্কলন হইতে জীবজগৎ। মহাকালবশে এই মহাসঙ্কলন দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত হইলে, ব্যষ্টি সঙ্কলন ব্যবকলন দ্বারা জগৎ ক্রমবিবর্ত্তিত হয়। জড়জীব জগতে সর্ব্বত্র কালের এই সঙ্কলন ব্যবকলনের নিত্য লীলা। এই যোগবিয়োগ ক্রিয়ার সমাহারে জগতের স্থায়িত্ব—নিত্যত্ব। সমস্ত জগৎ এক মহা যোগবিয়োগের এক আশ্চর্য্য আদান-প্রদানের কর্ম্মক্ষেত্র। অথবা (আধুনিক গণিতবিজ্ঞানের কথায়) এ জগৎ—is a function—a materialised or objectified process of the Integral and Differential calculus। এ কঠিন দার্শনিকতত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

সৎ-রূপে পরিণত করেন, তখন সে শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থা সাম্যাবস্থা বা শান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করেন, নিজের স্বভাব বা শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন। তখন সে মহাশক্তি বিরাম অবস্থা হইতে কার্য্যাবস্থায় কর্ম্মরূপে বা প্রকৃতিরূপে পরিণত হন, ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ব্যষ্টিভাবে জড়জীবরূপ বহু কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া—পূর্ব্ব লীন সৃষ্টির সঞ্চিত কর্ম্মবীজকে বিকাশিত করেন, এবং সমষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রীরূপে কর্ম্ম করাইয়া তাহাদিগকে ক্রমপরিণত করেন। সেই মহাত্যাগ অবস্থায় সেই মহাশক্তি নিয়ত কর্ম্মশীল হওয়ায়, পূর্ব্ব কর্ম্মবীজ বিকাশিত হইয়া কর্ম্ম সঞ্চিত (accumulated) হইতে থাকে। এবং সেই কর্ম্মের ক্রমসঞ্চয়ে জগতের ক্রম-পরিণতি হয়। আর সেই শক্তির নিয়ত ক্রিয়ায় জগৎ ক্রমবর্দ্ধিত (accelerated) বেগে পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব সেই ব্রহ্মশক্তিই অপরা জড়প্রকৃতি রূপে ও পরা জীবপ্রকৃতি রূপে এবং সেই ব্যষ্টি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রী রূপে নিয়ত কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে জগতের ক্রমবিকাশ করেন। সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হইতে যে জড়জীবপ্রকৃতি রূপ জগতের বিকাশ হয়, সেই জড়জীবপ্রকৃতিও সেই শক্তিবলে সেই শক্তির নিয়ন্তৃত্বে ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের দ্বারা ক্রমপরিণত হইতে থাকে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জগৎ ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের জগতের মধ্যে যে প্রভেদ—তাহা যে এই মহাশক্তির এই কর্ম্ম জনিত—তাহা যে এই ব্যষ্টি জড়জীব সমূহের এই মহাশক্তি-নিয়মিত ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম হেতু পরিবর্ত্তন জনিত—ও সেই কর্ম্মফল সঞ্চয় হেতু উন্নতি জনিত—তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

[আমরা এস্থলে কেবল জগতের বিকাশ তত্ত্বই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। জগতের সৃষ্টি লয় তত্ত্ব আমাদের বুঝিবার এখানে আবশ্যক নাই। তবে এই মাত্র বুঝা আবশ্যক যে, সৃষ্টি অবস্থায় সমষ্টিভাবে জগতের ক্রমোন্নতি হইলেও ব্যষ্টিভাবে এই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম জন্য কোথাও ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক উন্নতি, কোথাও বা অবনতি হইয়া থাকে। যেখানে শক্তিসঞ্চয় কর্ম্মসঞ্চয়, যেখানে শক্তি সক্রিয়—সেখানে উন্নতি বা বিকাশের দিকে গতি হয়। আর যেখানে শক্তি ক্ষয়, কর্ম্মব্যয়, যেখানে শক্তি অভিভূত,—সেখানে অবনতি বা বিনাশের দিকে গতি হয়। যেখানে এক অবস্থায় বা এক সময় উন্নতি বা বিকাশ, সেখানে আর এক অবস্থায় বা আর এক সময় অবনতি বা বিনাশ। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথায়,—যেখানে প্রকৃতির

রজঃ বা কার্য্যশক্তি প্রকাশাত্মক সত্বশক্তি পরিচালিত—সেখানে উন্নতি, আর যেখানে তমঃ বা আবরণশক্তি পরিচালিত সেখানে অবনতি। সেই মহাশক্তির রজোরূপ কর্ম্মাবস্থায়—একদিকে সত্ব আর একদিকে তমঃ, একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অজ্ঞান, একদিকে সূর্য্য আর একদিকে সোম, একদিকে অগ্নি আর একদিকে শৈত্য, একদিকে শক্তির পূর্ণপ্রকাশ বা কর্ম্মের মুলরূপ আর একদিকে শক্তির অভিভূত বা নিবৃত্তি বা অপ্রকাশ অবস্থা, (অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথায়—একদিকে highest potential, highest source of energy—আর একদিকে zero potential, absolute zero of temperature)। সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল রজোরূপা কার্য্যজগৎ আকর্ষণবিক্ষেপাত্মক বা রাগদ্বেষাত্মক মহা সং-কর্ষণ শক্তিবলে ব্যষ্টি বিকাশবিনাশ, উন্নতিঅবনতি যোগবিয়োগ রূপ কর্ম্ম মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে এই উন্নতি অবনতি রূপ 'এজৎ' অনুকম্পন বা তরঙ্গ তুলিয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সমুদয় জগৎ সেই মহাপ্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অবস্থার মধ্যে নিরত গতাগতি করে। যদি কখন সেই প্রকৃতির পূর্ণনিবৃত্তি বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হয়, তখন সত্বশক্তি নিদ্রিত হয়, সমুদয় সঞ্চিত কর্ম্ম আবার সংস্কার বা বীজঅবস্থায় (Potential state) তমোঅভিভূত হইয়া সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হয়। আবার ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে সেই মহাব্রহ্মশক্তি সক্রিয় হইলে, সত্বশক্তি জাগরিত হইলে, আবার সেই সংস্কাররূপে পূর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চিত কর্ম্ম,—বীজ বা শক্তিঅবস্থা হইতে বিকাশ বা কার্য্যঅবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। আবার সেই সঞ্চিত কর্ম্মবীজ বা অনাদি বাসনাবীজ হইতে সেই মহাশক্তির মহাত্যাগ হেতু জগতের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ্যআন্তর জগৎ স্থূলসূক্ষ্ম জগৎ ব্যক্তঅব্যক্ত জগৎ—সর্ব্বত্র এই এক নিয়ম। এই ত্রিগুণতত্ব, এই মহাসৃষ্টিলয়তত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।]

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের বিকাশ অবস্থায় সেই পরমা বৈষ্ণবী শক্তি নিরত কর্ম্মশীল হইয়া, কর্ম্মরূপে আপনার স্বরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া, জড়জীবময় ব্যষ্টি জগৎকে আপনার শক্তি দান করিয়া এবং সেই শক্তিবলে জড় জীবকে নিরত ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম করাইয়া সেই কর্ম্ম ক্রমসঞ্চয়ের দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি করেন। ইহা হইতে আমরা প্রকৃতির মাতৃশক্তির কথা বুঝিতে পারি। মা নিয়ত কর্ম্মশীল হইয়া সন্তানকে পালন করেন, রক্ষা

করেন, সন্তানকে উন্নতির দিকে লইয়া যান, এবং সেইজন্য আপনার শক্তি সন্তানকে দান করেন, এবং প্রয়োজন হইলে সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সেইরূপে সেই জগন্ময়ী মহাশক্তিও মাতার ন্যায় আপন শক্তি এই জড়জীবময় জগতকে দান করেন। একদিকে আপনি জগৎরূপিণী হন, আর একদিকে জগতকে পালন ও রক্ষা করেন। আর সেই শক্তি লইয়া সেই শক্তির নিয়ন্তৃত্বে নিরত কার্য্যশীল হইয়া জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতি জীবের উন্নতির জন্য ও পরিণতির জন্যই বাধ্য করিয়া জীবকে প্রথম হইতেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে—স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তাহাতে সেই মহাপ্রকৃতি জীবের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেন না—সাময়িক উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য করেন না,—সমষ্টিভাবে সর্ব্ব জীবের শেষ উন্নতি শেষ পরিণতির দিকে মহালক্ষ্য করিয়া জীবকে কর্ম্মে রত করেন।

৬১। অতএব যে মহাশক্তি এই মহাত্যাগ কর্ম্ম দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি করেন, যিনি তাঁহার স্বরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা—ব্রহ্মে বিরাম অবস্থা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় হইয়া কর্ম্মরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন,—জগতে কর্ম্মরূপে ক্রমসঞ্চিত হইয়া তাঁহার কালশক্তিবলে জগৎকে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে ক্রমপরিণত করেন, যিনি জড়জীবপ্রকৃতিরূপে বিকাশিত হইয়া জড়জীবকে নিজের কর্ম্মশক্তি দান করিয়া জড়জীবকে সেই শক্তিবলে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তিনিই প্রত্যেক জড়জীবকে স্বার্থ কর্ম্মের সহিত পরার্থ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, মহা সঙ্কর্ষণ শক্তিবলে আকর্ষণ বিক্ষেপ ক্রিয়া দ্বারা ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে বা স্বার্থপরার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। এই জন্য জড়জগতে সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম,—জীবজগতে সর্ব্বত্র ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম।

[এই জন্য জড়জীবময় সমুদয় জগৎ এক অনন্ত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ—কর্ম্মসূত্রে সেই মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। সেই কর্ম্মসূত্র দ্বারা প্রত্যেক 'এক' প্রত্যেক 'অন্যের' সহিত সম্বন্ধ। প্রত্যেক কর্ম্মেই একের সহিত অন্যের সংস্রব থাকে। আর সুধু 'একের' সহিত 'অন্যের' সম্বন্ধ ধরিলে বুঝি যথেষ্ট হয় না। সমুদয় জগৎ যে মহা সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। সে মহা কর্ম্মসূত্রের ধারণা হয় না। প্রত্যেক 'এক' যে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মে

তৎসংসৃষ্ট সমুদয় অন্যের সম্বন্ধ থাকে—সমুদয় জগতের সম্বন্ধ থাকে। 'এক' যে কর্ম্ম করে, তাহাতে সমুদয় 'অন্যের' অল্পাধিক পরিমাণে আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হয়। 'একের প্রত্যেক কর্ম্মে 'অন্য'কে আঘাত করে, আর সেই 'এক'কে প্রতিঘাত করে। আর সেই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ বুঝি সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ যে সুদূর সৌরদেহে তাপ তড়িত আলোক তরঙ্গ নিয়ত উত্থিত হইতেছে, সে তরঙ্গ আকাশ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে। তাই আমরা তাপ আলোক পাইয়া জীবিত রহিয়াছি। ঐ যে সৌর দেহে সময়ে সময়ে তাড়িত বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিঘাতফলে এ পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সূর্য্য ত পৃথিবী হইতে কিঞ্চিদধিক যোজন কোটী ক্রোশ পথ মাত্র দূরে অবস্থিত। যে সকল নক্ষত্র এখান হইতে পরার্দ্ধ কোটী যোজন পথ দূরে রহিয়াছে, তাহারও আলোক তরঙ্গ—এ অনন্ত স্থান ব্যবধান উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর তটে আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে। গ্রহে উপগ্রহে সূর্য্যে সুদূর নক্ষত্রে যেখানে যখন যে শক্তিক্রিয়া হইতেছে, এ পৃথিবীতে সে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে এ পৃথিবীর অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা পৃথিবীর প্রত্যেক জড়জীবকে আঘাত করিতেছে। সে আঘাত ফলে স[illegible]যোগবিয়োগ কর্ম্ম ত্যাগগ্রহণ কর্ম্ম আকর্ষণবিক্ষেপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে,-[illegible]তে সর্ব্বত্র অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। সে কর্ম্মশক্তি যত [illegible] হয়, ক্রিয়ার বল যত অধিক হয়, এই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ তত বেগব[illegible]ী—তত সুদূরপ্রসারী হয়। তত আমরা সে ক্রিয়ার ব্যাপকতা বুঝিতে পারি। কিন্তু যেখানে শক্তিক্রিয়া সামান্য যেখানে ফল সামান্য, সেখানে তাহার ব্যাপক[illegible] আমাদের ধারণা হয় না। গণিতবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, আমি একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া যে মনে করি যে, উহার গতি রুদ্ধ হইলেই উহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে,—তাহা বাস্তবিক পক্ষে সত্য নহে। সে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা আকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবীকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। কেন্দ্রচ্যুত পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য—সমুদয় সৌরজগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। সৌরজগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া প্রত্যেক নাক্ষত্র-জগৎকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে। অবশ্য সে কেন্দ্রচ্যুতি এত সামান্য যে, আমরা তাঁহার পরিমাণ করিতে পারি না—তাহার ক্ষুদ্রত্ব ধারণা করিতে পারি না। যেমন অতি বৃহতের ধারণা হয় না,—তেমনই অতি ক্ষুদ্রেরও ধারণা হয় না। যেমন

মহানের ধারণা হয় না, তেমনি বিন্দুর ধারণা হয় না। (১) তাহা না হউক, আমার ঐ ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপে যে সমুদয় সৌর নাক্ষত্র জগতের কেন্দ্রচ্যুতি হয়, তাহা গণিতবিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য।

ইহা জড় জগতের কথা। জড়জীবের সকল কর্ম্মে—আমাদের কায়িক বাচিক মানসিক সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই কথা। চিন্তা জগতের—ভাব জগতেরও এই কথা। আমরা যে কোন চিন্তা করি, যে কোন কথা বলি, তাহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দতরঙ্গ তাহার সূক্ষ্ম শক্তিতরঙ্গ সূক্ষ্ম ভাব জগতে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝি জগতের সর্ব্বত্র ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে, তাহা বুঝি হিরণ্যগর্ভে গিয়া মিশাইয়া যায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার অন্তরের নিভৃত কক্ষের একটী সামান্য চিন্তা যে এমন করিয়া সমস্ত জগৎকে আলোড়িত করিতে পারে, সমস্ত ভাব জগতে যে ধীরে ধীরে ক্রিয়া করিতে পারে, অথবা আমার সামান্য বলে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপে সমস্ত জগৎ যে বিচলিত হইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। জগতে প্রত্যেকের প্রতি কর্ম্মে এইরূপে সর্ব্বত্র ঘাতপ্রতিঘাত, যোগবিয়োগ ব্যাপার চলিতে থাকে। বলিয়াছি ত, প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তে জড়জীবজগতে প্রত্যেক 'এক' প্রত্যেক অন্যকে যেরূপ পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ত্যাগ গ্রহণ কর্ম্ম দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল—প্রত্যেক পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের জগৎ পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা গঠিত। এই রূপে সমুদয় জগৎ কর্ম্ম দ্বারা ক্রমপরিণত হয়, কর্ম্ম সঞ্চয়ে ক্রমবিকাশিত হয়,—কাল রেখায় ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়,—অনন্ত অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে চলিয়া যায়। এই

---

(১) বিন্দুর ধারণা হয় না। এইজন্য ব্রহ্মকে অনন্ত ও বিন্দু বলে। আমরা যত ক্ষুদ্র অণুর ধারণা করি না কেন—অণুবীক্ষণে তাহাই কত বৃহৎ দেখায়। যে সামান্য কীটাণুকে ভাল অণুবীক্ষণেও স্পষ্ট দেখা যায় না, তাহারও শরীরে কত যন্ত্র, তাহারও শরীরসৃষ্টিকৌশল কত অদ্ভুত, তাহারও শরীরের পরমাণু সংখ্যা কত অধিক! বহু নহে—এমন এককে স্পষ্ট ধারণা করিতে গিয়া আমাদের জ্ঞান অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা যতই অণুর কল্পনা করি—সকলই ভাবিয়া দেখিলে বৃহৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটী রেখাকে অনন্ত বার বিভাগ করিতে করিতে গিয়াও যেখানে তাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না—বা যেখানে সে রেখা বিন্দুতে শেষ হইবে—আমরা সে পর্য্যন্ত কল্পনা করিতেও পারি না। Infinitely great এবং Infinitely small—উভয়ই আমাদের ধারণার অতীত।

কর্ম্মতত্ত্ব বড়ই গহন— বড় আশ্চর্য্য। এস্থলে সে সব তত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োজন নাই।]

৬২। জগতের এই মহা কর্ম্মতত্ত্ব—কর্ম্মের এই অনন্ত ব্যাপকত্ব এস্থলে আমাদের বুঝিবার আবশ্যক নাই। জীবজগতের ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্মের কথা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। বলিয়াছি ত, জীব যখন কোন কর্ম্ম করে, তখন হয় কিছু গ্রহণ করে—না হয় কিছু ত্যাগ করে। বলিয়াছি ত সকল কর্ম্মে জড়জীবজগতের সমুদয় কর্ম্মেই একের সহিত অন্যের নানারূপ সম্বন্ধ থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। কর্ম্মের যে মূল কারণ প্রকৃতি (১), কর্ম্মের যে বিভিন্ন ব্যষ্টিকারণ (২), যে বিষয়সম্পর্কজনিত ইচ্ছাদ্বেষ কারণ, কর্ম্ম প্রবৃত্তির যাহা হেতু বা আশ্রয় (৩), কর্ম্মের যে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারক,—তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা কেবল কর্ম্মের 'কর্ত্তা' ও 'কর্ম্ম' সম্বন্ধ, এবং কর্ম্মের দাতা গৃহীতা সম্বন্ধ, বা যাহার জন্য কর্ম্ম কৃত হয় বা যাহাকে কর্ম্ম সম্প্রদান করা হয় তাহার সহিত কর্ত্তার ও কর্ম্মের সম্বন্ধ—তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মের যে ব্যবহারিক কর্ত্তা, সে স্বশক্তি বলে বা প্রকৃতির বশে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করে। আর—এক জনের উপর কর্ম্ম কৃত হয়। একজন (active) কর্ম্মশীল, আর একজন (passive)) কর্ম্মসহ। জীব বা কর্ত্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা প্রকৃতিচালিত হইয়া স্বার্থবুদ্ধিবশে যেমন নিজের সুখকর বিষয় গ্রহণ ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ করে, তেমনই পরার্থবুদ্ধিবশে পরের জন্য নিজের সুখকর বিষয় ত্যাগ করে বা দুঃখকর বিষয় গ্রহণ করে। জীব যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা প্রকৃতি পরিচালিত হইয়া নিজের ও পরের জন্য

---

(১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা,—৩। ২৭।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ। গীতা,—৩। ৫।

(২) পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ গীতা,—১৮। ১৩-১৪।

(৩) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ গীতা,—১৮। ১৮।

কর্ম করিতে জড়জগৎ হইতে বিষয় গ্রহণ করে, তখন সে কর্ম্মে জীবজগতের লাভ হয়, জড়জগতের ক্ষতি হয়। আবার জড়জগৎ যখন জীবজগৎ হইতে তাহার প্রাপ্য কর আদায় করে,—সে যখন তাহার নিজের ক্ষতি পূরণ করিতে যায়,—জড় আত্মত্যাগ করিয়া জীবকে যে শরীর দিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া লইতে যায়, তখন জীবজগতের ক্ষতি হয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কথা আছে। এই ভাবে দেখিলে, কর্ম্ম মাত্রেই একদিকে লাভ ও আর একদিকে ক্ষতি হয় বটে,—ব্যষ্টিভাবে এই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মে একের ক্ষতি ও অপরের লাভ হয় বটে,—কিন্তু বলিয়াছি ত, সমষ্টিভাবে সেই লাভ ক্ষতি থাকে না। সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না, বরং কর্ম্মরূপে জগতে সে শক্তি-সঞ্চয়ে জগতের লাভ বা ক্রমোন্নতি হয়। তবে সেই ক্রমোন্নতি জন্য পর পর নিম্ন সৃষ্টির ক্ষতি করিয়া পর পর উচ্চ সৃষ্টির লাভ করিয়া দিতে হয়। জীবত্বের ক্রম-বিকাশ জন্য জড়ত্বের ক্ষতি করিতে হয়। এই জীবত্বের ক্রমবিকাশ জন্য এ পৃথিবীর উদ্দাম প্রাকৃত শক্তিলীলাকে উৎকট তাপাদির ক্রিয়াকে অভিভূত করিতে হয়, পৃথিবীর সে গলিত তরল অগ্নিময় অবস্থাকে অভিভূত করিয়া শান্ত শীতল কঠিন মেদিনীরূপে পরিণত করিতে হয়। সেইরূপ উচ্চ প্রাণীজাতির বিকাশের জন্য পৃথিবীর উদ্ভিদ্‌জাতির ক্ষতি করিতে হয়। পৃথিবীতে যখন মানবাদি উচ্চ জীবের আবির্ভাব ছিল না—তখন চারিদিকে যে ঘোর অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল, এখন আর সে অরণ্যানী ক্বচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পৃথিবী তাহার সেই উদ্ভিদ্‌আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া—তাহা মানুষাদি উচ্চ জীবের বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছে, তাহার উদ্ভিদ্‌কে মানুষদের আহার ও অন্যরূপে ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিয়াছে,—তাহার জড়শক্তিকে উদ্ভিদ্‌কে ইতর জীবকে মানুষের সহায়রূপে পরিণত করিয়াছে। তখন সে অরণ্যানী যে বৃহদাকার ম্যামথ্ ম্যাস্‌তদনে পূর্ণ ছিল, সে ভীমকায় জীবজাতির লোপ করিতে হইয়াছে। বলিয়াছি ত, পৃথিবীতে যতই মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ হইতেছে, ততই সে মনুষ্যত্ব বিকাশে যে অপর জীব বাধা দেয়,—সে সব হিংস্র জীবের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। উন্নত জনপদে ব্যাঘ্র সিংহাদি বা বিষধর সর্পাদি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপে যে সকল পশুজাতি মনুষ্যের সহায়—তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। মনুষ্য মধ্যেও, উন্নত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের জন্য, নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য মনুষ্য-

সমাজের ক্রমশঃ লোপ হইয়া যাইতেছে। জগৎ যে মহা একত্বসূত্রে গ্রথিত—প্রত্যেক ব্যষ্টি যে সমষ্টির অন্তর্গত—যে এক বিরাট সমাজের অঙ্গীভূত,—পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া যে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত,—তাহাতে যাহারা বাধা দেয়, যাহারা জগতের মহাসঙ্গীতে বিতন্ত্রী রূপে তাড্যমান হয়, তাহাদের বিনাশই জগতের মহানিয়ম। অতএব সমষ্টিভাবে এই লাভ-ক্ষতি রূপ কর্ম্মের দ্বারা জগতের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

৬৩। এই ক্রমবিকাশ নিয়মবশে ব্যষ্টি জীব সকলেই স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। স্বার্থকর্ম্মে জীবের নিজের লাভ ও পরের ক্ষতি হয়, আর পরার্থ কর্ম্মে তাহার নিজের ক্ষতি ও পরের লাভ হয়। এই ক্ষতি লাভ সামঞ্জস্য করিবার জন্যই জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। জীবের চৈতন্য যতক্ষণ বিকাশিত বা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমোহে প্রকৃতিচালিত হইয়া জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম্ম করে। পরে যখন চৈতন্য বিকাশিত হয়, তখন জীব তাহার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানবলে নিজের লাভ মাত্র বুঝিয়া লইয়া—নিজের সুখকর বিষয় অর্জ্জন ও দুঃখকর বিষয় পরিহার জন্য কর্ম্মে প্রেরিত হয়। তখন জীবচৈতন্য তাহার স্বার্থ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, জীব পরের সুখ দুঃখ বুঝে না, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে বা নিজের লাভের জন্য পরের ক্ষতি করিতে কাতর হয় না,—সেখানে সে পরের লাভের জন্য নিজের ক্ষতি করিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হয় না। ক্রমে জ্ঞানবলে জীবের এই স্বার্থ গণ্ডী বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে জীব মমতার মোহে সন্তানকে আপনার ভাবিতে শিক্ষা করিয়া সন্তানার্থ কর্ম্মকে স্বার্থকর্ম্ম মনে করে। তাহার পর আরও প্রকৃতির আপূরণে সহানুভূতি বশে মানুষ যতদূর পর্য্যন্ত যে যে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত স্বার্থ কর্ম্ম ভাবিয়া সেই সেই পরের জন্য কর্ম্ম করিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলে স্বার্থ কর্ম্মের সহিত পরার্থ কর্ম্মের আশ্চর্য্য সম্মিলন বা সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। জ্ঞান যতই বিকাশিত হইতে থাকে, পরার্থবৃত্তি সহানুভূতি প্রভৃতির যতই বিকাশ হয়, ততই সে সামঞ্জস্যের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা যে যে পরকে পর ভাবি, যে যে পরের সহিত আমাদের সহানুভূতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সে পরের জন্য কর্ম্ম করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। পরকে পর ভাবিয়া স্বেচ্ছায় সাধারণ জীব পরার্থ কর্ম্ম করিতে চাহে না। কেন না সে পরার্থ

কর্ম্মকে স্বার্থকর্ম্ম না ভাবিলে জীব পরার্থ কর্ম্মে ক্ষতি বোধ করে, তাহাতে সুখ পায় না। অতএব যে নিজের ব্যক্তিগত সুখ চাহে, স্বার্থ চাহে, সে পরকে পর ভাবিয়া—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে না।

কিন্তু জীবের পরার্থ কর্ম্ম না করিলেও চলে না। জীব নিজের বৃদ্ধি পোষণ ও রক্ষার জন্য পরের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করে, তাহা পরার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য—পরকে তাহা 'কড়া ক্রান্তিতে' বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। কাজেই যেখানে জীবের জ্ঞান বিকাশ হইয়াছে—যেখানে জীব নিজের সুখ দুঃখ বুঝিয়া, কেবল স্বার্থ কর্ম্ম মাত্র করিতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, যেখানে জীব কেবল আপনার গণ্ডাই বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত, পরের নিকট যাহা ঋণ করিয়াছে তাহা দিতে চাহে না, সেইস্থলেই প্রকৃতি বাধ্য করিয়া জীবকে পরার্থ কর্ম্ম করান। আর সেইস্থলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে গিয়া জীব দুঃখ পায়। জীব ইচ্ছা করিয়া সহজ-জ্ঞান চালিত হইয়া পরার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে না। জীব পরের খাদ্য হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে চাহে না। জীব জড়প্রকৃতির নিকট নিজ শরীরগঠনোপযোগী যে উপকরণ লইয়াছে, তাহা আর সে প্রকৃতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহে না। সুতরাং সে অবস্থায় প্রকৃতি জীবকে বাধ্য করিয়া পরার্থ কর্ম্মে প্রেরণ করেন, অথবা পরার্থ কর্ম্ম সহ্য করিতে বাধ্য করেন, পরার্থে শরীর পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য করেন, জীবশরীরকেও অন্য জড় ও জীবশরীরের খাদ্যরূপে পরিণত করিতে বাধ্য করেন। তাহাতেই জীব দুঃখ পায়। আর সুধু যে জীব অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করে বলিয়া দুঃখ পায়, তাহা নহে। জীব স্বার্থচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে গিয়াও দুঃখ পায়। জীব যখন নিজের—ও সহানুভূতিবলে পরের—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য পরের নিকট তাহার প্রেয় বিষয় গ্রহণ করিতে যায়, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে যায়, তখন সে পর তাহার সে কর্ম্মে বাধা দেয়। স্বার্থচালিত জীব স্বার্থে ত্যাগগ্রহণ কর্ম্মে পর কর্ত্তৃক যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সে দুঃখ পায়। সে কর্ম্মে সে নিজে দুঃখ পায়, পরকেও দুঃখ দেয়। আর যখন মানুষ পর হইতে এই রূপ বাধা পায়, তখন সে পরের প্রতি তাহার ক্রোধ হয়। তাহার হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়। কাজেই বাধা দূর করিয়া সে কর্ম্মে সফলতা লাভ করিলেও মানুষের প্রকৃতি ক্রমে কলুষিত হওয়ায় পরিণামে তাহার ক্ষতি হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে বলিয়াছি। প্রতি

কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তরে সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। এই কু-সংস্কারজ কুপ্রবৃত্তি—আমাদের পরিণামে দুঃখের কারণ। এইরূপে স্বার্থ কর্ম্মে আপাততঃ পরের ক্ষতি করিয়া লাভ করিতে পারিলেও পরিণামে আমাদের ক্ষতি হয়। স্বার্থ-কর্ম্ম মাত্রেই তাই পরিণাম দুঃখজনক। সে কর্ম্মফল দুঃখ। আর যে স্বেচ্ছায় সুপ্রকৃতিবলে পরার্থ কর্ম্ম করিয়া আপাততঃ নিজের ক্ষতি করে—সে কর্ম্ম আপাত-দুঃখকর হইলেও সেরূপ কর্ম্ম করিতে করিতেই সে তাহা হইতে আনন্দ পায়, আর তাহাতে যে সুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাতে পরিণামে তাহার লাভ হয়। এই অর্থে কর্ম্মমাত্রেই দুঃখকর,—কর্ম্মমাত্রেই দুঃখজড়িত। অতএব কর্ম্মহেতু জীবদুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যতদিন জীব সহজ বা সঙ্কীর্ণ জ্ঞানবশে ক্ষুদ্র স্বার্থ চালিত হয়, যতদিন মানুষ কেবল নিজের লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া কর্ম্ম করিতে চাহে, যতদিন জীব যে পরের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়—সে পরকে আপনার করিয়া লইতে না পারে, পরার্থ কর্ম্মকে স্বার্থ কর্ম্ম মনে করিতে না পারে, পরার্থ কর্ম্মকে স্বার্থ কর্ম্ম মনে করিয়া না সুখ পায়, ততদিন জীবদুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যতদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত হইবে, পরকে পর ভাবিয়া পরার্থ কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম—স্বার্থ কর্ম্ম—নিজ সুখকর কর্ম্ম—মনে করিতে না পারিবে, পরের মঙ্গলের জন্য নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমুদয় কর্ম্মবৃত্তিকে পরার্থ পরিচালিত করিতে না পারিবে, প্রয়োজন হইলে পরার্থ শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত স্বার্থ কর্ম্ম ভাবিতে না শিখিবে—যতদিন মানুষ নিজের স্বরূপ—সুখদুঃখের স্বরূপ না বুঝিবে, যতদিন মানুষ জগতের এই মহা কর্ম্মচক্র ধারণা করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ততদিন সে দুঃখ মোহে অভিভূত হইয়া, প্রকৃতির করুণা মমতার কথা, তাহার শরীর গঠন রক্ষা ও পোষণের জন্য প্রকৃতির নিয়ত চেষ্টার কথা, তাহার জন্য অপরের ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়া সে প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবে, নিজের অদৃষ্টকে—বিধাতাকে দোষ দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অমঙ্গলবাদ,—মৃত্যু অমঙ্গল নহে,—দুঃখ অমঙ্গল নহে,—জড়ে ও নিম্নজীবে দুঃখবোধ নাই,—জ্ঞানবিকাশে দুঃখবোধের বিকাশ,—আমাদের শারীরিক দুঃখবোধের প্রয়োজন।

৬৪। এই দারুণ দুঃখ মোহে পড়িয়া প্রকৃতিকে মাতৃরূপা মমতাময়ী বলিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না। এই যে এক জীব আর এক জীবের খাদ্য-রূপে নিজ শরীর বিসর্জ্জন দিতেছে—এই যে এক জীব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরার্থ আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজের ক্ষতি করিতে বাধ্য হইতেছে,—এই যে জীব—জড়ের অত্যাচারে কত ক্লেশভোগ করিতেছে,—শরীর পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছে,—এই যে জগতে চারিদিকে জীবহিংসা প্রাণীহত্যা ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে,—এই যে জীব দুঃখ জরা ব্যাধি মৃত্যুতে নিয়ত ক্লিষ্ট হইতেছে,—ইহাতে নিদারুণ প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা, অযথা অপব্যয় বা অপব্যবহারের কথা,—তাহার মহা ধ্বংশলীলার কথা আমাদের সহজেই মনে হয়। শিশুর অকাল মৃত্যুতে, যুবক-যুবতীর অসময় মৃত্যুতে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর শক্তির পূর্ণবিকাশের পূর্ব্বে মৃত্যুতে, ঝটিকা অগ্ন্যুৎপাৎ মহামারি প্রভৃতি আধিভৌতিক কারণে সমগ্র জনপদের ধ্বংশে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক নানা কারণে দুঃখ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া তাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি একরূপ অভিভূত হওয়াতে,—আমরা প্রকৃতির অপব্যয়, প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অন্ধ ক্রিয়া, তাহার জড়ত্ব কল্পনা করি। আমরা জগতে সর্ব্বত্র হত্যা ও মৃত্যুর রাক্ষসী লীলা, জীবহিংসার পৈশাচিক ব্যাপার, দুঃখ ক্লেশের ভৈরব অত্যাচার, জীবমুণ্ডমালিনী কালশক্তির নিদারুণ নৃত্য, নির্ম্মম প্রকৃতির সৃষ্টিনাশ লীলা, 'ভাঙ্গগড়া' কাজ সর্ব্বত্র দেখিয়া থাকি। দেখিয়া

প্রকৃতিকে জড় সর্ব্বনাশী বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের মনে হয়—যেন প্রকৃতির সঙ্গে—জগতের সঙ্গে আমাদের চির বিরোধ, যেন আমাদের নিষ্পেষিত করিবার জন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যেন আমাদের চির দুঃখসাগরে যন্ত্রণার ঘোর নরকে চির নিমগ্ন রাখিবার জন্তই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন সমস্ত জগৎটাকে বড় বেসুরা বোধ হয়—তখন জগতের মহাসঙ্গীতের সেই মহাতান আমরা শুনিতে পাই না। তখন আমরা সে মহাসঙ্গীতের মহা একতানের সুর হইতে বেসুরা বাঁধা তারের মত হইয়া পড়ি—বিরাট জগতের মধ্যে একটা অবাধ্য অণু (jarring atom) হইয়া পড়ি। তখন হতাশ হইয়া জীবনব্যাপী বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, দারুণ স্বার্থপর হইয়া নির্ম্মম হইয়া আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত,—সে মহা ঘূর্ণীপাক হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত,—পরের সঙ্গে সমুদায় জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আমরা প্রস্তুত হই। সে অবস্থায় চৈতন্তরূপিনী মাতৃরূপা আদ্যাশক্তির তত্ত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না। এক জীব যখন আত্মরক্ষার জন্ত আর এক জীবকে নষ্ট করে, বিশেষতঃ যখন খাদ্যের জন্ত এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে হত্যা করে, যখন চারিদিকে দেখা যায় জীব জীবহিংসা করে,—তখন মাতৃরূপা প্রকৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতিকে রাক্ষসী বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই যে জগতে সর্ব্বত্র জরা মৃত্যুর লীলা দেখিতেছি, এই যে জীব মধ্যে সর্ব্বত্র মারামারি, কাটাকাটি খাওয়াখায়ি দেখিতেছি, এই যে ইতরজীব মধ্যে, মানুষের মধ্যে চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ হত্যাব্যাপার দেখিতেছি,—এই যে সর্ব্বজীবকে জীবনস[illegible]মে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত দেখিতেছি, আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বজীবকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে দেখিতেছি, এক জীব তাহার জীবন রক্ষার জন্ত—আহার সংগ্রহ জন্ত লক্ষ লক্ষ অপর জীবকে নষ্ট করিতেছে দেখিতেছি—এই কি জগতে মহামাতৃশক্তির ক্রিয়া! এই যে জগতে কেবল দুঃখ, কেবল ক্লেশ, কেবল ব্যাধি, কেবল অস্থিরতা নশ্বরতা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি, দেখিয়া জগৎকে দুঃখময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, অমঙ্গলবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি, তথাপি কি প্রকৃতিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিব? সমস্যা বড় কঠিন। যাঁহারা শিবময় মঙ্গলময়ের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, যাঁহারা করুণাময়ী মহাপ্রকৃতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, জগতের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব মহাবিকাশতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারেন। আমরা চৈতন্তরূপিনী মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপা বিকাশ, জড়জীবময় জগতের রক্ষা ও উন্নতির প্রযত্ন—বুঝিতে পারি না।

কিন্তু সে আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব জন্য,—ঐ যে ক্ষয়ব্যয় হয় তাহার কোথায় সঞ্চয় হয় তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না—এই জন্য, সুখ দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্য, অনন্তের অসীমের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্য, অনন্তময়ের অনন্তত্ব হেতু অনন্ত অণু হইতে মহানের ও অপূর্ণ হইতে পূর্ণত্বের অনন্তরূপে বিকাশ ও অনন্ত পরিণতির মহাতত্ত্ব জগতের মহা ক্রমবিকাশতত্ত্ব আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না—এই জন্য।

৬৫। কিন্তু সে বিরাট তত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিলেও, জগতের ক্রমবিকাশের জন্য—জীবের ক্রমোন্নতি জন্য প্রকৃতির মহাকর্ম্মতত্ত্ব—সে মহাত্যাগ তত্ত্ব আমরা কতকটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রকৃতির মহাশক্তিতে জীবপ্রকৃতির ক্রমআপূরণ হইয়া জীবত্বের কিরূপে ক্রমবিকাশ হয়, পূর্ব্বে তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টিভাবে দেখিলে, সেই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে আমরা সম্যক্ দেখিতে পাই না বলিয়া, আমরা অনেক স্থলে প্রকৃতির অপব্যয়ের কথা মনে করি। অনেক ইতর জীবজাতির ব[illegible]ক্ষণ সম্বন্ধে প্র[illegible]তির ব[illegible]চ্ছিন্ন্য বা সুবন্দোবস্তের অভাব দেখি, আমরা প্রকৃ[illegible]র অপব্যয় বা অক্ষমতা মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ অপব্যয় নাই। বলিয়াছি ত, একস্থানে যাহা অপব্যয় মনে হয়, তাহা অন্যস্থানে অন্যরূপে সঞ্চিত হয়। আমরা তাহা বুঝি না, তাই প্রকৃতির অপব্যয় মনে করি। বাস্তবিক যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ হইতে পারে না। এই যে এক জীব আর এক জীবের অন্ন হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না। তাহাতে পারমার্থিক ভাবে সে জীবের মৃত্যু হয় না। জৈবশক্তি যখন বাহ্য স্থূল জড়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া স্থূল জড়শরীর ত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করে,—অথবা প্রাণশক্তির অন্য বিশেষ বিকাশের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন জীবের ব্যবহারিক মৃত্যু হয় মাত্র। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবের জন্মান্তর আছে,—জীবের ক্রমোন্নতি আছে। জীবকে ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নানাজাতীয় জীবস্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং এক জীব আর এক জীবের খাদ্যরূপেই তাহার জীবন উৎসর্গ করুক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মে যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হউক, সে

মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না, তাহার প্রাণশক্তির লয় হয় না, অথবা নিম্নতর জড়শক্তিতে পরিণতি হয় না। তাহাতে সে জীবের পরকালে ক্রমোন্নতিতে কোন বাধা হয় না। এ জগতে জীবনীশক্তির কোন ধ্বংশ হয় না। এ জগতে প্রাণ-শক্তির (life এর) কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কোন অপচয় উপচয় নাই—কোন ধ্বংশ নাই। যেমন জড়পরমাণু বা জড়শক্তির কোন ধ্বংশ নাই, তাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র,—তেমনই জৈবশক্তিরও কোন ধ্বংশ নাই, তাহাও রূপান্তরিত হয় মাত্র। কিন্তু রূপান্তরিত হইলেও, তাহা কখনও স্থূল জড়শক্তিতে পরিণত হয় না। সেইরূপ স্থূল জড়শক্তিও কখন প্রাণশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না (১)। পরাপ্রকৃতি কখন অপরা প্রকৃতিতে পরিণত হয় না। স্বয়ং ব্রহ্মপ্রকৃতি, আমাদের মধ্যে—সর্ব্বজীব মধ্যে প্রাণশক্তিরূপে অবস্থিত থাকেন। তাই প্রাণ—ব্রহ্ম। তাই ভগবানই সর্ব্বভূতের জীবন। (২) এই প্রাণশক্তি নিত্য—একজন্য মৃত্যু নাই। মৃত্যুতে প্রাণশক্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর হয় মাত্র। একরূপে একস্থানে এই

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও প্রাণশক্তির নিত্যত্ব ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়াছেন। কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন,—

"The attemt to get the living out of the dead has failed. Spontaneous Generation has had to be given up. And it is now recognised on every hand that Life can only come from the touch of Life. Huxley categorically announces that the doctrine of Biogenesis, or life only from life 'is victorious along the whole line at the present day.' * * Tyndall is compelled to say, 'I affirm that no shread of trustworthy experimental testimony exists to prove that the life in our day has ever appeared independently of antecedent life'."

H. Drummond's—'*Natural law in the Spiritual World.*' p. 63.

আধুনিক রাসায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জৈবশক্তির নিত্যত্ব ও জড়শক্তিতে তাহার অপারিণামিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাসায়ণবিদ্যাবলে এপর্য্যন্ত কেহ inorganic জড় হইতে organic জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। যে স্থানে পারিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, সে স্থলে উচ্চতর জৈবপদার্থের বিশ্লেষণে নিম্ন শ্রেণীর জৈব পদার্থের পরিণতি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতর জীবনী শক্তিবলে যে দেহ সংগঠিত হয়, মৃত্যুর পর তাহার বিশ্লেষণে তাহা হইতে নানা ক্ষুদ্র জৈব পদার্থের উৎপত্তি হয়,—তাহা নানা ক্ষুদ্র জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ভূমি রূপে পরিণত হয়।

(২) 'জীবনং সর্ব্বভূতেষু।'—গীতা—৭। ৯।

প্রাণশক্তির ধ্বংশ বোধ হয়—মৃত্যুতে তাহার বিনাশ অনুমিত হয়, কিন্তু অন্যদিকে অন্যরূপে তাহারই আবির্ভাব হয়। এইজন্য এক জীব অপর জীবকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে, তাহার জীবনীশক্তিও কতক অংশে গ্রহণ করে—আত্মসাৎ করিয়া লয়। অথবা অন্যত্র অন্যরূপে সেই জীবনীশক্তির আবির্ভাব হয়। (১)

[কিন্তু 'জীবের মৃত্যু নাই—জন্মান্তর আছে,'—একথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মৃত্যুতে জীবত্বের অত্যন্ত ধ্বংশ সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞানের অবিকাশিত অবস্থায়, মানুষ সতের অসৎ পরিণাম স্বীকার করে,—জড়জীবের ধ্বংশ বা অত্যন্ত লয় সিদ্ধান্ত করে। তবে অসভ্য অশিক্ষিত মানুষও, কখন কখন অত্যন্ত ধ্বংশের ধারণা করিতে গিয়া, যখন তাহা জ্ঞানের স্বভাববশে ধারণা করিতে পারে না,—অথবা যখন মৃত্যুতে আত্মীয়ের অত্যন্তলয়কল্পনা কষ্টকর হয়,—তখন পরলোকে বিশ্বাস করে। এজন্য অনেক অসভ্য সমাজেও প্রেতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে স্পষ্ট ধারণার চেষ্টা না করিয়া অস্পষ্ট ভাবে—জড় ও জীবের স্থিতিলয় কল্পনা করে ;—ঐ যে বর্ত্তিকা জ্বলিয়া জ্বলিয়া ক্ষয় হইতেছে—সে ক্ষয়ে উহার ধ্বংশ হয়—মনে করে। ক্রমে জড় সম্বন্ধে সে ভ্রম বিজ্ঞান ঘুচাইয়া দেয়। বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে যে জড় নিত্য—মৌলিক পদার্থের ধ্বংশ নাই। এমন কি যে ক্ষুদ্র 'জল-অণু' এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত থাকিয়া—আবার বিযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইতেছে—তাহারও

(১) এই প্রাণশক্তিতত্ত্ব হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কতকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে,—

"Life is "the sum total of the functions which resist death" ; life is a "continuous adjustment of internal relations to external relations," "a correspondence with environments."

কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার কেবল প্রাণকার্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আংশিক মাত্র। তিনি মূল প্রাণশক্তির তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীবনীশক্তি (বা Vital force) ও তাহার সহিত জড়শক্তির (Physical force এর) পার্থক্য স্বীকার করিতেন। জড়বাদী পণ্ডিতগণ সে পার্থক্য দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই,—জৈবশক্তি ব্যতীত জীবের জন্ম সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাই কোন কোন পাশ্চাত্য আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আবার সে উভয় শক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সহজে বিশ্লেষ হয় না। জড়শক্তিরও ধ্বংশ নাই। জৈবশক্তি যে জড়শক্তি বা রাসায়নিক সংযোগশক্তি হইতে সৃষ্টি হয় না—তাহাও বিজ্ঞান স্থির করিয়াছে। জীবন যে জড়ের বিশেষ ধর্ম্ম বা সংযোগফল নহে, তাহা বিজ্ঞান বুঝিয়াছে। তথাপি কথা উঠে যে, যখন জড়-আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, আর যখন জড়শরীরই জৈবশক্তি বিকাশের ভূমি, তখন অবশ্যই জড়শরীর ধ্বংশে জীবত্বের ধ্বংশ বা জড়পরিণতি হয়। একথা এক অর্থে সত্য। কিন্তু জড় দুইরূপ—স্থুল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম আকাশের (Ether এর) ক্রিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয়। ঐ যে ধাতব তারের মধ্যে দিয়া তড়িত শক্তি নিমেষ মধ্যে সহস্র যোজন পথ পরিচালিত হইতেছে—অথচ ঐ তারের কোন বাহ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না,—সে পরিচালন ক্রিয়ার মুল—সেই তারের অন্তর্গত আকাশ। সর্ব্বগত আকাশেই সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। জড়শরীর ধ্বংশে শরীরান্তর্গত সে সূক্ষ্মআকাশের বা সূক্ষ্ম জড়ের কোন ধ্বংশ হয় না। অতএব এই সূক্ষ্ম জড় আমাদের প্রাণাদি শক্তির আধার হইলে, মৃত্যুতে বা জড়শরীর নাশে তাহার নাশ হয় না,—এ কথায় আর আপত্তি থাকিতে পারে না।}

৬৬। বাস্তবিক, পারমার্থিক ভাবে কোথাও ধ্বংশ নাই। কোথাও ক্ষয় নাই। আমরা বলিয়াছি যে, জগতে এক মহা ত্যাগ-গ্রহণের লীলা, সৃষ্টি-ধ্বংশের লীলা, ব্যয়-সঞ্চয়ের লীলা নিয়ত চলিতেছে। যে মহাশক্তি বলে এই মহাক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, সেই কালশক্তি নিত্য—অক্ষয়। সে শক্তির কখন হ্রাসবৃদ্ধি নাই। জড় শক্তি বল, প্রাণশক্তি বল, মানসশক্তি বল, জ্ঞানশক্তি বল—কিছুরই ধ্বংশ নাই। আছে—কেবল রূপান্তর, কেবল কালে পরিবর্ত্তন। এই যে এ পৃথিবীতে আজ আমরা নানাজাতীয় জীব দেখিতেছি, শত বৎসর পরে বোধ হয় ইহার একটীও জীবিত থাকিবে না। এই যে এখন এ পৃথিবীতে দেড় শত কোটী মানুষ বাস করিতেছে—প্রায় শত বৎসর পরে ইহাদের একজনও থাকিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে? ইহাদের সমষ্টি জীবনীশক্তি বা সমষ্টি প্রাণশক্তি, সমষ্টি কর্ম্মশক্তি, সমষ্টি জ্ঞানশক্তি—কোথায় যাইবে? জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মে ইহার কিছুই ধ্বংশ হইবে না, কিছুই ক্ষয় হইবে না। ইহার কতক এ পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে—কতক এই অনন্ত জগতের অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। আর একরূপে কোথাও তাহার আবির্ভাব হইবে। আর যে শক্তি এখানে থাকিয়া যাইবে, ও যে শক্তি জগতের অন্য কোন স্থান হইতে

এখানে আসিবে, তাহা হইতে আর একদল জীব—আর একদল মানুষ সেই শতবর্ষ পরে এ পৃথিবী অধিকার করিবে। বলিয়াছি ত, জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে যেমন কিছুরই ধ্বংশ নাই, তেমনই জগতে কিছুরই নূতন সৃষ্টি হয় না। আমরা জগতে রূপান্তর কল্পনা বা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কিছুরই অত্যন্ত ধ্বংশ বা শূন্য হইতে আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারি না। আবার যেমন কিছুরই ধ্বংশ নাই, তেমনই বলিয়াছি ত, প্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। এজন্য উচ্চ জীবরূপী পরাপ্রকৃতি—জীবের প্রাণ মন বুদ্ধি শক্তি—কখন নিম্ন অপরা জড়প্রকৃতিতে বা জড়শক্তিতে পরিণত হয় না। জড় জীবত্বের বিকাশে সহায় হয়, জীবত্ব ধ্বংশ করিতে পারে না—প্রাণশক্তিকে নিম্ন জড়শক্তিতে পরিণত করিয়া লইতে পারে না। কেন না জড়শক্তি কখন জৈবশক্তিরূপে পরিণত হয় না। জড় ও জীব মধ্যে সে আদানপ্রদান ব্যবস্থিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে নির্ম্মলজ্ঞানে যাহা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণজ বিজ্ঞানবলেও আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। অতএব জগতে পারমার্থিক ভাবে সৃষ্টি লয় নাই, ইহা সত্য। এজন্য আমরা বলিতে পারি যে, শত বৎসর পরে যে সব নূতন মানুষ বা নূতন জীব—এ পৃথিবী অধিকার করিবে, তাহা নূতন সৃষ্টি নহে। তাহা পুরাতন। তাহাও অতীতের সমষ্টীকৃত জীবত্বের তৎকালীন বিশেষ বা ব্যষ্টি বিকাশ মাত্র। তাহাও ঐকস্থানের বা এককালের জৈবশক্তি, আর একস্থানে বা আর এককালে বিশেষ আবির্ভাব মাত্র। এইরূপে যে কোন সৌর বা নাক্ষত্র জগতের যে কোন পৃথিবী বা গ্রহ উপগ্রহ যখন কঠিন শীতল হইয়া জীবের বাসোপযোগী হয়, তখন কোন সুদূর সৌর মণ্ডল হইতে জৈবশক্তি আসিয়া সেখানে স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া জীবত্বের ক্রমবিকাশ করিতে থাকে। এই জৈবশক্তি নিত্য। তাহা ভগবানের পরাপ্রকৃতি। তাহার স্থান কাল বাধা সামান্য। জগতের সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেরই স্থান কাল বাধা বড় সামান্য। বলিয়াছি ত, জগতে সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেই আকাশাদি সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে গতাগতি করে। অই সৌরকর কোটী কোটী ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নিমেষ মধ্যে এ পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছে—পৃথিবীকে অন্য গ্রহগণকে তাপ তড়িত আলোক বিলাইতেছে, জগৎকে প্রকাশ করিয়া আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ আমাদের সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিও যখন এক জড়শরীর পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে বা সূক্ষ্ম জড়শরীরের সহায়ে অল্পকাল

মধ্যে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে—জগতের কোন এক প্রান্তে অতি অল্পকাল মধ্যে অনায়াসে গমনাগমন করে, কোথাও বা তাহার সঞ্চিত শক্তি অনুসারে অনুকূল অবস্থার সহায়ে অন্য স্থূল জড়শরীর গ্রহণ করে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে? (১)

এইরূপে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে সূক্ষ্মশক্তির গতাগতি হয়। মহাশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। প্রাণশক্তির কোন ধ্বংশ নাই,—জীবের কোন ধ্বংশ নাই—মৃত্যু নাই। মহাকাল স্রোতে রূপান্তর আছে, পরিবর্ত্তন আছে, বিকাশ-বিনাশ আছে, ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু আছে, সৃষ্টিলয় আছে, বৃদ্ধিক্ষয় আছে, ব্যক্তিজীবের ক্রমপরিণতি আছে—কিন্তু কিছুরই অত্যন্ত ধ্বংশ নাই। মূল যাহা,—তাহা নিত্য, তাহা এক, তাহা অবিনাশী, তাহা অক্ষয়। এ তত্ত্ব আমরা সুধু এ পৃথিবীর কথা ধরিয়া বুঝিতে পারি না। বিভিন্ন পৃথিবীর কথা, বিভিন্ন সৌর ও নাক্ষত্র জগতের কথা, জড়জগৎ শক্তিজগৎ জ্ঞানজগৎ—সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের কথা, সমস্ত লোকের কথা, বিভিন্ন ভুবনের কথা—সমুদায় একত্র ধারণা করিয়া এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তবে ইহার কতক বুঝা যাইতে পারে,—জগতের এই মহাত্যাগগ্রহণ নিয়ম, এই যোগবিয়োগ নিয়ম, সেই মহাশক্তির মহাবিকাশ নিয়ম,—কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে যোগবল, সে ধারণাশক্তি আমাদের নাই। আমরা সে মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। এ জগতের অন্তরালে ব্রহ্মের যে মহাশক্তির মহাক্রিয়া আমরা আভাষ পাই, সেই নিত্য অনন্ত অক্ষয় পরাশক্তির ধারণা করিতে আমরা অক্ষম। সেই অক্ষয় শক্তিভাণ্ডার হইতে যাহা জীবজড়ময়ী প্রকৃতিরূপে, বা অপরা ও পরা প্রকৃতিরূপে—এ জগতে বিবর্ত্তিত, এ জগতের বিকাশকল্পে যাহা নিয়ত কর্ম্মরূপে অথবা কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া জগতের বীজভূত অনাদি বাসনারূপে অভিব্যক্ত—সেই মহাশক্তিকে আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। সেই মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা শক্তিকে অভিভূত করিতে চাহি না।

---

(১) আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আমাদের সূক্ষ্মশরীরই আমাদের জীবাত্মার আধার। সেই সূক্ষ্মশরীর যোগেই জীবের পরলোকে গতি হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত জন্মান্তরের কথা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৬৭। সে যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না, জীবত্বের ধ্বংশ হয় না, জগতের সমষ্টিজীবরূপী পরাপ্রকৃতির বা অক্ষয় প্রাণশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। জগতের ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু ব্যাপারে, যোগবিয়োগ কর্ম্মে, ত্যাগগ্রহণ লীলায় সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না। তাহাতে প্রাণশক্তির বা জৈবশক্তির কোন হ্রাস হয় না। আমরা বলিয়াছি যে, পারমার্থিক ভাবে সমষ্টিজীবত্ব সত্য এবং ব্যক্তিজীবত্ব মিথ্যা হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে জগতে ব্যক্তিজীব নিত্য—ব্যক্তিজীব ক্রমবিকাশশীল। ব্যক্তিজীব ক্রমে কালবশে প্রকৃতির ক্রমআপূরণে ক্রমপরিণত হইয়া অণু হইতে মহৎ হয়, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হয়, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টি হয়, ক্রমে জীবত্বের পূর্ণ আদর্শে পরিণত হয়—শেষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিয়া তবে জীবত্ব হইতে মুক্ত হয়। এ জন্য যে কত কালের প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। এই পরিণতির জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। মৃত্যুরূপ অবস্থান্তর ব্যতীত জীবত্বের ক্রমবিকাশ হইতে পারে না—ব্যক্তিজীবের জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা তাহার প্রকৃতির ক্রমআপূরণ হইতে পারে না। মৃত্যু ব্যাপার ব্যতীত জগতের জীবপ্রবাহ—কালপ্রবাহ থাকিতে পারে না। মৃত্যু না থাকিলে এ পৃথিবীতে এতদিন মানুষের স্থানই হইত না। (১) মৃত্যু না থাকিলে, মানুষ তাহার অপেক্ষা উন্নত জীবত্বের বিকাশের অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন উচ্চতর ভুবনে বা লোকে জন্মিবার অবসর পাইত না। মৃত্যু না থাকিলে বুঝি মানুষের দুঃখের অবধি থাকিত না। অতএব মৃত্যুকে অমঙ্গল বলা যায় না। বরং মৃত্যুকে মঙ্গলময়ের মহা মঙ্গলময় বিধান বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা পরকাল বা জন্মান্তর মানেন, জীবত্বের জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশ মানেন, তাঁহারা কখন মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতে পারেন না। আর যাঁহারা মৃত্যুর পর জীবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মৃত্যুতে দুঃখের নিবৃত্তি বা অবসান বলিয়া—মৃত্যুকে মঙ্গলময় বলিতে বাধ্য হন।

(১) কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে পৃথিবীতে এক নরদম্পতি সৃষ্ট হইয়াছিল যদি ইহা মনে করা যায়, তাহা হইলে যে নিয়মে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়, সে নিয়মে যদি মানুষের বংশ বৃদ্ধি বরাবর হইত এবং মৃত্যু না থাকিত, তবে কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র পরে এত মানুষ জন্মিত যে, পৃথিবীকে সমতল ধরিয়া, মানুষকে তাহার উপর গায়ে গায়ে দাঁড় করাইয়া, এক জনের উপর আর এক জনকে সাজাইলে, সে মানুষস্তম্ভ সূর্য্যকে স্পর্শ করিত।

৬৮। কিন্তু মৃত্যুর এই স্বরূপ বুঝিলেও অমঙ্গলবাদের শেষ মীমাংসা হয় না। কেন না, মৃত্যুতে অত্যন্তধ্বংশ না হইলেও, জীবত্বের যে কিছু ধ্বংশ হয়, কতকটা ক্ষতি হয়—ও মৃত্যুতে যে জীব দুঃখ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আর মৃত্যুরূপ মহা ত্যাগগ্রহণ কর্ম্মে যে আমাদের সামান্য ক্ষতি হয়—তাহাও নহে। সে মহা হিসাবনিকাশের দিনে মানুষ সারা জীবনে এক এক করিয়া যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা এ জীবনেই ত্যাগ করিয়াছে, তাহা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। স্থুলশরীর ত্যাগ করিতে হয়; স্থূল জড় ও শক্তি হইতে অথবা অপর জীব হইতে সারা জীবন যাহা গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে—মানুষকে তাহা সমুদায় ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়; যে ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে হয়। স্থূল শরীর সহায়ে স্থূলশরীরের ইন্দ্রিয় স্নায়ু মস্তিষ্ক প্রভৃতির সাহায্যে—বাহ্য বিষয় সংস্পর্শে যে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা মানুষের জ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়াছিল,—ও সেই জ্ঞানক্রিয়া ফলে যে 'অহং ও ইদং' জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল—যে স্মৃতি প্রত্যেক ব্যষ্টি জ্ঞানক্রিয়াকে সম্বদ্ধ করিয়া 'অহং'ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছিল,—মৃত্যুতে সে জ্ঞানক্রিয়া বন্ধ হয়, সে 'আমি'ধারা সংস্কার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—সে স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়। কেবল মুল জ্ঞানশক্তিও কর্ম্মশক্তি—সূক্ষ্ম শরীরে এ জন্মের ও পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার দ্বারা আবৃত হইয়া বীজরূপে থাকিয়া যায়। এইরূপে মৃত্যুতে এ 'আমি'সূত্র ধ্বংশ হয় বটে, এ 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকে না বটে—এ ব্যবহারিক জ্ঞান লোপ হয় বটে, কিন্তু আমাদের ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্ব ধ্বংশ হয় না। মানুষ সারা জীবন কর্ম্ম করিয়া যে বাহ্য বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিয়াছিল, মৃত্যুকালে তাহা সবই মানুষকে ত্যাগ করিতে হয় বটে,—কিন্তু সেই কর্ম্ম করিতে গিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া ফলে যে সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছিল, সে কর্ম্মফল ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কাররূপ কর্ম্মফল—সকলই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। মৃত্যুর পরে অনুকুল অবস্থার সহায়ে সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইয়া পর জন্ম লাভ হয়—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত্যু ও পর জন্মের মধ্যে যে অবস্থা,—তাহা আমাদের নিদ্রার বা স্বপ্নাবস্থার অনেক অনুরূপ। তবে জাগরিত হইয়া যেমন আমরা পূর্ব্বের স্মৃতি লাভ করি, পূর্ব্বের ব্যবহারিক জ্ঞান পূর্ব্বের আমিধারা—নিদ্রার পূর্ব্বে আমার যাহা কিছু ছিল—সবই ফিরাইয়া পাই, পর জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্ব জন্মের সব আর তেমন

ফিরাইয়া পাই না। পর জন্মে আমাদের প্রদ্যোতিত বা বিকাশোন্মুখ সংস্কারের উপযোগী স্থূলশরীর গ্রহণ করিবার পর, সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইলে, জ্ঞান আবার সংস্কারাবস্থা হইতে সক্রিয় অবস্থায় আসিয়া আর এক নূতন 'আমির' আবিষ্কার করে। তখনকার সে 'আমি' অতীতের যে কোন্ আমি তাহা মনে থাকে না। এইরূপে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন জাতীয় স্থূলশরীরের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিজীব পূর্ণ এক কাল্পনিক আদর্শ জীবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই মানুষের জন্মান্তরে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে না। তবে যেমন উন্মাদের অসম্পূর্ণ এক 'আমি'-জ্ঞানের সূত্র ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন 'আমির' জ্ঞান বিভিন্ন সময়ে উদয় হইলেও, সে রোগের অবসানে—সেই আমিধারা ফিরাইয়া পায়, যেমন পীড়াবিশেষে কোন কোন লোকের পূর্ব্ব স্মৃতি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াও—কোন বিশেষ উত্তেজনা বলে নির্ব্বাণ দীপ প্রজ্বলনের ন্যায় সে স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় আমাতে বিভিন্ন 'আমির' আরোপ হইলেও—কখন রাজা আমি, কখন দরিদ্র আমি, কখন পিশাচ 'আমি', কখন দেব 'আমি'র আরোপ বা অধ্যাস হইলেও, জাগরিত হইলেই সেই পূর্ব্বের 'আমি'ধারা ফিরিয়া আসে, তেমনই বিশেষ সাধনা বলে জ্ঞানশক্তির বিশেষ বিকাশে সেই সব পূর্ব্বজন্মের 'আমির' সূত্র মানুষ আবার ফিরাইয়া পাইতে পারে। যাহা হউক, সাধারণতঃ এ জন্মে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের 'আমি' সূত্রের সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাকে আমরা মঙ্গলময় বিধান বলিতে বাধ্য হই। আমাদের এ জন্মের অনেক অবস্থাই কখন কখন এত দুঃখকর লজ্জাকর বা দারুণ ক্লেশকর থাকে যে, আমরা তাহার স্মৃতি উৎপাটন করিতে পারিলে, অত্যন্ত সুখী হইতাম মনে করি। সেইরূপ অতীতকালে আমাদের হয়ত এমন অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, যে তাহার স্মৃতি থাকিলে বড় যন্ত্রণা হইত—তাহার ভরে হয়ত আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যাইতাম, আর অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এই জন্য মৃত্যুতে ব্যক্তিজীবের আমিধারা ছিন্ন হইয়া যায়, সে প্রতিজন্মে নূতন করিয়া জীবনখেলা খেলিতে পায়, ইহাতে বড় শুভকর বিধান বলিতে হইবে।

৬৯। সে যাহা হউক, মৃত্যুতে স্থূলশরীর ব্যবহারিক জ্ঞান 'আমি' 'আমার' ভাব—আমার ভালবাসার সব ত্যাগ করিতে হয়। এ জন্য মৃত্যু বড় দুঃখজনক। মৃত্যুভয় মানুষের স্বাভাবিক—জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রধান ভয়। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ

না হইলে,—মৃত্যুতে যে লাভ হয়, যে জীবের ক্রমবিকাশের সুবিধা হয়, তাহা না বুঝিলে,—আত্মার ও মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে, সে—মহাভয় বা দুঃখ দূর হয় না। তাই মৃত্যু এত ভয়াবহ—এত দুঃখজনক। আর শুধু মৃত্যু বলিয়া নহে,—আমরা দেখিতে পাই যে জীব নানা কারণে দুঃখ পায়। বিশেষতঃ আত্মরক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে গিয়া, অথবা কর্ম্মে অবহেলা করিয়া জীব বড় দুঃখ পায়। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, এ জগতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তখন প্রশ্ন উঠে,—কেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? তখন প্রশ্ন উঠে যে, জগতের যদি কেহ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা থাকেন, তবে তিনি কি সে অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত শক্তিবলে জগৎকে কেবল সুখময় করিতে পারিতেন না? তাই জগতে এই অনন্ত দুঃখ ক্লেশের লীলা দেখিয়া আমরা অনেক সময় এমন অভিভূত হই যে, সে নিয়ন্তাকে স্বীকার করিতে পারি না, অথবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বে বা সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে পারি না,—তাঁহার মহাপ্রকৃতিকে মাতৃরূপিণী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদের সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে সেই লীলাময়ী প্রকৃতির আশ্চর্য্য লীলা-রহস্য আমরা ধারণা করিতে পারি না। তিনি জীব মধ্যে পরার্থবৃত্তির বিকাশ করেন—পরের জন্য সর্ব্বজীবকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, সর্ব্বজীবে মাতৃত্বের বিকাশ করেন, এ কথা স্বীকার করিলেও, মানুষ সে পরার্থ কর্ম্মে ও স্বার্থ কর্ম্মে যে বাধা পায়, যে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা পায়, জীব যে অন্য জীব ও জড়প্রকৃতির অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং প্রকৃতিকে একদিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিয়া স্বীকার করিলেও, আর একদিকে প্রকৃতিকে নির্ম্মমতাময়ী বলিতে আমরা বাধ্য হই। এই মমতা নির্ম্মমতার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য হয় কি না, ইহার উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া প্রকৃতির মহাতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি কি না, তাহা দেখিতে হইবে। এবং তাহা হইতে জন্মমৃত্যু যোগবিয়োগ সুখ-দুঃখ মঙ্গলঅমঙ্গল প্রভৃতি দ্বৈত বা দ্বন্দ্ববোধের সামঞ্জস্য করিয়া, সেই দ্বৈততত্ত্বের মধ্যে দিয়া জীবের ও জগতের ক্রমোন্নতির মহাতত্ত্ব মানব ও মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের মহাতত্ত্ব ধারণা করিয়া, সেই দ্বৈতজ্ঞানের উপরের ভূমিতে আরোহণ করিবার সন্ধান বুঝিতে হইবে। সেইজন্য জীবদুঃখের ক্রমবিকাশতত্ত্ব এবং সুখ দুঃখবোধের ক্রমবিকাশ দ্বারা মানুষের ক্রমপরিণতি তত্ত্ব আমাদের প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে।

৭০। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, আমরা যে জগতে দুঃখের কথা বলিয়া থাকি—প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা বলিয়া থাকি, সে দুঃখ সে নির্ম্মমতা এক অর্থে অতি সামান্য। জড়জগতের বিকাশকল্পে এ নির্ম্মমতার কথা আসে না। জড়জগতে চেতনা অব্যক্ত—জড়জগতের সুখদুঃখানুভূতি নাই। যখন প্রকৃতি জড়শক্তি (Physical force) রূপে জড়জগৎকে অব্যক্ত তমোরূপ হইতে (Zero potential হইতে বা nebulous dissipated matter রূপ হইতে) আকাশাদিক্রমে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে পরিণত করিয়া, ক্রমে সৌর ও নাক্ষত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীবজগতের বিকাশের জন্য প্রস্তুত করেন; জড়জগৎ যখন প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া এই পরার্থ কর্ম্মে রত হয়; জড়জগৎ যখন ক্রমবিকাশিত হইয়া জীবের আবাসোপযোগী হয়; যখন জড়শক্তি আপনাকে অভিভূত করিয়া প্রাণশক্তির আধাররূপে—জীবের শরীর-রূপে—অথবা জীবের শরীর রক্ষা ও পোষণোপযোগী শক্তিরূপে ও অন্নরূপে পরিণত হয়; যখন জড় ও জড়শক্তি মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশকল্পে মানবের উচ্চতর জ্ঞানশক্তি চালিত হইয়া তাহার বিকাশের সহায় হইতে বাধ্য হয়—তখন সেখানে জড়ের নিজের সুখদুঃখের কথা আসে না—প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা আসে না। আর যখন নিম্নতর জীবানু উচ্চতর জীবশরীর সংগঠনের উপকরণ হইয়া, আপনাকে অভিভূত করিয়া, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া, সেই উচ্চতর জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, তখনও প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা বড় থাকে না। কেন না নিম্ন শ্রেণীর জীবানুর চৈতন্যবিকাশ বড় সামান্য। তাহার নিজের সুখ দুঃখানুভূতি শক্তি যদি থাকে, তবে তাহা নিতান্ত অল্প। যখন উদ্ভিদ পরার্থ আত্মত্যাগ করে, তখনও এ নির্ম্মমতার কথা আসে না, কেন না উদ্ভিদেরও সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বিকাশিত নহে।

৭১। কিন্তু যখন আমরা প্রাণীজগতের কথা চিন্তা করি,—যে সকল জীবের চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি বিকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যখন বাহ্য জড়প্রকৃতির অত্যাচারে দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে দেখি, যখন এক প্রাণীকে আর এক প্রাণীর খাদ্য রূপে বাধ্য হইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে দেখি, তখন সেই জীবহিংসা ব্যাপারে প্রকৃতিকে মমতাবিহীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও কথা আছে। সে কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের সুখ-দুঃখানুভূতি ব্যাপার বুঝিতে হয়। আমাদের অধিকাংশ দুঃখ আধ্যাত্মিক।

অতীতের স্মৃতি আমাদিগকে অনেক সময় বড় দুঃখ দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা অনেক সময় আমাদিগকে দুঃখে অভিভূত করে। ইতর প্রাণীদের এই অতীতের স্মৃতি বড় ক্ষীণ। তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ইতর প্রাণীর বিশেষ বিচারশক্তি নাই,—তাহাদের 'জাতি'জ্ঞান অথবা সামান্য সত্যের ধারণা তত নাই। কাজেই তাহারা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কথা স্থির করিতে পারে না। এজন্য ইতর জীবকে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভাবনা বড় দুঃখ দিতে পারে না,—তাহাদের কল্পনা তাহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। যূপ কাষ্ঠে বলির জন্য আবদ্ধ পশু, তাহার অতি নিকটে অপর পশুর বধব্যাপার দেখিয়াও নিজের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া প্রায়ই বিচলিত হয় না। তখনও সে অসঙ্কোচে ঘাতকের হস্তস্থিত ঘাস খাইয়া সুখ বোধ করে। তবে যদি সে চারিদিকে বিভীষিকাজনক বীভৎস কাণ্ড দেখিতে পায়, তখন বড় ভীত হইয়া পড়ে।

সুতরাং ইতর জীবের সুখদুঃখ সাধারণতঃ বর্ত্তমানব্যাপী। কেবল বর্ত্তমানের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে। 'মাত্রা স্পর্শ'—অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে, এবং জ্ঞান বা সংজ্ঞাবাহী নাড়ীর (Sensory nerves) দ্বারা আমাদের মনোবৃত্তিতে সেই সম্পর্কের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আমাদের এই সুখদুঃখবেদনা অনুভূত হয়। যদি সেই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভূতিশক্তির হ্রাস হয়, তবে বাহ্য সংস্পর্শজ ক্লেশ অনুভবের শক্তিও আমাদের হ্রাস হয়। যখন (Chloroform প্রভৃতি) রাসায়নিক দ্রব্যের সহায়ে, আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়, তখন আমরা বাহ্য ক্লেশ অনুভব করিতে পারি না। যখন পীড়া বিশেষে (মূর্চ্ছা hysteria প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ অবস্থায়) আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়, যখন আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হয়, যখন যোগবলে—বা সাধনাবিশেষবলে আমরা আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ীকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারি, তখন সুখদুঃখবেদনা আমাদিগকে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। যখন মন বিষয় বিশেষে তন্ময় হয়, তখন অন্য বিষয় সম্পর্কজ সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। যখন সর্ব্বদেহব্যাপী চৈতন্যকে বাহ্যদেহ হইতে সরাইয়া লইয়া মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে বা এইরূপ কোন বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্রে সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, তখন আমাদের বাহ্যবিষয়

সম্পর্ক জনিত সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। অতএব এই মাত্রাস্পর্শজ সুখদুঃখ আমাদের আগন্তুক ধর্ম্ম।

সুতরাং অবস্থাবিশেষে এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভব শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সকল প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভবশক্তি সমান নহে। অনেক প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ী আদৌ নাই। অনেক প্রাণীর জ্ঞান-বাহী নাড়ী অসাড়। জড় পদর্থের ন্যায় এই সকল প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী বাহ্য আঘাতে আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইলেও, বা বাহ্য দ্রব্যগুণে অভিভূত হইলেও—তাহাদের সেই ক্রিয়ার অনুভব শক্তি নাই। তাহারা যে সেই বাহ্য ক্রিয়ায় 'সাড়া' দেয় তাহা বাহ্যিক,—তাহা আন্তরিক বা জ্ঞানকৃত নহে,—তাহা আন্তরিক সুখদুঃখ জ্ঞাপক নহে। এজন্য তাহারা বাহ্যবিষয় সংস্পর্শে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে না। এই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে যত উচ্চজাতীয় প্রাণীতে যাওয়া যায়, ততই এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অসাড়তা কমিতে থাকে, ততই এই সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বাড়িতে থাকে। কিন্তু মানুষের ন্যায় কোন ইতর জীবে এতদূর সুখদুঃখানুভব শক্তি বিকাশিত হয় না। আমরা, সাধারণতঃ আমাদের সহিত তুলনা করিয়া, 'উপমান' প্রমাণ বলে, অন্য জীবও আমাদের ন্যায় সমানরূপ সুখদুঃখ অনুভব করে, এইরূপ মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। (১)

(১) নিম্ন জাতীয় জীবের অনুভূতিশক্তি না থাকায় বা ইতর জীবের অনুভূতিশক্তি আমাদের অপেক্ষা অল্প থাকায়, তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি, আমরা বাহ্যবিষয় সম্পর্কে যেরূপ সুখদুঃখানুভব করি তাহারাও ঠিক্ সেইরূপ সুখ দুঃখানুভব করে, আমাদের এই ধারণা—ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণার ক্রমবিকাশে আমরা ক্রমে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি। ইহা প্রকৃতিজননীর অদ্ভুত কৌশল—আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের অদ্ভুত উপায়। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

আমার ন্যায় অন্য মানুষ বা অন্য জীব যে সুখদুঃখ বেদনা অনুভব করে, আমরা যে এইরূপ আরোপ বা অধ্যাস করি, তাহাকে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত Eject আখ্যা দিয়াছেন। যথা,—

"But the inferred existence of your feelings, of the objective groupings among them similar to those among my feelings, are of a subjective order in many respects analogous to my own,—these inferred existences are the very acts of inference

৭২। অতএব আমরা বুঝিতে পরি যে, নিম্ন জাতীয় জীবের সুখদুঃখানুভূতি নিতান্ত সামান্য। প্রকৃতির ক্রমআপূরণে যতই জীবত্বের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, যতই জীব নিম্ন জাতি হইতে উচ্চতর জাতিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। মানুষেই সুখদুঃখানুভূতি শক্তির পূর্ণবিকাশ হয়। এই জন্য—অর্থাৎ জড়ে সুখদুঃখানুভূতি নাই বলিয়া, ও ইতর-জীবের সুখদুঃখানুভব শক্তি মানুষের তুলনায় সামান্য বলিয়া, জড় ও ইতরজীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া (১), আমরা মানুষের সুখদুঃখের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষে চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়। জীবের যখন জ্ঞান বা চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি থাকে না, বলিয়াছি ত, তখন স্বয়ং প্রকৃতি

---

thrown out of my consciousness, recognisedas outside of it, as *not* being part of me. I propose accordingly to call these inferred existences *ejects*, things *thrown out* of my censciousness, to distinguish them from *object*, things presented in my consciousness, phenomena."

W. K. Clifford's—Lectures and Essays.—P. 275.

(১) আমরা ইতর জীবের একরূপ দুঃখের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। জীব জীবের খাদ্য, আমরা এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা এ পক্ষে বলিতে পারি যে, এই জীব মধ্যে উদ্ভিদ অপর জীবের খাদ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখানুভব হয় না। নিম্ন জাতীয় জীব অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতীয় জীবের খাদ্যরূপে শরীর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখবোধ বড় অধিক হয় না। যাহা হউক, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির সংখ্যা উদ্ভিদ বা নিরামিষভোজী জীবজাতির সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। আর পৃথিবীতে জীবজাতির ক্রমোন্নতিতে সেই সকল প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির এবং সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। মানুষ যে স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী শষ্যজীবী—তাহা আধুনিক অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্বীকার করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ—উদ্ভিদ বা শষ্য ভোজী। সাধারণতঃ রাজসিক তামসিক প্রকৃতির লোক বা রাক্ষস ও পিশাচ প্রকৃতির লোক মাংসভোজী। বিজ্ঞানের ও সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে সাত্বিকতা বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমোন্নতিতে মানুষ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া থাকে। অতএব জীব জীবের খাদ্য হইলেও প্রকৃতির ক্রমআপূরণে যে সকল জীবের মৃত্যুতে দুঃখ হয়, মৃত্যুতে জীবত্ব বিকাশে ক্ষতি বা বাধা হয়, তাহাদের খাদ্যরূপে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

তাহার বিকাশের জন্য তাহাকে পরিচালিত করেন,—কর্ম্মে নিরত করেন। পরে মানুষে যখন সেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, তখনও প্রকৃতি সেই জ্ঞানশক্তির সহায়ে মানুষকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষে এই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ সত্ত্বেও,—তাহার বিকাশের উপযোগী,—তাহার শরীরগঠন ও রক্ষার উপযোগী অধিকাংশ কর্ম্ম প্রকৃতি নিজে প্রাণশক্তিরূপে—মানুষের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। প্রাণশক্তির সমুদায় কর্ম্ম আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই শরীরসংগঠন ও রক্ষার জন্য—প্রাণশক্তির প্রাণকর্ম্ম সম্পাদন জন্য নানা উপকরণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে বায়ু প্রভৃতি কতক বিষয় প্রকৃতি আমাদের বিনা চেষ্টায় বাহ্যজগৎ হইতে আপনিই সংগ্রহ করিয়া লন। কতক আমাদের দ্বারা ও অপরের দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া লন। আমাদের শৈশব অবস্থায়—যখন আমাদের জ্ঞান বা কর্ম্মশক্তি বিকাশিত হয় না, তখন প্রকৃতি আমাদের জন্য অন্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া, আমাদের বিকাশের উপযোগী সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লন। ক্রমে যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপে বা সহজজ্ঞানরূপে আমাদের অন্তরে অধিষ্টিত থাকিয়া আমাদিগকে শরীর রক্ষাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। প্রকৃতি এইরূপে আমাদের জ্ঞানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, আমাদের অহঙ্কারকে বা কর্তৃত্বঅভিমানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, কতক কর্ম্মভার আমাদের হস্তে অর্পণ করেন—সুখদুঃখানুভূতিরূপ পথদর্শকের সহায়ে জ্ঞানকে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে ইঙ্গিত করেন। জ্ঞান তখন এইরূপে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে রত হয়—প্রকৃতির দাসরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম্ম করে।

আর সকল স্থলেই যে জ্ঞান প্রথমে বিকাশিত হইয়া এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহা নহে। শরীর রক্ষার্থ ও পোষণার্থ প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি অনেক কর্ম্ম যেমন প্রকৃতি সকল অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ইচ্ছা বা কর্ম্মবৃত্তির সাহায্য না লইয়া সম্পাদন করেন বলিয়াছি, তেমনই অনেক স্থলে আরও কতক কর্ম্ম প্রকৃতি আমাদর অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যেমন আমাদের কতক কাজ জ্ঞানকৃত (voluntary) তেমনই আরও কতক কাজ অজ্ঞানকৃত (involuntary, reflex বা spontaneous)। বাহ্যবিষয়

অনুভূতিকালে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ের যে সম্পর্ক হয় বলিয়াছি, তাহার ক্রিয়া জ্ঞাননাড়ী দিয়া মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তদধিষ্ঠিত চৈতন্য বা বুদ্ধি, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য স্থির করে, ও তদনুসারে কর্ম্ম করে। এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিতে করিতে যে অভ্যাস বা সংস্কার হইয়া যায়, তাহাতে পারে সেই কর্ত্তব্য স্থির জন্য যে জ্ঞানক্রিয়া, তাহা অতি সহজে ও সহসা সম্পাদিত হয় বলিয়া, সে জ্ঞানক্রিয়ার আয়াস আমরা বুঝিতে পারি না। তাই সে অভ্যাস বা সংস্কারজ কর্ম্ম অনেক সময় আমাদের জ্ঞানজ নহে বলিয়া বোধ হয়। একটা 'ক' লিখিতে কত আয়াসের প্রয়োজন, তাহা বালক যখন 'ক' লিখিতে শিখে তখন বুঝিতে পারে। ক্রমে লেখা আমাদের এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আমরা গল্প করিতে করিতে, সে গল্পে মনোনিবেশ করিয়া ও পত্র লেখায় মন না দিয়া, আমরা অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারি। সেই অভ্যস্ত সংস্কারজ সহজ কর্ম্মে তখন বিশেষ জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত কতকগুলি কর্ম্ম আছে—তাহা আদৌ এরূপ জ্ঞানজ নহে। সেই সকল কর্ম্মকালে বাহ্যবিষয় সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞাননাড়ীতে কোন ক্রিয়া হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নাড়ীতে (motor nerves) স্বতঃ উৎপন্ন করে। তাহতে যে কার্য্য আরম্ভ হয়, সে কার্য্যে আমাদের জ্ঞানের হাত থাকে না। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, প্রকৃতি আপনিই সতর্ক হইয়া সে বিপদ হইতে শরীরকে উদ্ধারের উপায় করেন। কেন না তখন জ্ঞানকে সংবাদ দিয়া তাহার সময়সাপেক্ষ বিবেচনাদি ব্যাপার দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, সে বিপদ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য, কর্ম্ম করিতে অবসর থাকে না। আমাদের চক্ষুর নিকট সহসা কেহ আঘাতের চেষ্টা করিলে পলক আপনিই পড়িয়া যায়। পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ কোন শব্দ হইলে মানুষ আপনিই তখনই লাফাইয়া সরিয়া যায়। তখন আমরা বিচার করিয়া কর্ম্ম করি না। এই সকল কর্ম্ম আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছাদির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি প্রাণকর্ম্মের ন্যায় আপনিই সম্পাদন করেন। সে অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের কথা এ স্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৭৩। প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীর রক্ষা

ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্ম্মে ও প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়মিত করেন। আমাদের এই শরীর গঠন ও রক্ষা কর্ম্মে প্রকৃতি কিরূপে আমাদের নিয়োজিত করেন, কিরূপে আমাদের জ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তাহা পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া হইয়াছে। সে কথা এস্থলে আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের অভাববোধ ও অভাব জন্য দুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জন্য যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাববোধ বা দুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। শৈশব অবস্থায় যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি বিকাশিত হয় না, বলিয়াছি ত, তখন আমরা নিজে এই অভাব দূর করিতে পারি না। তখন এই অভাববোধ জ্ঞাপন জন্য ক্রন্দন করি, এবং প্রকৃতির প্রেরণায় বা মমতার বশে পিতামাতা বা অন্যে আমাদের সেই অভাব বুঝিয়া তাহা দূর করিতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন,—তখন মা আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া আমাদের স্তন্য দান করেন—বা অন্য আহার দান করেন। তাহার পর আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হইলে আমরা স্বয়ং সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে নিরত হই। সুধু তাহাই নহে। সে অভাব জানিতে পারিলে,—প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্য কি উপকরণ চাহিতেছেন জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণ মধ্যে আমাদের কোন গুলি গ্রহণীয় বা কোন গুলি ত্যজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখ-দুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের জানাইয়া দেন। তাহা রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার জন্য অবকাশ দেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখানুভূতি শক্তি দ্বারা, কোন্ বায়ু দূষিত বা ত্যজ্য—কোন্ বায়ু স্বাস্থ্যকর ও গ্রহণীয়, কোন পুণ্যগন্ধ উপাদেয় ও শুভকর—তাহা প্রকৃতি আমাদের বুঝাইয়া দেন। আবার যখন রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়ে আমরা আহার বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন যতদূর পর্য্যন্ত শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আহারে আমরা সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়,—ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তিজনিত দুঃখসুখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে, আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য—আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালনার প্রয়োজন হয়, সমস্ত শরীর মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রকৃতিবশে বালকগণ ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখ বোধ করে। এজন্য যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ করে। এজন্য নীরোগ ও কর্ম্মক্ষম শরীরে কর্ম্মের উত্তেজনায় আমরা এত স্ফূর্ত্তি পাই। আবার যখন কর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসন্ন হয়, যখন শরীরের বা কর্ম্মবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রান্তি হেতু দুঃখ বা অবসাদ জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন,—বা নিদ্রারূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় আমাদের সুখ হয়। এইরূপে প্রকৃতি—আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা কর্ম্মে প্রাণশক্তিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কর্ম্মের জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন—তাহা আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাদি নানারূপ অভাব বা দুঃখানুভূতির দ্বারা জ্ঞাপন করান,—এবং প্রকৃতির প্রয়োজনে আমরা সেই কর্ম্মে রত হইলে, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ আমাদের সুখ দান করেন। যদি আমরা প্রকৃতির সে ইঙ্গিত না [illegible], বা না বুঝিতে পারি,—যদি আমরা অন্ন বা অনুপযুক্ত আহার করিতে পাই, অথবা অযথা ভোজনসুখলালসায় অখাদ্য খাই বা অতিরিক্ত ভোজন করি—বা অল্প কি অতিরিক্ত নিদ্রা যাই,—যদি আমাদের আ[illegible] নিদ্রা প্রভৃতি অবিহিত হয়, আলস্য বা অন্য কারণে শরীরের উপযুক্ত [illegible]চালনার অভাবে বা কোন কারণে শরীরের ক্ষয় হয়, তবে পীড়ারূপ দুঃখ দিয়া প্রকৃতি আমাদের প্রকৃত কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন। আবার পীড়া হইলেও, প্রকৃতি স্বয়ং অধিকতর যত্নের সহিত তাহার উপশম জন্য চেষ্টা করেন—ও সেই জন্য আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, ইতর জীব আহার বিহার সম্বন্ধে প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয় বলিয়া, তাহাদের পীড়া অল্প। আর প্রকৃতি স্বয়ং সে পীড়া উপশম জন্য ইতর জীবকে পরিচালিত করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ইতর জীবের চিকিৎসার জন্য অন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ জ্ঞানের অভিমানে চালিত হইয়া তাহার সহজজ্ঞান উপেক্ষা করে। ক্রমে মানুষ সহজজ্ঞানের সেইঙ্গিত একেবারে ভুলিয়া গিয়া, নিজের অপরিণত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সে জন্য তাহার ব্যাধি অসংখ্য—আর সে

ব্যাধি দূর করিবার প্রকৃতিনির্দ্দিষ্টপথ সে আর দেখিতে পায় না। তাই বাধ্য হইয়া কৃত্রিম পথ অবলম্বন করিয়া বৃথা দুঃখ পায়। (১)

৭৪। অতএব শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখদুঃখ-জ্ঞানের প্রয়োজন,—ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দুঃখ বা অভাব বোধের প্রয়োজন,—বাহ্য ও আন্তর দুঃখবোধের প্রয়োজন,—বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু সেই সম্পর্ক জনিত সুখদুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন, (২)—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন। সে সুখদুঃখজ্ঞান না থাকিলে আমাদের সংসৃষ্ট কোন্ বাহ্য

---

(১) পীড়ার সময় আমাদের কি কর্ত্তব্য, এবং পীড়া আরোগ্যের জন্য প্রকৃতি আমাদের নিকট কি চাহেন, তাহা প্রকৃতিই আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। পীড়া উপশমের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে প্রকৃতি আমাদের কর্ম্মশক্তি হরণ করেন, অনাহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষুধা হরণ করেন, পানীয়ের প্রয়োজন না থাকিলে তৃষ্ণা হরণ করেন। কখন দুষ্ট ক্ষুধা তৃষ্ণার ভান হইলে, পরে অরুচি শ্লেষ্মাবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। পীড়ার সময় যে খাদ্যের প্রয়োজন, প্রকৃতি সে খাদ্যের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত লোভ উৎপাদন করিয়া তাহার ইঙ্গিত করেন, যে রসের প্রয়োজন—সে রসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। শরীরের যে অংশ পীড়িত হয়—প্রকৃতি জোর করিয়া সেই অংশে আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত [illegible]া, সেই পীড়ার যাতনা বিশেষরূপে আমাদের অনুভব করাইয়া, সে পীড়া নিবারণের জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টাকে, সমুদায় শক্তিকে নিয়োজিত করেন। পীড়ার সময় এই ভীষণ আন্তর অনুভূতিবলে আমাদের তৎকালীন অভাব আমরা বুঝিতে পারি—ও সে অভাব দূর করিতে বিশেষ ব্যাগ্র হই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে, Disease is the outward expression of nature's own attempt to drive out poison from the body। তাই Nature—cure এবং Treatment of diseases without medicine এর কথা উঠিয়াছে। তাই ঔষধিকে এখন পীড়া উপশম কর্ম্মে প্রকৃতির সহায় মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যাউক, সে সকল অবান্তর বিষয় এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(২) শরীর (জড়শরীর) আমাদের জ্ঞানের প্রথম বাহ্যবিষয়। এই শরীরের সহিত আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সম্পর্ক হেতু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি আন্তরিক সুখদুঃখানুভূতি হয়। বাহ্যজগৎ আমাদের দ্বিতীয় বাহ্যবিষয়—দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। এই বাহ্যজগতের সহিত আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু মাত্রাস্পর্শজ সুখদুঃখানুভূতি জন্মে।

বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। অগ্নির সংস্পর্শে তাপ-রূপ-দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। সেই জন্য আমাদের সংস্পৃষ্ট বাহ্য-বিষয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেবল সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। এই জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য—শরীর রক্ষণ ও পোষণের জন্য কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন। এই জন্য সুখদুঃখবোধের প্রয়োজন। এই জন্য সুখদুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সহিত শরীর ও তৎসংস্পৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্ক জনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, প্রয়োজন ব্যতীত—কারণ ব্যতীত কিছুরই সৃষ্টি হয় না। [illegible]লিয়াছি ত, যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বিকাশের সময় বা প্রয়োজন না উপস্থিত হয়, [illegible] তাহার সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। ততক্ষণ তাহার পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে, তাহার অভাব-পূরণ-কার্য্য বা ক্রম-আপূরণ কার্য্য প্রকৃতি স্বয়ং তাহার অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন,—প্রকৃতি তখন 'অন্ধ' জড়শক্তি (physical force) বা চেতনাবিহীন প্রাণশক্তি (stimulus) রূপে সেই জীবের রক্ষণ, পোষণ ও ক্রম-আপূরণ জন্য, সমুদায় কর্ম্ম করেন,—জড়জগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে, এমনকি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিজগতে সমুদায় কর্ম্ম প্রকৃতি স্বয়ং সম্পাদন করেন। পরে যখন উচ্চশ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি রূপে জীবহৃদয়ে বিকাশিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখ-দুঃখানুভূতি[illegible] হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্ম্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্ম্মে অনিচ্ছা জন্মে,—সুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই সুখজ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, ও এই রাগ দ্বেষ হইতে কাম ক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হইয়া জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইতর জীবের 'সহজ' জ্ঞান সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ, তাহার ক্রমবিকাশ নাই, যদি থাকে তবে তাহা নিতান্ত সামান্য। ইতর জীব প্রাণকর্ম্মে বা শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মে এবং বংশ বৃদ্ধি ও রক্ষা কর্ম্মে, এই প্রথম বিকাশিত সুখদুঃখজ্ঞানবলে, রাগ-দ্বেষ-বশে ও কাম-ক্রোধাদি-প্রবৃত্তিবলে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে।

৭৫। এইরূপে ইতরজীব নিজ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মে ও বংশ রক্ষা কর্ম্মে সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সুখদুঃখানুভূতি মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। এই দুঃখ নিবারণ জন্য মানব ও ইতরজীব প্রথমে কর্ম্ম করে। এই সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ বড় তীব্র, এবং এজন্য সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও বড় অধিক, এবং সেই দুঃখ দূর করিলে যে সুখলাভ হয়, তাহার তীব্রতাও সেইরূপ অধিক। যাহারা অন্নসংস্থান জন্য কষ্ট ভোগ করে না, তাহারা ক্ষুধারূপ দুঃখের তীব্রতা বুঝিতে পারে না। ঐ কুকুর ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, পাগলের মত কিরূপ ধাবিত হয়, সামান্য এক টুকরা মাংস পাইলে সেই ক্ষুধাতুর কুকুর কিরূপ সুখলাভ করে, কিরূপ আরামের সহিত অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে এক টুকরা হাড় চিবাইতে থাকে—দুর্ভিক্ষ সময়ে বা দারিদ্র্যের উৎকট পীড়নে, ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত পীড়িত [illegible]লে—সে ক্ষুধার জ্বালা ও সে জ্বালা নিবারণ জনিত উৎকট সুখ আমরা বুঝিতে পারি না। অবশ্য ইতর জীবের সুখদুঃখ প্রায়শঃ শারীরিক। এবং তাহাদের সেই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতাও বড় অধিক।

মানুষেরও সে সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কম নহে। মানুষ যখন 'অসভ্য' থাকে, তাহার জ্ঞান যখন স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থায় আসিতে পারে না, যখন মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, যখন মানুষ আমমাংসভোজী—এমন কি নরমাংসভোজী রাক্ষস ব্যতীত আর কিছুই নহে, যখন মানুষ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মের জন্য বাহ্যজগতের সহিত—জড় ও জীবের সহিত—এক মানুষ আর এক মানুষের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতে বাধ্য [illegible]ন মানুষের এই শারীরিক সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা বড় অধিক। কিন্তু বা[illegible]ত, মানুষে পশুতে প্রভেদ আছে। মানুষের জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। পশুর সেরূপ নহে। এজন্য মানুষ ক্রমে এই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কমাইয়া লইতে পারে। মানুষ

সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়ে—সেই সুখদুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। যতদিন সমাজ উপযুক্তরূপে উন্নত না হয়, যতদিন মানুষ এই শারীরিক সুখদুঃখ-ভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, ততদিন তাহার উন্নতির, বা জ্ঞানবিকাশের উপায় থাকে না। বলিয়াছি ত, পশুর ন্যায় মানুষেরও শরীর রক্ষা চেষ্টা প্রধান কর্ম্ম—শরীর রক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। শরীরই সকল কর্ম্মের—সকল ধর্ম্ম-সাধনের মূল। এজন্য ইতর জীবের ন্যায় মানুষের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি এত বলবতী,—এজন্য শারীরিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইতর জীবের ন্যায় মানুষে এত প্রবল। যতদিন সে দুঃখ দূর করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব হয়, যতদিন মানুষ সে দুঃখভারে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে, ততদিন তাহার অন্যদিকে উন্নতির উপায় থাকে না,—ততদিন তাহার অন্য কোনরূপ সুখদুঃখানুভূতির অভিব্যক্তি হয় না। অন্নচিন্তা মানুষের প্রধান চিন্তা অন্নের অভাব প্রধান অভাব। মানুষ যতদিন এই অন্নাভাব ও অন্য শারীরিক অভাব বা দুঃখ দূর করিতে না পারে, ততদিন সে মহাজ্ঞানী বা মহাধার্ম্মিক হইলে, সেই দুঃখে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। যতদিন মানুষ দরিদ্রতা জন্য অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে আবাসাভাবে কষ্ট পায়, যতদিন সমাজ মানুষের সে দুঃখ নিবারণ করিতে না পারে। মানুষের অন্নের সংস্থান বস্ত্রের সংস্থান আবাসের সংস্থান তাহাদের রক্ষার উপায় করিয়া দিতে না পারে,—যতদিন মানুষ পীড়ার জ্বালায় নিয়ত কষ্ট পায়, সমাজের উপযুক্ত বিধানের অভাবে সেই চিরনূতন চিরক্লেশকর দরিদ্রতাভারে নিপীড়িত হইতে থাকে,—ততদিন মানুষের উন্নতির পথ বন্ধ হয়।

দুঃখের সাধারণ নিয়ম এই যে দুঃখানুভূতি যত তীব্র হয়—দুঃখদূর করিবার চেষ্টাও তত অধিক হয়—এবং সেই দুঃখদূর জনিত সুখও তত তীব্র হয়। দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা ও বিস্তার অনুসারে—সে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি হয়। যেখানে অভাব সামান্য, সেখানে দুঃখবোধ সামান্য, সেখানে দুঃখের পরিমাণ ও গভীরতা তত সামান্য, সেখানে সে অভাব দূর জনিত সুখবোধও সামান্য। যেখানে অভাববোধ দূর হয়,—দুঃখবোধ দূর হয়—,সেখানে সুখবোধও দূর হয়,—সেখানে সুখদুঃখ দ্বন্দ্বজ্ঞানও দূর হয়। সাধারণতঃ আমাদের শারীরিক অভাব সীমাবদ্ধ। স্বচ্ছন্দ-বনজাত-শাকান্নে আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে, সামান্য বস্ত্রে আমাদের শীত তাপ নিবারণ হইতে পারে, সামান্য আবাস গৃহে আমাদের আশ্রয়স্থান হইতে

পারে। ইহা ব্যতীত মানুষ সাধনা দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণাবেগ সহ্য করিতে পারে—এবং সামান্য চেষ্টায় সে ক্ষুধাতৃষ্ণাবেগ নিবারণও করিতে পারে। আর আমাদের কর্ম্মশক্তি—বিশেষতঃ সমবেত কর্ম্মশক্তি বড় অধিক। এজন্য আমরা সমাজের সহায়ে, শারীরিক অভাবের অতীত হইতে পারি—শারীরিক দুঃখ দূর করিতে পারি,—শারীরিক সুখদুঃখবোধের অতীত হইতে পারি। বিশেষতঃ যে দেশে প্রকৃতি আমাদের অনুকূল, সেখানে প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রচুর আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেন,—যেখানে আমরা বিনা চেষ্টায় বা অল্প চেষ্টায় আমাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারি, যেখানে শীত গ্রীষ্মের তাড়না সামান্য বা সহনীয়, সেখানে মানুষ অনায়াসেই শারীরিক দুঃখের অতীত হইতে পারে। অতএব আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ জন্য শারীরিক দুঃখানুভূতির প্রয়োজন। সে দুঃখ জন্য আমরা প্রকৃতিকে মমতাহীন বলিতে পারি না। সে দুঃখ যে অমঙ্গলবাদের কারণ নহে,—তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি।

———*0::0*———

চতুর্থ অধ্যায়।

সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ,—কামমানসজ সুখ,—অহঙ্কারজ সুখ,—সাত্ত্বিক হ্লাদিনী শক্তি,—সৌন্দর্য্যানুভূতি,—শিল্প ও কলা বিদ্যা,—সৌন্দর্য্যের আদর্শ জ্ঞান,—অসৌন্দর্য্যানুভূতিজ দুঃখ দূর চেষ্টা,—আদর্শ লাভ চেষ্টা,—পূর্ণাদর্শ ভগবান।

৭৬। শরীররক্ষা ও পোষণের জন্য যে জীবের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন আছে, এবং মানুষে সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া যে ক্রমে সেই শারীরিক সুখদুঃখের অতীত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই খানে মানুষের সুখদুঃখানুভূতির শেষ হয় না। এখানে যদি মানুষের সুখ দুঃখানুভূতির শেষ হইত, তাহা হইলে মানুষ আর অগ্রসর হইতে পারিত না। তাহা হইলে মানুষে ও ইতরজীবে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের আর বিকাশ হইত না,—মানুষ ক্রমে অলস, অকর্ম্মণ্য, তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হইয়া শেষে পশুত্বে পরিণত হইত। তামসিক মানুষ বড় জড়স্বভাব। কোন রূপে উদর পূর্ত্তি হইলে সে আর কিছু চাহে না। সে আলস্য, অতিনিদ্রা, বিহ্বলতা, দীর্ঘসূত্রতা কর্ম্মবিমুখতা ভাল বাসে। তবে কখন কখন ইন্দ্রিয়ের বা লোভাদি রিপুর উত্তেজনায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কর্ম্ম করে। এমন বিচিকিৎস্য অলস লোকও থাকিতে পারে যে বিশ্রামসুখভঙ্গভয়ে দহ্যমান গৃহের পতনে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষার জন্য সামান্য পলায়নচেষ্টাও কষ্টকর মনে করে। কাজেই মানুষের সে প্রকৃতি আরও উন্নত না হইলে—মানুষের অন্যরূপ সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ না হইলে—সে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

এজন্য মানুষ যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্মাদি দুঃখ নিবারণ করিয়া অবসর পায়, তখন প্রকৃতি যদি তাহাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহেন, তবে তাহার অনুরূপ সুখদুঃখানুভূতিশক্তির বিকাশ হয়। সে সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ মানসিক বা কাল্পনিক। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ সূক্ষ্মশরীরজ সুখদুঃখও বলিতে পারি। বাহ্যবিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক জনিত যে অনুভূতি—আন্তর ইন্দ্রিয় মনের যে অনুভূতি—তাহার মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সুখজ, আর কতকগুলি দুঃখজ। আর এই সুখদুঃখানুভূতির মধ্যে কতকগুলি শারীরিক আর কতকগুলি মানসিক—বা কাল্পনিক। ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখদুঃখানুভূতিই প্রথম। এই ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখদুঃখ মধ্যে বংশ রক্ষা প্রয়োজন জন্য কামবৃত্তিজনিত সাধারণ সুখদুঃখবোধ—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বোধের ন্যায় মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতি মানুষ ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। শরীররক্ষার্থ চেষ্টা আহার সংগ্রহ চেষ্টা, আচ্ছাদন বা আশ্রয় সংগ্রহ চেষ্টা, বংশ রক্ষার্থ সন্তান উৎপাদন চেষ্টা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু বলিয়াছি ত ইতর জীবের সে চেষ্টার সে সুখদুঃখানুভূতির সীমা আছে। তাহাদের সে সুখদুঃখানুভূতি একই প্রকারের। তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই—তাহার ক্রমবিকাশ নাই।

৭৭। কিন্তু মানুষের সেই ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখদুঃখানুভূতিরও ক্রমবিকাশ আছে। মানুষের যত জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে—যতই তাহার বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিস্তার ও বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কল্পনা বশে মানুষের রসনার সুখদুঃখবোধের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখবোধের,—স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখ-বোধের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে সুখদুঃখবোধের কতদূর বিস্তার হইতে পারে, এবং সেই কাল্পনিক সুখ লাভ করিবার চেষ্টা কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, ও সেই কাল্পনিক সুখের অভাব কতদূর দুঃখকর বোধ হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময় ধারণা করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা অত্যন্ত অধিক—অনেক সময় সে জ্বালা অসহ্য। কিন্তু সে জ্বালা সহজে নিবারিত হইতে পারে। মানুস সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া—ক্রমে সে সুখদুঃখানুভূতির অতীত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ অনেক স্থলে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া ও উদর পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। যে 'বড় লোক' সে ত এই সাধারণ ক্ষুধা

তৃষ্ণার জ্বালা জানে না। সে ক্ষুধা নিবারণ জনিত সুখ কেমন তাহাও বুঝি সে কখন জানে না। বরং সে অনেক স্থলে ক্ষুধা হয় না বলিয়া, অথবা অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি জন্য দুঃখ পায়। তখনও সে কাল্পনিক উপায়ে আহার-জনিত বা রসনা-তৃপ্তি-জনিত সুখ লাভের চেষ্টা করে। তাহার জন্য সে যে কত উপায় উদ্ভাবন করে,—কত উপাদেয় সুরুচিকর, সুমধুর খাদ্য দ্বারা রসনা তৃপ্তির চেষ্টা করে। সে চেষ্টা কতদূর তীব্র হইতে পারে—সেই কাল্পনিক সুখদুঃখবোধ কতদূর পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক স্থলে ধারণা করিতে পারি না। সে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ-বাসনা কতদূর বলবতী হইতে পারে, তাহার তাড়না কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে—সে ভোগ-বাসনা যে কেন কিছুতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না—যতই সে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়, ততই অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় কেন তাহা বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিতে থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে সামান্য শাকান্নে সন্তুষ্ট, সে আধুনিক পাশ্চাত্য ধনীর টেবিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—ভূধর শিখর হইতে পাতাল বা সাগরতল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত এত আহার্য্য কেন রাশীকৃত হয়, কেন একরূপ তামসিক আহ্লাদ বা বিহ্বলতা নাশের জন্য—উৎকট তৃষ্ণা নিবারণ জন্য, দেশদেশান্তর হইতে এত মূল্যবান বস্তু সংগৃহীত হয়, কেন সে ধনীর একবারের মাত্র ভোজনের জন্য কত কঠোর চেষ্টায়, কত দরিদ্রের অর্থ ও শক্তি শোষণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ হইতে শত কি সহস্র মুদ্রা অকাতরে অপব্যয় করা হয়,—যে অর্থে সহস্র কি অযুত কাঙ্গালের উদারান্নের সংস্থান হইতে পারিত তাহা বৃথা নষ্ট করা হয়—তাহা ধারণা করিতে পারে না। যে শীত গ্রীষ্ম, আতপ বর্ষা নিবারণের জন্য সামান্য আবাস যথেষ্ট মনে করে, যে সামান্য গুহা পর্ণকুটীর বা বৃক্ষাশ্রয় পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে কোটিপতির সহস্র-প্রকোষ্ঠযুক্ত বিংশতিতল প্রাসাদের কি প্রয়োজন—কি রূপ আবাসের অভাব জনিত কাল্পনিক দুঃখানুভূতির ক্রম-বিকাশে ও সে দুঃখ দূর করিবার ক্রমবর্দ্ধিত চেষ্টা হইতে সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এত বড় প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য পরিচ্ছদে আমাদের বা লজ্জা নিবারণ জন্য প্রয়োজন, সেই পরিচ্ছদে যে পরিতুষ্ট হয় তাহাতে যাহার দুঃখ নিবারণ হয়, সে সেই পরিচ্ছদের পারিপাট্য জন্য—সে সম্বন্ধে বিলাসিতা বা অভিমান নিবৃত্তি করিবার জন্য মানুষ কেন অকাতরে এত অর্থ ব্যয়

করে, কেন তাহার জন্য দেশদেশান্তর হইতে কত চেষ্টায় এত মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে, কেন বা সুদূর তুষারাবৃত সাইবিরিয়া দেশ হইতে এতরূপ কোমল মসৃণ লোম সংগ্রহ করে, কেন মরুময় তাপদগ্ধ আফ্রিকার দুর্গম সাহারা দেশ হইতে এত সুন্দর দ্রব্য আহরণ করে, কেন অগাধ জলধিতলে প্রবেশ করিয়া এত মণি মুক্তার অনুসন্ধান করে, অথবা গভীর খনির তিমির-গর্ভে প্রবেশ করিয়া কেন এত রত্ন উদ্ধার করে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে স্বাভাবিক শারীরিক দুঃখ দূর করিয়াই তৃপ্ত হয়, সে,—মানুষের শারীরিক ভোগলালসা বিলাসিতা ইন্দ্রিয়সুখচেষ্টা কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, কিরূপ অদম্য তেজে ক্রমবর্দ্ধিত বেগে মানুষকে সে সম্বন্ধে কাল্পনিক দুঃখ নিবারণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিরূপে সেই বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে—তাহাকে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে অনেক সময় বাধ্য করে, কেন যে তাহার বিলাসলালসা চরিতার্থ জন্য এত দাসদাসীর জীবন উৎসর্গ, এত অর্থের অপব্যয়, এত কর্ম্মশক্তির বৃথা ক্ষয় প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারে না।

৭৮। যাহা হউক, মানুষ যদি এই কামমানসজ সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখলাভই এক-মাত্র পুরুষার্থ মনে করিত, তাহা হইলে আর তাহার অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতনা। এই জন্য মানুষের এমন এক অবস্থা আসে, যখন সে এই ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ সুখদুঃখ অনুভব করে—সেই অন্যরূপ দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে—সেই অন্যরূপ দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সুখদুঃখানুভূতির মধ্যে আমাদের অহঙ্কারজ বা অভিমানজ সুখদুঃখানুভূতিই প্রথম। 'আমি'কে অন্যের অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা হীন বোধ করায় যে দুঃখ, ও সেই 'আমি'কে অন্যের অপেক্ষা বড় করিবার চেষ্টায় ও সে চেষ্টার সফলতায় যে সুখ, অন্যকে আমা অপেক্ষা ছোট করিয়া আমার বড় হইতে পারিলে যে সুখ—সে সুখদুঃখ এই অভিমানজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ থাকা হেতু, মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ ঘটে, নানারূপে মানুষ মানুষের সংস্রবে আসে। এই সংস্রব হইতে মানুষ অভিমানবশে তৎসংসৃষ্ট অন্য অপেক্ষা বড় হইতে—বা বহুমান লাভ করিতে চেষ্টা করে। এবং সে অন্য অপেক্ষা বড় হইতে পারিলে সুখবোধ করে, এবং বড় হইতে না পারিলে বা ছোট হইয়া গেলে দুঃখ পায়। এই অভিমানজ সুখদুঃখানু-ভূতি সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ভোগবৃত্তির সহিত প্রথমে বিকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে

মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগকেই তাহার পরম-পুরুষার্থ মনে করে। কাজেই অন্য অপেক্ষা সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগের অধিক ব্যবস্থা করিয়া, অন্য অপেক্ষা অধিক বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অন্য অপেক্ষা আপনাকে বড় ও অধিক সুখী মনে করে। ক্রমে অন্যরূপে মানুষের এই অভিমানবৃত্তির আরও বিকাশ হইতে থাকে। এই অভিমানবশে মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে অভিমানবশে মানুষ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে মানুষ পর অপেক্ষা বড় হইতে চেষ্টা করে, পর হইতে গ্রহণ করিয়া, পর অপেক্ষা অধিক অর্থ সম্মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম প্রভৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে, পরকে আপনার পথ হইতে সরাইয়া দিয়া আপনি অগ্রসর হইতে যায়, পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, অথবা পরকে আপনার অনুগামী করিয়া লইতে চাহে, জোর করিয়া পরকে আপনার পথে আপনার অধিকারে বা অধীনতায় আনিতে চাহে, পরকে ছোট করিয়া আপনাকে বড় করিয়া পরকে আকর্ষণ করিয়া লইতে চাহে,—সেখানে মানুষ পরকে বড় দেখিয়া পরকে আপনার পথের অন্তরায় দেখিয়া, পরের দ্বারা আপনাকে পরাজিত বা অভিভূত হইতে দেখিয়া, পরকে আপনার পথে বা আপনার অধিকার মধ্যে না আনিতে পারিয়া, পরের নিকট যাহা চাহে তাহা পায় না দেখিয়া,—দ্বেষ ঈর্ষা ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিবশে বা অপমান অনাদরজনিত দুঃখবশে কষ্ট পায়। সেখানে অর্থলিপ্সা যশোলিপ্সা পদলালসা প্রভৃতি নানারূপ মানসিক বা কাল্পনিক দুঃখ আসিয়া মানুষকে ক্লেশ দেয়। মানুষ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য, অন্য অপেক্ষা আপনাকে যথাসাধ্য বড় করিবার জন্য, অথবা অন্য "বড়"র সমকক্ষ হইবার জন্য, কিম্বা অর্থ যশঃ পদ প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য—কর্ম্ম করে। কিন্তু সে যতই সেই সকল ঈপ্সিত বিষয় লাভ করে, ততই তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ততই সে আরও অর্থ আরও যশঃ আরও পদ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। এই অভিমান বৃত্তির বিশেষ বিকাশাবস্থায় মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগের কথাও ভুলিয়া যায়। যেখানে ধনলিপ্সা পদলিপ্সা যশোলিপ্সা প্রবল, সেখানে ইন্দ্রিয়ভোগসুখের কথা মনে থাকে না। কৃপণের ভোগবিলাসবাসনা থাকে না।

এই অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতি কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেকে ধারণা করিতে পারি না। যে সামান্য অর্থার্জ্জন দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি সাধারণ অভাব দূর করিয়া সন্তুষ্ট হয় পরিতৃপ্ত হয় সে সুখদুঃখের অতীত হয়, সে লক্ষপতির—কোটীপতি না হইতে পারায় যে দুঃখ, কোটীপতির—বৃন্দপতি বা যক্ষের ন্যায়

ধনশালী হইতে না পারায় যে দুঃখ, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে উৎকট চেষ্টা, যে জীবন পর্য্যন্ত পণ—তাহা বুঝিতে পারে না। আর সেই জন্য সে, লক্ষপতি বা কোটীপতি যে সমস্ত জীবন কেমন করিয়া উৎসর্গ করে, ও সেই দুঃখবোধের দ্বারা, সে তাহার অনুরূপ বা উচ্চতর দুঃখবোধ যে কেমন করিয়া বিস্মৃত হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য অধিকারে সন্তুষ্ট,—সে জিগীষাবৃত্তির তীব্রতা, সেকন্দর বাদ্‌সাহের সমস্ত জ্ঞাত পৃথিবী জয়ের পর. জয়ের জন্য আর পৃথিবী নাই বলিয়া যে উৎকট দুঃখানুভূতি তাহা—ধারণা করিতে পারে না। অথবা আরাঙ্গীব প্রভৃতি বাদসাহগণ—পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি নিতান্ত আত্মীয়গণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া—কেন সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিত,—সামান্য রাজাধিকার লাভের জন্য পুত্রত্ব ভ্রাতৃত্ব মনুষ্যত্ব সব ভুলিয়া কেন ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হইত, তাহা সে বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের অহঙ্কারবৃত্তির বা অহঙ্কারবৃত্তি-চরিতার্থতাজনিত সুখভোগেচ্ছার এইরূপ অতি বিকট বিকৃত বীভৎস বিকাশের কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সাধারণতঃ মানুষের এই অহঙ্কারবৃত্তির শক্তি বড় অধিক। যে সকল লোক এইরূপে অহঙ্কারপরিচালিত হইয়া দুঃখ পায়, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত থাকে, তাহারা আর অন্যরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

৭৯। কিন্তু বলিয়াছি ত, আমাদের সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। আমাদের মনুষ্যত্বের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমাদের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি হইতে ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতির, ও ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখানুভূতি হইতে অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হয়। এই বিভিন্ন সুখদুঃখানুভূতি—অবস্থা ভেদে বিভিন্ন। মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বিভিন্ন। কোন মানুষ সাত্ত্বিক, কোন মানুষ রাজসিক, কোন মানুষ বা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন। (১) এই

(১) মানুষের এই বিভিন্ন প্রকৃতির কথা, আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোন মানুষ দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন, কেহ বা রাক্ষস বা আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। গুণানুসারে প্রকৃতিভেদের কথা আমাদের শাস্ত্র হইতে জর্ম্মাণপণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"We may theoretically assume three extremes of human life and treat them as its elements *viz* :—(1) The powerful passion,—*Raja guna*. It appears in great historical characters

প্রকৃতির প্রভেদ অনুসারে মানুষের সুখদুঃখানুভূতিও বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতি তামসিক। আর অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতি রাজসিক। তবে মানুষের প্রকৃতি ভেদে এই শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখও সাত্বিক হইতে পারে—রাজসিক অহঙ্কারজ সুখও সাত্বিক হইতে পারে। (১) আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হইলে যে সুখ হয়, সেই আহার স্নিগ্ধ হৃদ্য 'আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবর্দ্ধক' হইলে সে সুখ কতকটা সাত্বিক। দুঃখশোকাময়প্রদ রাজসিক-আহারে যে সুখ, তাহা রাজসিক, আর বিরস দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট আহারের সুখ তামসিক। পুণ্যগন্ধ পুণ্যস্পর্শ পুণ্যরস ভোগজনিত সুখ সাত্বিক, দুর্গন্ধ কঠিনস্পর্শ বিকৃতরস ভোগজনিত তামসিক লোকের সুখ তামসিক। জাতিরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদনার্থ—কেবল "প্রজায়ৈ গৃহমেধি" হইয়া বৈধধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামচরিতার্থতাজনিত যে সুখ তাহা সাত্বিক—আর অবৈধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাজনিত সুখ রাজসিক বা তামসিক। ক্রোধ প্রবৃত্তিও অনেক সময় শুভ বা সাত্বিক হইতে পারে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এইরূপে আমাদের অর্থার্জ্জন প্রবৃত্তি রাজসিক হইলেও, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে নিজের দারিদ্র্য

---

and in the little world.: (2) Pure knowing, the comprehension of the Ideas—conditioned by the freeing of knowledge from the service of the will—the life of genius,—*Satwa guna*: (3) The greatest lethargy of the will and [illegible] knowledge attaching to it, empty longing, life-benumbing langour,—*Tama guna*. The life of the individual is seldom fixed in one of these extremes, but is a wavering approach to one or the other. The life of the great majority of men is dull meaningless, unenlightened. They are like clockwork,—which is wound up and goes, it knows not why."

Schopenheaur's—*World as Will and Idea*,—Sec. 58,

(১) সুখদুঃখ সাধারণতঃ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। কিন্তু তাহারও অন্তর্বিভাগ হইতে পারে। তামসিক সুখদুঃখকে—তামসিক-তামসিক, তামসিক-রাজসিক ও তামসিক-সাত্বিক এইরূপে;—রাজসিক সুখদুঃখকে—রাজসিক-তামসিক, রাজসিক-রাজসিক ও রাজসিক-সাত্বিক এইরূপে;—ও সাত্বিক সুখদুঃখকে সাত্বিক-তামসিক, সাত্বিক-রাজসিক ও সাত্বিক-সাত্বিক এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। গীতায় ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সুখের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বা গ্রাসাচ্ছাদনের একান্ত অভাব ও পরিবার ও আত্মীয়গণের সেই অভাব দূর করিবার জন্য, যজ্ঞার্থ বা পরার্থ কর্ম্ম জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহার অভাব দূর করিবার জন্য,—বৈধ ও ধর্ম্মাবিরুদ্ধ উপায়ে অর্থার্জ্জন চেষ্টা কতকটা সাত্বিক। বলিয়াছি ত, আমাদের অন্নাভাব বড় অভাব, অন্ন হইতে আমাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, অন্ন আমাদের প্রাণ ও শরীর পোষণ করে—তাই জীবে অন্নদান বড় ধর্ম্ম। অন্নাভাব দূর করিতে না পারিলে, সাধারণ শারীরিক দুঃখ দূর করিতে না পারিলে,—মানুষ আর উন্নত হইতে পারে না—মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না। এ কারণ নিজের ও পরের সে অভাব দূর করিবার জন্য বৈধ উপায়ে অর্থার্জ্জন গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন ও অন্য কর্ম্ম চেষ্টা রাজসিক হইলেও কতকটা সাত্বিক। আর কেবল আপনার শারীরিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য চৌর্য্য দস্যুতা শঠতা বঞ্চনা দ্বারা অর্থার্জ্জন চেষ্টা ও সে অর্থার্জ্জনজনিত সুখ তামসিক। এইরূপ অভিমানজ সুখও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। বিশেষরূপে কর্ম্মী জ্ঞানী বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক হইয়া সম্মান-লাভেচ্ছা-চরিতার্থতাজনিত এই রাজসিক অভিমানজ সুখ কতকটা সাত্বিক। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বা ধার্ম্মিক হইয়া আত্মতৃপ্তিজনিত যে সুখ বা সৎকর্ম্ম করিয়া কি ধর্ম্মাচরণ করিয়া পরকালে সুখলাভাশাজনিত যে সুখ—তাহা সাত্বিক। এইরূপে মানুষের প্রকৃতি অনুসারে তাহার শারীরিক ইন্দ্রিয়জ বা অহঙ্কারজ সুখদুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখ ও অহঙ্কার-চরিতার্থতাজনিত সুখ লাভের চেষ্টা আমাদের তামসিক রাজসিক প্রকৃতিজ বাসনাজনিত। যতদিন আমাদের প্রকৃতির আরও উন্নতি না হয়, ততদিন আমাদের এই ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। যতদিন মানুষ সাত্বিকতা লাভ করিতে না পারে, ততদিন মানুষ অহঙ্কার গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

৮০। যাহা হউক, এই ভোগসুখেচ্ছার বা বাসনার মূল কি, আমরা এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, মানুষ শুধু জ্ঞাতা নহে, শুধু জ্ঞাতাও কর্ত্তা নহে। মানুষ ভোক্তাও বটে। মানুষ জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি আছে, কর্ম্মবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি আছে, মানুষের সুখভোগবৃত্তি আছে। মানুষে জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি ও ভোগশক্তি আছে। মানুষের এই ভোগ শক্তির মূলে তাহার হ্লাদিনীশক্তি—তাহার চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। মানুষ এই

জন্য দুঃখনিবৃত্তি যথেষ্ট মনে করে না—মানুষ দুঃখনিবৃত্তির পরে সুখভোগ করিতে চাহে। তাই শুধু ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ নহে। মানুষ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি করিয়া পরে আনন্দ ভোগ করিতে চাহে,—আনন্দময়ত্ব লাভ করিতে চাহে। মানুষ মূলতঃ এই আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞান বিকাশ হইবার প্রথম হইতেই সে সুখ লাভের জন্য এত লালায়িত হয়—সেই আনন্দময়ত্ব লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ কোন অবস্থাতেই দুঃখ দূর করা—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক দুঃখ দূর করা যথেষ্ট মনে করে না। তবে যেখানে মানুষ দুঃখ দূর করিতে অসমর্থ, দুঃখের ভারে নিষ্পেষিত—সেখানে স্বতন্ত্র কথা। বলিয়াছি ত, এই দুঃখ মধ্যে শারীরিক দুঃখই প্রধান। শারীরিক দুঃখ কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই মানুষ সুখ লাভ চেষ্টায় কর্ম্মে রত হয়। তখন মানুষ আনন্দ অন্বেষণ করে। প্রথম অবস্থায় মানুষের এই আনন্দবৃত্তি তামসিক সুখমূলক। তামসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ ইন্দ্রিয়জ ও কামজ সুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ অহঙ্কারবৃত্তিচরিতার্থতাই সুখলাভের প্রধান উপায়—তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করে। মানুষের মন বড় অস্থির। মানুষ নিতান্ত অলস বা জড়স্বভাব না হইলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার চঞ্চল মন সহজে তৃপ্তি বা শান্তি চাহে না—তাহা দুঃখকর বা অবসাদজনক মনে করে। মানুষ সুখ চাহে—সুখের ভাবনা চাহে, সুখ লাভের জন্য অস্থিরতা বা নিয়ত কর্ম্মচেষ্টা চাহে। তাই মানুষ কৃত্রিম দুঃখ সৃষ্টি করিয়াও সে দুঃখ নিবারণ জনিত সুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর সুখভোগের জন্য মানুষ মাদকসেবনজনিত অস্থিরতা বিহ্বলতা বা উন্মত্ততাও শ্রেয়ঃ মনে করে। এইরূপ সুখ লাভের জন্য মানুষ নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক, রঙ্গরস, হাসিতামাসা প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জনিত শারীরিক দুঃখ দূর করা—সাধারণ ভাবে শারীরিক সুখদুঃখের অতীত হওয়া যথেষ্ট মনে করে না। এজন্য মানুষ রসনাতৃপ্তিজনিত সুখলাভের জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ উপযুক্ত বস্ত্রাদির সাহায্যে শীতাতপ জনিত দুঃখ দূর করিয়া, বা শীতগ্রীষ্মদ্বন্দ্বভাবজনিত দুঃখের অতীত হইয়াও কত মূল্যবান বা চিত্তরঞ্জক পরিচ্ছদ লাভের জন্য লালায়িত হয়। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ সামান্য আবাস গৃহ

দ্বারা তাহার গ্রীষ্মবর্ষানিবারণ কারণ আশ্রয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও মনোহর হর্ম্ম্য প্রস্তুত করতঃ তাহাতে আবাসজনিত আনন্দ ভোগের জন্য লালায়িত হয়। এই তামসিক-রাজসিক ভোগসুখ প্রবৃত্তিবশে মানুষ তাহার ভোগ্য বস্তুকে শুধু তাহার ভোগের উপযোগী করিয়া—ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সে তাহাকে সুন্দর করিতে চাহে—সুন্দর দেখিতে চাহে,—তাহার সৌন্দর্য্যের যতদূর ধারণা হইয়াছে, সেই ধারণা অনুযায়ী সুন্দর করিতে চাহে। তাই এই সৌন্দর্য্যানুভূতি তামসিক ও রাজসিক ভাবের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়জ সুখ-চেষ্টার সম্মিলনে—আমাদের বিভিন্ন ভোগ্য বিষয়কে বা উপকরণকে সুন্দর করিবার চেষ্টায়—নানারূপ শিল্পবিস্তার বিকাশ হইয়াছে,—আমাদের সুখপ্রদ প্রেয়ঃ বিষয়ের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। যাহাকে আমাদের প্রয়োজন তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টায়, ব্যবহারের সহিত 'বাহারে'র, অথবা the useful এর সহিত the ornamental এর সম্মিলন চেষ্টায়—বিভিন্ন শিল্পবিস্তার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। সেই চেষ্টা ফলেই সামান্য পর্ণকুটীর—সুবৃহৎ মনোহর অট্টালিকায়, বা অদ্ভুত কারুকার্য্য শোভিত তাজমহলে পরিণত হইয়াছে—,সামান্য ভেলা বা নৌকা বৃহৎ কোটী মুদ্রা মূল্যের অর্ণবযানে পরিণত হইয়াছে,—সামান্য যান কলের গাড়ীতে (motor car এ) বা রেলগাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। সেই চেষ্টা ফলেই আমাদের বসন ভূষণ তৈজস ও শয্যা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য্য দ্রব্যকে শিল্পী যথা সাধ্য সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করিতে গিয়া তাহার শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে।

অতএব ভোক্তা মানুষ—আনন্দস্বভাব মানুষ শুধু সাধারণ দুঃখ দূর করাই যথেষ্ট মনে করে না। দুঃখ দূর করিয়া যে সামান্য ক্ষণিক সুখ পায়—তাহা সে যথেষ্ট মনে করে না। প্রকৃতি তাহাকে শারীরিকদুঃখনিবারণজনিত যে সামান্য সুখ পুরস্কার দিয়া তাহাকে সুখের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইতেই তাহাকে তাহার আনন্দ স্বরূপের কিঞ্চিৎ আস্বাদ দেন, তাহার ভোক্তৃত্ববৃত্তির বিকাশ করিয়া দেন। সেই সুখের—সেই আনন্দের ক্রমবিকাশ জন্য, সেই আনন্দের আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য, সেই সুখ ও আনন্দ আরও স্থায়ী করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। এইরূপে মানুষের হ্লাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। মানুষের প্রথম বিকাশের অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ চেষ্টায়, কামমানসজ সুখভোগ চেষ্টায় বা অহঙ্কারজ সুখভোগ চেষ্টার মূলে যে মহাতত্ত্ব নিহিত আছে,

মানুষের আনন্দময়ত্বের ক্রমবিকাশের পথ যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

৮১। সে যাহা হউক, মানুষ প্রথমে কামজ বা ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ করিতে করিতে ক্রমে সেই সুখের তামসিক ও রাজসিক অবস্থা হইতে সাত্ত্বিক অবস্থায় আসিতে পারে। সেই সাত্ত্বিক অবস্থায় আসিলে তবে তাহার আনন্দবৃত্তি প্রকৃতরূপে বিকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে মানুষ নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কর্ম্ম করে,—জিহ্বা ত্বক ও নাসিকার সুখবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণসুখভোগের জন্যচেষ্টা করে। সেইজন্য সেই সব ইন্দ্রিয়ের সুখজ বিষয় গ্রহণ করিতে, ও সেই ইন্দ্রিয়ের দুঃখজ বিষয় পরিহার করিতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজ সুখ অন্বেষণ করিতে মানুষ প্রবৃত্ত হয়। এই সময় হইতেই মানুষের প্রকৃত হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। চক্ষু কর্ণ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল অতি নিকটস্থ বস্তুর আংশিক জ্ঞান মাত্র লাভ হইতে পারে। যে অন্ধ ও বধির তাহার বিষয়জ্ঞান বা বাহ্যজগৎজ্ঞান নিতান্ত সামান্য বা আংশিক। চক্ষু দ্বারাই আমরা অতি দূরস্থ বাহ্যবিষয়ের রূপ আকার ও বর্ণ জ্ঞান লাভ করি। চক্ষুর সাহায্যে ও আমাদের স্মৃতি শক্তি হেতু বাহ্যবিষয়ের মধ্যে পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জনিত বাহ্য পরিবর্ত্তন আমরা বুদ্ধি দ্বারা জানিতে [illegible]। তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত বাহ্যজগৎজ্ঞান লাভ হয়। চক্ষু দ্বারাই আমাদের প্রকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষুর ন্যায় কর্ণ ও আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান দ্বার। বিশেষতঃ কর্ণের দ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান ও সুর জ্ঞান হয়,—বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞান হয়,—ভাষা জ্ঞান হয়। কর্ণের দ্বারা আমরা শব্দ-প্রমানজ জ্ঞান লাভ করি। যেমন চক্ষু দ্বারা বাহ্য বিষয়ের রূপ ও আকার জ্ঞান হয়—তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের ক্রিয়াও পরিবর্ত্তনাদি জ্ঞান হয়—এক কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান(perceptive knowledge) লাভ হয়,—সেইরূপ কর্ণের দ্বারা আমাদের যে শব্দজ্ঞান হয়, তাহা হইতে ক্রমে আমাদের পূর্ব্বসংস্কারশক্তি বলে—আমাদের সামান্যের জ্ঞান (abstract knowledge) লাভ হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়,—তাহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞান হয়, ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের জ্ঞান হয়, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়,—দ্রব্য হইতে সাধারণ গুণের জ্ঞান হয়। এক কথায় আমাদের

শ্রাব্যশব্দের দ্বারা—ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দের দ্বারা—আমরা প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পথ পাই। ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমরা চিন্তা করিতে পারি। শব্দ বা ভাষা না থাকিলে আমাদের চিন্তা বা জ্ঞান সম্ভব হইত না, পরের সহিত আলাপ করা—পরের ভাব বুঝিতে পারা ত স্বতন্ত্র কথা। অতএব একদিকে চক্ষু আমাদিগকে 'রূপ'ময় জগৎ দেখাইয়া দেয়—আর অন্যদিকে কর্ণ আমাদিগকে 'নাম'ময় জগৎ ধারণা করায়। এই জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণই শ্রেষ্ঠ। যাহার চক্ষু কর্ণ আছে, তাহার রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় না থাকিলেও—তাহার প্রকৃত জ্ঞান লাভের বিশেষ বাধা হয় না।

৮২। যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের হ্লাদিনী-বৃত্তিবশে সাধারণতঃ সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি জন্মে। নাসিকা জিহ্বা বা ত্বক্ গ্রাহ্য যে বিষয় আমাদের সুখ দেয় বলিয়াছি, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়া সে সুখ ভোগ করি,—আর যে বিষয় আমাদের দুঃখ দেয়, তাহা পরিহার করিয়া সে দুঃখ দূর করি। এই নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থতাজনিত যে সুখ, তাহা প্রধানতঃ তামসিক। কিন্তু চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান হয়—সে বিষয় যদি চক্ষু কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে—তবে সে সুখ অনেকটা সাত্ত্বিক। সেই চক্ষুকর্ণগ্রাহ্য বিষয় হইতেই আমরা সাত্ত্বিক আনন্দ ভোগ করিতে শিক্ষা করি। চক্ষু ও কর্ণ গ্রাহ্য বিষয় মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা আমাদিগকে তত আকৃষ্ট করিতে পারে না। অথবা তাহা সামান্য ক্ষুদ্র ও হেয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। কিন্তু যাহা অসাধারণ, তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর, মহান্, বিরাট ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া আমাদের মনে হয়। এইরূপে চক্ষুগ্রাহ্য রূপে আকারে ও বর্ণে, এবং কর্ণগ্রাহ্য সুরে ও শব্দে অনেক স্থলে আমরা সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব বিরাটত্ব বা বিশালত্ব ও চমৎকারিত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করি। যখনই কোথাও কিছু অসাধারণ বা অলৌকিক আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই, তাহাই চমৎকার বোধ হয়,—তাহাই আমাদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করে। তাহাতে আমাদের চিত্ত বিস্ময়ে ও আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়। আর শুধু যাহা অসাধারণ সুন্দর মহান্ বা বিরাট, তাহাই যে কেবল আমাদিগকে আকর্ষণ করে—তাহা নহে। যাহা সুন্দর মহৎ বিরাট বা উৎকৃষ্ট নহে—তাহাও অসাধারণ হইলে অনেক স্থলে আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহারও মধ্যে কি একরূপ বিশেষত্ব অলৌকিকত্ব আমরা

দেখিতে পাই। তাই যাহা অসাধারণ বিকট—বীভৎস—বা ভয়াবহ, তাহা এক অর্থে আমাদের দুঃখকর হইলেও, আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহার মধ্যে কি অদ্ভুত কিছু থাকে বুঝি—বিশালও কিছু থাকে, যাহাতে আমাদের হ্লাদিনী বৃত্তি চরিতার্থ হয়। এইরূপে আমাদের হ্লাদিনী বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হয়।

যখন বাল্যকালে ব্যক্তিমানবের বা মানবজাতিবিশেষের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ সময় প্রকৃতি তাহাদের সম্মুখে এই বিরাট জগতকে ক্রমবিস্তৃত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহাদের কাছে প্রায় সকলই নূতন—সকলই সুন্দর—সকলই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। তখন তরুণ অরুণের নবোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যে—উষায় বা সন্ধ্যায় আকাশের কোলে নানাছটায় নানাবর্ণের আলোর খেলায় মন মোহিত হইয়া যায়। বালক পূর্ণশশীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হয়। 'চাঁদ আয়—চাঁদ আয়' করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া সারা হয়—চাঁদকে কাছে না পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। তখন সামান্য বাদ্যে তাহার শরীর তালে তালে নাচিয়া উঠে—সামান্য সুরে তাহার প্রাণ অধীর হইয়া যায়। সে ধূলাবালিতে ছাইমাটিতে যত আনন্দ পায়—বড় হইয়া তাহার কণামাত্র আনন্দলাভ করাও অনেক সময় তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বালকের ন্যায় নবোদিত-জ্ঞান-সূর্য্যকিরণস্নাত জাতি বিশেষও আনন্দময়ের বুঝি বড় নিকটে থাকে—তাই তখন তাহারা বিভুগানে বা বেদগানে এত বিভোর, তাই তাহাদের তখন আনন্দময়ের সংস্পর্শে এত আনন্দ, তাই তাহাদের বালকের ন্যায় আনন্দ এত বিকাশিত। বাল্যকালে আমাদের জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সমুদায় কি এক নব উদ্যমে স্ফুটনোন্মুখ নবকলিকার নবউল্লাসে উল্লাসিত থাকে,—বিকাশের অভিমুখে কি ত্বরিতগতিতে প্রধাবিত হয়! কিন্তু যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হয়, যতই বাল্যের বা যৌবনের সে শক্তি শ্লথ হইয়া আইসে, ততই সে সৌন্দর্য্যোপভোগ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তি আর ততদূর থাকে না। তখন বাহ্যবিষয়ের নূতনত্ব—অলৌকিকত্ব কমিয়া যায়,—তাহার অসাধারণত্ব দূর হয়—তাহা আর তত আমাদের আকর্ষণ করিতে পারে না।

তাহা হইলেও, যাহা প্রকৃত সুন্দর মহান্‌ বা বিশাল, তাহা সাধারণ হয় না—তাহার নূতনত্ব অলৌকিকত্ব নষ্ট হয় না। তবে যে সৌন্দর্য্য-ভোক্তা—তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, সে হয়ত সে সৌন্দর্য্য দেখিতে

পায় না। যাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার আন্তর চক্ষু যতই বিকাশিত হয়—সে ততই প্রকৃত আদর্শ সুন্দরকে দেখিয়া আনন্দ পায়—সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, তাহার কাছে সে সুন্দর 'নিতুই নব—নিতুই সুন্দর' থাকে,—তাহা সকল সময়ই চমৎকার অসাধারণ আশ্চর্য্যজনক থাকে। তাহার সৌন্দর্য্যে মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইতে শিখিয়াই আমাদের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়—তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃতসৌন্দর্য্য জ্ঞানের—আদর্শসৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ হয়।

৮৩। এইরূপে আমাদের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইলে, বাহ্যজগতে ব্যষ্টিভাবে বিশেষস্থলে সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব প্রভৃতি ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়া—আমরা সাধারণ (abstract) সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব জ্ঞান—আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব ধারণা লাভ করি। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়জ বাহ্যবিষয় জ্ঞান হইতে বা প্রত্যক্ষ ব্যষ্টি বিষয় জ্ঞান হইতে—সামান্যের জ্ঞানলাভ করি, ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞানে, দ্রব্য হইতে 'গুণ' জ্ঞানে, অনিয়ম হইতে নিয়মজ্ঞানে, বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞানে, বিশেষ হইতে সামান্যের জ্ঞানে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি; তেমনই বাহ্য বিষয়ের ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য জ্ঞান হইতে আমরা সাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, আদর্শ সৌন্দর্য্য জ্ঞানে, শেষে এক বিরাট ভূমা সৌন্দর্য্যজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকি। চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ের আকৃতি রূপ বর্ণ হইতে যেমন একদিকে হ্লাদিনীশক্তির ক্রমবিকাশে এইরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব প্রভৃতির অনুভূতি জন্মে, তেমনই কর্ণগ্রাহ্য শব্দের মধ্যে মহা একত্ববাচক শব্দের ধারণায়—"ব্রহ্ম" "আত্মা" প্রভৃতি শব্দের অর্থ বা স্বরূপ ধারণায় বা ধারণার চেষ্টায় আমাদের আনন্দের বিকাশ হয়। আর কর্ণগ্রাহ্য সুরের বা সঙ্গীতের মনমোহন সৌন্দর্য্য মধ্যে জগতের মহা সঙ্গীততত্ত্ব,—যে মূল শব্দময়ের বিকাশে জগতের বিকাশ, যে সঙ্গীতের তাললয়ের সহিত জগতের মহাতাললয় গতির (rhythm) সৌসাদৃশ্য, যে সঙ্গীতের ঐক্যতানের (harmonyর) সহিত জগতের মহৈকত্বের সঙ্গতি, যে সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিকাশের সহিত ব্যক্তিজীবের আন্তরিক ভাব-বৈচিত্রের বিকাশের সমতা, যে সুরের বিভিন্ন গ্রামের বিকাশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভুবনের বিকাশের একরূপতা ও যে সুরের ক্রম-আরোহণের সহিত জগতের ক্রমোন্নতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, তাহা আমরা যতই ধারণা করি,—ততই আমরা হ্লাদিনী শক্তি চরিতার্থ করিতে পারি। এই সুরের মধ্যে—সঙ্গীতের মধ্যে যে অস্পষ্ট প্রাণের ভাষা আছে—যে প্রাণের ভাব শব্দে প্রকাশ করা যায় না, যে হৃদয়ের

ভাষা কথায় বুঝা বা বুঝান যায় না, তাহা বুঝাইবার যে শক্তি আছে—প্রাণের আনন্দ করুণা প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, সুর ও সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে তাহা যতই বিকাশিত হইতে থাকে—যতই আমাদের সে সঙ্গীতের সে ভাব ধারণা করিবার শক্তি বিকাশিত হয়, ততই সঙ্গীত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সে মহাসঙ্গীত আমাদের অন্তরে সেই ভূমানন্দময়ের আনন্দ সুধার কণামাত্রের আস্বাদ দিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দময়ের দিকে লইয়া যাইতে পারে। (১)

৮৪। বলিয়াছি ত, এই দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়জ বিষয়জ্ঞান হইতে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি বা আনন্দভোগ হয়, তাহা সহজে সাত্বিক হইতে পারে। কেন না তাহাতে সাধারণতঃ আপনাকে বা পরকে দুঃখ দিয়া কোন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। সে সাত্বিক আনন্দ উপভোগের জন্য পরকে বাধ্য করিয়া, ত্যাগগ্রহণাত্মক

(১) Music is a great and exceedingly noble art, its effect on the inmost nature of man is very powerful, it is understood by man as a perfectly universal language, the distinctness of which surpasses even that of the perceptible world itself. In music the deepest recesses of our nature find utterance.

* * * Music is a direct objectification and copy of the Will itself, whose objectivity the Ideas are.

* * * Music expresses joy, sorrow, pain horror, delight, peace of mind, merriment...in the abstract in their essential nature without their motives. * * This universality belongs exclusively to music and gives it high worth.

* * * We may regard the phenomenal world and music as two different expressions of the same thing. Music is an expression of the world, is in the highest degree a universal language.

* * * The unutterable depth of all music by virtue of which it floats through our consciousness is the vision of a paradise firmly believed in, but yet ever distant from us, rests on the fact that it restores to us, all the emotions of our inmost nature but entirely without reality and far removed from their pain.

Schopenheaur's—*World as Will and Idea*,—Vol. I. Sec. 52,
পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের Essay on Music ও দ্রষ্টব্য।

কর্ম্ম দ্বারা কষ্ট দিয়া, বিষয় গ্রহণ করিতে হয় না। রসনাজ স্পর্শজ বা ঘ্রাণজ আনন্দ উপভোগ জন্য যেমন বিষয় গ্রহণ প্রয়োজন হয়—এই চাক্ষুষ ও শ্রবণজ আনন্দ ভোগ জন্য সেরূপ বিষয়গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। তাহা দূর হইতে উপভোগ করিতে পারা যায়—তাহা 'আমার' করিতে না পাইয়াও উপভোগ করা যায়। প্রকৃত সাত্ত্বিক আনন্দ ভোগকালে সেই সুন্দর মহানের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা মনে থাকে না। তাহার সহিত সম্বন্ধ হইলে আমাদের সুখ হয় কি দুঃখ হয়,—সৌন্দর্য্য উপভোগ কালে সে বিচারশক্তিও বড় থাকে না। যখন বিষধরের বাহ্য সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আকর্ষণ করে—তখন তাহার দংশনে যে আসন্ন মৃত্যু, তাহা পর্য্যন্ত মনে থাকে না। শুধু তাহাই নহে। এই আনন্দের সাত্ত্বিক বিকাশ কালে আমাদের অহঙ্কারের বিকাশ থাকে না। অনেক সময় বাহ্য সৌন্দর্য্য—প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা অনুভব কালেও আমাদের অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়। আমাদের 'আমি' জ্ঞান তখন কোথায় লুকাইয়া থাকে। যখন আমরা বাহ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব বিরাটত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হই—আত্মহারা হইয়া যাই—তখন সেই সৌন্দর্য্য মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিই, তখন 'ইদং' এর মধ্যে 'অহং' কোথায় গিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন কি এক মহা-মন্ত্রবলে 'ইদং' 'অহং' একীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের আমিত্ব বা মমত্ব জ্ঞান থাকে না—মানুষের নিজের কথা মনে থাকে না, নিজের সুখদুঃখানুভূতি মনে থাকে না—নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির কথা মনে থাকে না—তখন অতীত ভবিষ্যতের কথা মনে থাকে না,—তখন স্থান কাল জ্ঞান থাকে না—তখন অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। জ্ঞান বিশেষ বিকাশিত হইয়াও যে 'অহং' 'ইদং'-এর মধ্যে পার্থক্য সহজে দূর করিয়া দিতে পারে না,—তাহা আমাদের এই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে—এই আনন্দময়ত্ব লাভ করিলে অতি সহজে সম্পাদিত হয়।

যখন মানুষ এই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিকালে, ঐ সুশোভিত রমণীয় উদ্যানে থরে থরে প্রস্ফুটিত অসংখ্য যুঁথি চামেলি মল্লিকা গোলাপের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া—সে সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ভূমা সৌন্দর্য্যময়কে চিনিতে পারিয়া সে সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া যায়; যখন ঐ বিশাল অনন্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়ের অসংখ্য উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে নবোদিত তরুণ অরুণের হেমাভ কিরণে প্রতিফলিত, নীল পীত হরিতাদি নানা রঙ্গে রঞ্জিত, অনন্ত শোভার অদ্ভুত লীলাবিলাসে—সেই

ধারণার অতীত মহত্ত্বের মহিমাময় গৌরবে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়; যখন নিদাঘের সায়াহ্নে সুনীল গগনতল আচ্ছাদিত করিয়া, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মেঘের কোলে মেঘকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া, প্রকৃতিদেবী তাঁহার কল্পনারাজ্যের এক প্রান্তে কত পর্ব্বত অরণ্যানী সমাকীর্ণ নূতন জনপদ নূতন জীব মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি করিয়া, যাদুকরের যাদুমন্ত্রবলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের পর আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইয়া মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন; আবার যখন তাহার কোলে বিজলী খেলাইয়া, অথবা তাহাতে মুহূর্ত্ত জন্য অস্তগমনোন্মুখ রবির রক্তাভ কিরণ প্রভা ছড়াইয়া দিয়া, কোথাও বা রক্তগঙ্গা, কখন বা গলিত সুবর্ণনদীর বিকট শোভা দেখাইয়া দেন, অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের ভীষণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, কিম্বা নিমিষের তরে পশ্চিমের মেঘদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, মেঘরাজ্যের উপর সে অস্তাচলস্থ রক্তিম সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দ্বারা মানুষকে সেই সৌন্দর্য্যের মহা আকর্ষণে আকর্ষিত করিয়া লইয়া তাহাকে একেবারে মোহিত ও আত্মহারা করিয়া দেন; যখন অনন্ত গভীর জলধিবক্ষে ভীষণ বাত্যাসংক্ষোভে উত্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-দোলায় বিশালত্বের বিরাটত্বের ভয়ানকত্বের লীলা দেখিয়া মানুষ এমন চিত্তহারা হইয়া যায়, যে পোতমগ্নে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে থাকে না;—তখন মানুষের সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব বা বিশালত্বের অনুভূতি এত অধিক হয়, যে তখন তাহার 'আমি' জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন সে সেই বিরাটত্বের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। সে প্রকৃতিলয় অবস্থায় এ জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তাহার 'অহং' 'ইদং' দ্বৈত বোধ থাকে না। সেইরূপ যখন মানুষ তাহার হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ বিকাশে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অমৃতনিস্যন্দি সঙ্গীতের আনন্দে বিভোর হইয়া যায়,—যে মনোহর সঙ্গীতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, যে সুললিত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বনের হরিণীও আত্মহারা হইয়া গিয়া গায়কের কাছে আসিয়া তাহার হস্তস্থিত হার নিজকণ্ঠে ধারণ করে, যে অর্ফিয়সের বীণার মধুর ঝঙ্কারে বনের বৃক্ষলতাও উৎকর্ণ হইয়া গায়কের অনুগামী হইত বলিয়া প্রবাদ আছে, শুভাদৃষ্টবশে যখন মানুষ সে মহা সঙ্গীতের রসাস্বাদনে তন্ময় হইয়া যায়; অথবা অবশেষে যখন সেই তন্ময়তার পরিণামে মানুষ তাহার হৃদ্বৃন্দাবনে প্রেমযমুনাতটে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিহ্বলচিত্তে সেই মহা সঙ্গীতের আহ্বানে ধাবিত হয়; কিম্বা যখন

সেই সঙ্গীতের জগদ্রূপ মহা বিকাশ মধ্যে সেই সঙ্গীতমূল ওঁকার ধ্বনি অন্তরাকাশে শ্রবণ করিয়া মানুষ আনন্দে আপনা হারা হয়,—তখন তাহার 'অহং' 'ইদং' জ্ঞান থাকে না, তখন মানুষ তাহার মনোময়রূপ বিজ্ঞানময়রূপ অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময়রূপে অবস্থান করে।

এইরূপে যখন এই হ্লাদিনীশক্তি শুধু বাহ্য-বিষয়ানন্দভোগে আমাদিগকে আবদ্ধ না রাখিয়া, আমাদিগকে বাহ্য চক্ষু বা বাহ্য কর্ণের বাহ্য বিষয় হইতে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের আন্তর চক্ষু ও আন্তর কর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; তখন সেই এক আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব বিরাটত্ব উপভোগ করিবার শক্তি আমাদের বিকাশিত হয়, তখন বিশেষ প্রতিভাবলে বা সাধনাবলে সে আদর্শকে আমরা মানস পটে চিত্রিত করিতে পারি। পরে ধ্যানবলে আমরা নিজের চিদাকাশে আন্তর চক্ষু গ্রাহ্য ও আন্তর কর্ণগ্রাহ্য সে আদর্শ আশ্চর্য্য পূর্ণসৌন্দর্য্যময় রূপ ও সঙ্গীতময় শব্দ-রাজ্য ধারণা করিয়া তাহাতে আত্মহারা হইয়া যাই। তখন মহাসমাধিবলে সেই মহানন্দময় মহাসাগরে আমরা ডুবিয়া যাই। সেখানে আমাদের আমিত্ব কোথায় লয় হইয়া গিয়া, তাহার স্থানে এক বিরাট 'জ্ঞাতা' সমস্ত 'জ্ঞেয়'কে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া আবির্ভূত হন। সে মহা সমাধি অবস্থায় থাকে কেবল—এক ভূমা আনন্দসাগর। যখন মানুষ সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সে আনন্দের দেশকাল-পরিচ্ছিন্নত্ব দূর হয়, তখন মুক্তি হয়।

৮৫। কিন্তু জীবমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বভাব। যতই তাহার প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ হইতে থাকে, ততই জীব সেই ভূমা আনন্দসাগরের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহা হইলেও, যতদিন তাহার জীবত্ব একেবারে না লোপ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে মহানন্দসাগরে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে না। এই আনন্দ স্বভাব জন্য ইতর জীবও কিয়ৎপরিমাণে এই আনন্দভোগের অধিকারী। পশু পক্ষীরও সে আনন্দ উপভোগ করিবার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে। তবে তাহাদের জ্ঞানবৃত্তি যেমন অপরিস্ফুট,—তেমনই এই হ্লাদিনীবৃত্তিও তাহাদের অবিকাশিত। তথাপি পশু পক্ষী কখন কখন সঙ্গীতে মোহিত হয়—প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিহ্বল হয়। তাই শিখী প্রাবৃটে মেঘের খেলা দেখিয়া পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে তাই চাতক জলধর শোভা দেখিয়া উধাও হইয়া আকাশ পানে ধাবিত হয়। তাই চকোর চাঁদের পানে আত্মহারা হইয়া উড়িয়া যায়। সে পশু পক্ষীর কথা এস্থলে

প্রয়োজন নাই। মানুষেই এই সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। তাই মানুষ সৌন্দর্য্যানুভবকালে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করি, সে আনন্দ দেশকাল পরিচ্ছিন্ন—সে আনন্দ ক্ষণিক। সে চিত্তনিরোধ ক্ষণিক, সে আনন্দের মোহ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। ফুল দেখিতে দেখিতে শুকায়, নিদাঘে মেঘের কোলে বিজলীর খেলা দেখিতে দেখিতে পলায়, গিরিশৃঙ্গে তরুণ অরুণের নৃত্য দেখিতে দেখিতে ফুরায়, দিব্য সঙ্গীতের মধুর স্বর শুনিতে শুনিতে অনন্তে মিলায়, রমণীর রূপ ও বালকের মধুরতা দেখিতে দেখিতে লুকায়। তাই সে আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ হয় না। তাই আবার সেই আনন্দসাগর হইতে আমিত্বের পুনরুত্থান হয়। সাধারণতঃ মানুষের আনন্দবৃত্তির বা সৌন্দর্য্যানুভূতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ সহজে সম্ভব নহে। বলিয়াছি ত, আমরা প্রথমে শারিরীক দুঃখ দূর করিতে গিয়া যে নিম্নশ্রেণীর দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জ সুখ পাই—তাহা হইতেই আমাদের আনন্দবৃত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ্য বিষয়জ্ঞান হইলে, যখন সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে কেবল সেই জ্ঞান হইতে তাহার সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন হইতে আমাদের সাত্বিক আনন্দবৃত্তির বা প্রকৃত হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই হ্লাদিনী শক্তির যত বিকাশ হয়, ততই আমরা প্রথমে বাহ্য বিষয়ে সৌন্দর্য্য মহত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া তাহা হইতে আনন্দভোগ করিতে শিক্ষা করি। কিন্তু বলিয়াছি ত, সকল বাহ্য বিষয়ই সুন্দর বা মহৎ নহে। জগৎ ক্রমবিবর্ত্তনশীল। সেই মহাপ্রকৃতি কালশক্তিবশে ক্রমে ক্রমে জগৎকে ভগবানের সেই আদর্শ কল্পনার অভিমুখে লইয়া যান। তিনি সেই ব্রহ্ম কল্পনায় স্থান কালরূপ 'টানা পড়েন' সূত্র দিয়া গঠিত চিত্রপটে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে সৌন্দর্য্যের মহত্বের বিরাটত্বের নানারূপ অভিনব সৃষ্টি সেই মহাকল্পনা অনুসারে সদ্রূপে বিকাশ করিতে করিতে অনন্তের দিকে জগৎকে লইয়া যান। তাই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটত্ব কখন বুঝি পূর্ণরূপে বিকাশিত হয় না,—তাহা কখন নিত্য স্থায়ী হয় না। জগতে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের মহত্বের ক্রম-আপূরণ মাত্র হইতে থাকে। কাজেই জগতে আমরা অনেক স্থলে অপূর্ণত্ব, অসৌন্দর্য্য, অমঙ্গল প্রভৃতি দেখিতে পাই। সে কদর্য্যত্ব ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব দেখিয়া আমাদের আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ আসে—সুখের পরিবর্ত্তে

ঃখ আসে। আমাদের জ্ঞানের বিকাশের সহিত, সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশের হিত, যতই আদর্শ-সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ হয়—যতই আদর্শ মহত্ব বিশালত্বের ারণার বিকাশ হয়, ততই তাহার পার্শ্বে বাহ্য জগতে অসুন্দর অমহান্ দেখিয়া ামরা দুঃখ পাই। যাহা সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির প্রথম বিকাশাবস্থায় আমাদের িকট সুন্দর মনে হইত, তাহাই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির অপেক্ষাকৃত িকাশে—আদর্শ সৌন্দর্য্য ধারণার ক্রমপরিণতিতে—অসুন্দর বলিয়া আমাদের মনে য়। সুতরাং যতই আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বা হ্লাদিনী বৃত্তির বিকাশ হয়, যতই ৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মহত্বের আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশ হয়, ততই আমরা জগতে ়সৌন্দর্য্য অমঙ্গল দেখিতে পাই, ও সে অমঙ্গল দেখিয়া দুঃখ পাই।

৮৮। এই ব্যবহারিক সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের কাল্পনিক আদর্শ ৌন্দর্য্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জড় বল জীব বল পশু বল মানুষ বল—াহার যেরূপ আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, তদনুসারে, যে যত সেই আদর্শের অনুরূপ—সে তত আমাদের নিকট সুন্দর বোধ হয়। বলিয়াছি ত, এই আদর্শ-জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। এজন্য প্রথম অবস্থায় যাহাকে আমরা আমাদের তদানীন্তন নিম্ন আদর্শ ধারণার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া সুন্দর মনে করিতাম, তাহাকে আর এক অবস্থায়—আমাদের উচ্চতর আদর্শ কল্পনার অনেক দূরে দেখিয়া, অসুন্দর মনে করি। যাহা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা প্রায় জগতে পাওয়া যায় না। তাহা সাধারণ হইতে পারে না। এজন্য যাহা সাধারণ, তাহাকে সে কাল্পনিক আদর্শের অনুরূপ সুন্দর বোধ হয় না। আমাদের প্রথম সৌন্দর্য্যজ্ঞান তামসিক—আমাদের স্বার্থ সংসৃষ্ট। যাহা আমাদের যত ব্যবহার্য্য—আমাদের ভোগবৃত্তি চরিতার্থের যত উপযুক্ত, তাহাকেই আমরা প্রথমে সুন্দর মনে করি। তাহার পর আমাদের নিজের সহিত সে সম্বন্ধের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, যখন বাহ্য বিষয়ের কথা ভাবিতে শিখি—তখন তাহার সংসৃষ্ট অন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ যতটা ধারণা করিতে পারি—সেই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সেই বিষয় বা সেই বস্তু যতদূর উপযোগী বলিয়া বুঝিতে পারি, অথবা এ বিরাট সংসার মধ্যে যাহার যে স্থান, এবং সে স্থান অধিকার করিবার জন্য—বা সে স্থানের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাহার যতদূর বিকাশের আবশ্যক, সেই বস্তুর তদনুযায়ী বিকাশ আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারি—তদনুসারে সে বিষয় আমাদের কাছে সুন্দর

বোধ হয়। আমাদের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধারণার অনুযায়ী যে যতদূর আদর্শ লাভ করিয়াছে—সে ততদূর আমাদের কাছে সুন্দর। মানুষ ও সাধারণ জীবের যে বাহ্য আকৃতির বা শারীরিক গঠনের আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি—সেই জীবের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের উপযোগী অথচ সুন্দর শরীরের যে আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি,—তাহার শরীর সেই ধারণা অনুরূপ আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী হয়—ততই তাহার বাহ্য আকৃতি আমাদের কাছে অসাধারণ ও সুন্দর বোধ হয়। অনেক স্থলে মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্য তাহার বাহ্য আকৃতিতে বিকাশিত বা সংক্রামিত হয়। অনেকের প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে তাহার আন্তরিক সাত্বিকতা ও নির্ম্মলতা প্রকাশ পায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মুখে তাহার প্রতিভার জ্যোতি বিকিরিত হয়। এজন্যও আমরা মানুষের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনেক স্থলে মোহিত হই। সে যাহা হউক, মানুষের বাহ্য শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার আন্তরিক সৌন্দর্য্য আমাদের অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ যতই আমাদের জ্ঞানে বিকাশিত হইতে থাকে, ততই আমরা মানুষের অন্তরে সে ধারণা অনুযায়ী আদর্শ মনুষ্যত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে বুঝিয়া, তাহাকে সুন্দর বা অসুন্দর মনে করি।।

৮৯। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানুষ জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি আছে। মানুষের সেই বৃত্তি ক্রমবিকাশশীল। সেই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে—ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সম্প্রসারণে—জাতিত্বে ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে—মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব। মানুষের পূর্ণ কাল্পনিক আদর্শ—সাধনা-বিহীন আমরা ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যে পর্য্যন্ত আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, যাহাকে আমরা সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্ত্তী দেখিতে পাই—তাহাকে ততদূর সুন্দর মনে করি। যে তামসিকপ্রকৃতিসম্পন্ন চোর বা দস্যু—তাহার কাছে বোধ হয় রঘু ডাকাত শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যে সামান্য ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাহার কাছে বোধ হয় ঐ নগরের প্রশস্ত পথ দিয়া আকাশ পাতাল বিকম্পিত করিয়া, প্রাণ ভয়ে পলায়নপর লোককে মথিত করিয়া ধাবিত চারি ঘোড়ার গাড়ি আরূঢ়, পারিষদমণ্ডলীশোভিত বিলাসী বাবুই প্রধান আদর্শ। যে কেবল ছলে বলে কৌশলে ধনার্জ্জনই পরমপুরুষার্থ মনে করে—

ঐ কোটী-পতিই বুঝি তাহার প্রধান আদর্শ। যে কর্ম্মী—কর্ম্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ, যে ধার্ম্মিক—ধর্ম্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ, যে জ্ঞানী—পূর্ণজ্ঞানীই তাহার প্রধান আদর্শ।

যে যাহার আদর্শ—সে তাহার কাছে সুন্দর, তাহাকে সে ভালবাসে। সে সেই আদর্শ লাভ করিতেই চেষ্টা করে। মানুষ সাধারনতঃ স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব। মানুষ প্রায়ই তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন। মানুষ প্রায়ই প্রবৃত্তির দাস। মানুষে পশুপ্রকৃতিও বিশেষ বিকাশিত। মানুষের মধ্যে অতি অল্প লোকেই উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের মধ্যে দেবত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। মানুষে জ্ঞানবৃত্তি কর্ম্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা ক্বচিৎ দেখিতে পাই। মানুষে প্রকৃত পরার্থবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই জন্য মানুষের উচ্চ আদর্শের ধারণা আমাদের যত বিকাশিত হইতে থাকে, ততই ধার্ম্মিক মানুষ—জ্ঞানী মানুষ—পরোপকারী কর্ম্মী মানুষ—দেবতুল্য মানুষ আমরা সুন্দর দেখি, ততই তাঁহাদিগকে আমরা ভক্তি করিতে শিখি। ততই সেরূপ মানুষ দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই। ততই সেই শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শে আমরা আপনাদিগকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করি।

মানুষের পরার্থবৃত্তির যত বিকাশ হয়, সামাজিক বৃত্তির যত বিকাশ হয়, যতই স্বার্থপরতা দূর হইয়া পরার্থপরতার বিকাশ হয়—ততই সে মানুষ সুন্দর হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা জাতিত্ব বিকাশে, ব্যক্তিগত জ্ঞানবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশের অপেক্ষা পরার্থবৃত্তির বিকাশে মানুষকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। মানুষের মধ্যে স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি ধর্ম্ম প্রভৃতি বৃত্তির যতই বিকাশ হয়—ততই মানুষকে সুন্দর দেখায়। যে নিজের জন্য জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহা অপেক্ষা যে জ্ঞান বিতরণ ব্রত গ্রহণ করে,-যে নিজের উন্নতির জন্য বা জ্ঞান কর্ম্ম ও চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্য কর্ম্ম করে, তাহা অপেক্ষা যে পরের-সমাজের-মনুষ্যজাতির-সর্ব্বজীবের উন্নতির জন্য কর্ম্ম করে,—যে নিজে নিষ্কাম হইয়া লোকসংগ্রহার্থে, যজ্ঞার্থে, ঈশ্বরার্থে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে—সে অধিক সুন্দর—সে আদর্শের অধিক নিকটবর্ত্তী।

৯০। এইরূপে জড়জগতে জীবজগতে বিশেষতঃ মনুষ্য জগতে যে মহত্ত্বের আদর্শ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিরাটত্বের আদর্শ-তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ প্রথমে ধারণা করিয়া

মানব সমাজে প্রচার করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ 'শিল্পী' বা কলাবিদ্‌গণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যষ্টি-ভাবে চিত্রিত করিয়া আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণ আশ্চর্য্য ঐশী শক্তিবলে সে মহা আদর্শ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। যে ব্রহ্ম কল্পনার সৎরূপ বিকাশে জগতের বিকাশ—যাহা ব্যষ্টিভাবে বহু হইয়া দেশকাল পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া আংশিক অপূর্ণরূপে ব্যক্ত—সেই মূল কল্পনায় তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ–কবি আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। জগতের অপূর্ণত্বের মধ্যে—নিয়ত পরিবর্ত্তন মধ্যে—তাহার পূর্ণ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় রূপ আমাদের দেখাইয়া দেন। আর কবি যাহা ভাষার সাহায্যে শব্দের সাহায্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা সঙ্গীতাচার্য্য কলাবিদ্‌গণ বা শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করগণ আংশিক রূপে দেখাইতে চেষ্টা করেন। সে মহা আদর্শ—কবি কলাবিৎ চিত্রকর ভাস্কর—শব্দে সুরে পটে বা প্রস্তরে অঙ্কিত করেন। বলিয়াছি ত, বাহ্যজগতে আমাদের সে আদর্শ সুন্দরকে দেখিতে পাই না। আর যদিও কদাচিৎ কখন দেখিতে পাই, তবে তাহা দেশকালপরিচ্ছিন্ন–ক্ষণিক। তাহা মেঘের কোলে তড়িল্লতার মত সহসা দেখা দিয়া লুকায়—তাহা আর ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখা হয় না। তাই কৃতী শিল্পী সে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে—তাহাকে চির বর্ত্তমান করিয়া রাখিতে—কালের করাল কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। যে প্রতিভাশালী পুরুষ যতদূর সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা—সে ততদূর সৌন্দর্য্যস্রষ্টা হইতে চাহে। সে বুঝি বিধাতার সৃষ্টির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে চাহে। যে আদর্শ সৌন্দর্য্যকে—যে বিধাতার আদর্শ কল্পনাকে প্রকৃতি পূর্ণ সৎ-রূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন না—অথবা যাহা সৃষ্টি করিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারেন না, কবি সে আদর্শ সুন্দরকে সৃষ্টি করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও রক্ষার চেষ্টা হইতে—এই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিশেষ বিকাশ হইতে কলাবিদ্যা বা সুকুমার বিদ্যার বিকাশ হয়। (১)

---

(১) ইহা সাত্বিক উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্যার কথা—সাত্বিক হ্লাদিনীশক্তির বিশেষ বিকাশের কথা। ইহার রাজসিক ও তামসিক অথবা বিকৃত বিকাশে স্বর্গের সুধাময় সঙ্গীতও অবনত হইয়াছে। নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির কদর্য্য চরিতার্থতা জন্য—কুৎসিত ভাব প্রকাশের জন্য অপব্যবহৃত হইয়াছে। সাধক যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, প্রেমিক

শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীগণ প্রধানতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করেন। কবি মানবের অন্তরের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন। অন্তরের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক বৃত্তি, তাহার শক্তি স্থিতি গতি বিকাশ ঘাতপ্রতিঘাত—সব দেখাইয়া দিয়া কবি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণচিত্র আমাদের জন্য অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। কখন বা মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের কাছে নিম্ন আদর্শ দেখাইয়া দিয়া মানুষের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ও হেয় আদর্শের প্রতি ঘৃণা পরিস্ফুট করিয়া—মানুষকে সেই উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। মানুষের প্রত্যেক বৃত্তির আদর্শ পরিণতি কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, কবি তাহা আমাদের দেখাইয়া দেন। এবং সেজন্য কবি যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের আদর্শ ধারণা করেন বা সে আদর্শ মানুষের মধ্যে যতদূর দেখিতে পান, বা কল্পনা করেন, তাহা কাব্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন; তাহাতে একরূপ স্থায়ীভাব দিতে চেষ্টা করেন,—বাস্তব জগতে সে আদর্শের কদাচিৎ অভিব্যক্তিকে কালের ক্ষণিকত্ব হইতে স্থানের একদেশত্ব হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। অথবা কবি তাঁহার কল্পনা চক্ষে মানুষের যে সৌন্দর্য্যময় আদর্শ দেখিতে পান, সেই ধারণাকে কল্পনা রাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে অথবা নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি অনুসারে সুন্দর করিয়া সৎরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কবি সে সুন্দর আদর্শের স্বরূপ সাধারণকে দেখাইয়া দিয়া—সাধারণকে সেই আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। যে কবি যতদূর উচ্চ আদর্শ আমাদের দেখাইয়া দেন, সে কবি তত শ্রেষ্ঠ—সে কবি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে

যে সঙ্গীতের সাহায্যে প্রাণের উচ্চভাব শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন, তাহাও অশ্লীল ভাব প্রকাশের উপকরণ হইয়াছে। এই কলাবিদ্যার বিকৃত বিকাশে শুধু সঙ্গীত বলিয়া নহে,—কবি চিত্রকর ভাস্কর ও তাহাদের উচ্চ দিব্য শিল্পেরও অবমাননা করিয়াছে। যেমন এই শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনীশক্তির বিকৃত ও বীভৎস বিকাশে মানুষ পরকে অকারণ কষ্ট দিয়া সুখ পায়, জীবকে—এমনকি মানুষকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া—তাহার মৃত্যু যাতনা দেখিয়া সুখ পায়, মানুষ Gladiator's show, cook-বা bull fight প্রভৃতি দেখিয়া সুখ পায়—তেমনই বিকৃত তামসিক কলাবিদ্যার অনুশীলনেও সুখ পায়। আমরা এস্থলে সে তামসিক হ্লাদিনীবৃত্তি চরিতার্থতার কথা বলিতেছি না। সেই আনন্দবৃত্তির বা হ্লাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও সাত্ত্বিক বিকাশের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

তত পূজ্য। তাঁহার সে আদর্শ সার্ব্বজনিক, সার্ব্বকালিক। সে মহা আদর্শ—সমগ্র মানবসমাজকে তাহার অভিমুখে অলক্ষ্যে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কবিগুরু বাল্মিকী ব্যাস প্রভৃতি যে সুন্দর মহান্ বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সে মহা আদর্শ ধরিয়া সমগ্র আর্য্যজাতি একদিন সে আদর্শের অনেক নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এস্থলে আবশ্যক নহে।

৯১। যাহা হউক, মানুষের যেরূপ আদর্শের ধারণা আমাদের জ্ঞানে বিকাশিত হয়, বলিয়াছি ত, যে মানুষ সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্ত্তী হয়, সে আমাদের কাছে ততদূর সুন্দর দেখায়। তাহাকে দেখিয়া আমাদের ততদূর আনন্দ হয়। তাহার প্রতি আমাদের ততদূর প্রীতি ভালবাসা ভক্তি বা অনুরাগের উদয় হয়। আমরা যাহাকে যত সুন্দর দেখি তাহাকে তত ভালবাসি। যাহাকে যত আদর্শের নিকটবর্ত্তী দেখি তাহাকে তত ভক্তি করি। এইজন্য এই প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিকেও চিত্তরঞ্জিনী বা হ্লাদিনী বৃত্তি বলে। সে যাহা হউক, আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ দেখিলে যেমন আমাদের আনন্দ হয়, তেমনই যে মানুষ সেই আদর্শ হইতে যত অধিক দূরে গিয়া পড়ে—সে আমাদের কাছে তত অপূর্ণ অসুন্দর বা কুৎসিৎ দেখায়, তাহাকে ততই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না,—তাহাকে দেখিয়া তত আমাদের দুঃখ হয়। অতএব আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বা হ্লাদিনী শক্তির এই নূতন রূপ বিকাশে—আমাদের নূতন রূপ সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হয়। জগতের মধ্যে জীব জড় যাহার যে আদর্শ আমরা ধারণা করি—যাহাকে সেই আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী দেখি, তাহাকে তত সুন্দর দেখিয়া তত আনন্দ পাই,—আর যাহাকে সেই আদর্শের যত দূরবর্ত্তী দেখি—তাহাকে তত কুৎসিৎ মনে করিয়া দুঃখ পাই। আমাদের জ্ঞানের বা কল্পনার যে আদর্শ ধারণা—সেই আদর্শ হইতে যে যতদূরে—সে তত অসুন্দর—সে তত দুঃখজনক। মানুষ এই হ্লাদিনী-বৃত্তিবশে সেই অসৌন্দর্য্যজনিত দুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। সে তাহার অণুপরিমাণ শক্তি লইয়াও তাহার সেই কাল্পনিক আদর্শকে সর্ব্বত্র সৎরূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করে। সে সর্ব্বত্র নিরানন্দকে আনন্দে পরিণত করিতে, অসুন্দরকে সুন্দর করিতে, ক্ষুদ্রকে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মহৎ করিতে কর্ম্মে রত হয়। তবে যাহার প্রকৃতি হেয়, সে সেই অসুন্দরকে ঘৃণা করে—তাহাকে পরিহার করে। কেবল যাহার প্রকৃতি উন্নত, যে নিজে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে কতক পরিমাণেও

অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, যে মহা সহানুভূতি বলে--সকল মানুষকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সমস্ত জগৎটাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে সেই অসুন্দরকে দেখিয়া দুঃখ পায়,—সেই অসুন্দরের প্রতি তাহার দয়া বৃত্তির বিকাশ হয়। যে নানাবিধ দুঃখে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে—আপনাকে আর উন্নত করিতে পারিতেছে না, আদৌ মনুষ্যত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—তাহাকে দেখিয়া সে নিজে দুঃখ পায়। মানুষ দুঃখ পাইলেই দুঃখ নিবারণ চেষ্টা করে। তাই শ্রেষ্ঠ লোক সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার দয়া বা সহানুভূতি বৃত্তিবশে অসুন্দর মানুষকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করে, আদর্শ অপেক্ষা হেয় মানুষকে আদর্শে উন্নীত করিতে চেষ্টা করে। তাহার জন্য মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করে। মানুষ যেমন আপনাকে তাহার কাল্পনিক আদর্শ অপেক্ষা হীন দেখিলে দুঃখ পায়—লজ্জিত হয়—অনুতপ্ত হয়—ও সেই আদর্শ অভিমুখে যাইবার জন্য চেষ্টা করে, তেমনই সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে, যে পরকে সে আদর্শ অপেক্ষা হেয় দেখিলে দুঃখ পায়, ও সেই পরকেও সে আদর্শ অভিমুখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সে যেমন আপনার মধ্যে অসুন্দরকে দেখিয়া দুঃখ পায়—আপনাকে সুন্দর করিতে চাহে—তেমনি সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে পরকেও অসুন্দর দেখিয়া দুঃখ পায় সে পরকেও সুন্দর করিতে চাহে।

জগতে কার্য্য কারণের ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ম বড় আশ্চর্য্য। যাহা এক সময়ে কার্য্য—তাহাই অন্য সময় কারণরূপে কার্য্যকর হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, যে সুন্দর তাহার প্রতি স্বতঃই প্রেম ভালবাসা ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়। তেমনই-যে আমাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হেতু প্রীতি ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র—তাহাকে আমরা সুন্দর দেখি, তাহাকে আমাদের আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর দেখিতে চাহি। তাহাকে সুন্দর দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়—অসুন্দর দেখিলে দুঃখ হয়। এই জন্য মানুষ তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতিবশে—স্নেহ দয়া প্রীতি বশে—প্রথমে তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দের সুন্দর দেখিতে—তাহাদের মধ্যে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে চাহে। তাহার পর সে নিজের কুল, নিজের গ্রাম, ক্রমে নিজের জাতি, নিজের সমাজকে আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর দেখিতে চাহে। তাহাদিগকে সেই আদর্শ হইতে বহুদূরে দেখিলে দুঃখ পায়। মানুষের শক্তির জ্ঞানের সহানুভূতির যত বিকাশ হয়, সমগ্র জগতের

সম্বন্ধে এই আদর্শের ধারণা—সৌন্দর্য্যের ধারণা যত বিকাশিত হয়, ততই মানুষ ক্রমে সমগ্র মানবজাতিকে, সমস্ত জীবকে, শেষ সমস্ত জড়জীবময় জগতকে, তাহার আদর্শের অনুরূপ বা সে আদর্শের ন্যায় সুন্দর দেখিতে চায়। জগতের কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিলে সে দুঃখ পায়। কখন কখন সে দুঃখ এত তীব্র হইতে পারে—সে অসুন্দরকে দেখিয়া মনে এতদূর ক্লেশ হইতে পারে, যে তখন সে মানুষের যদি শক্তি থাকে, তবে সেই সমগ্র শক্তি দিয়া ও তাহার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও এ জগৎকে তাহার কাল্পনিক আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে। যেখানে যাহা কিছু অসুন্দর অমহৎ বা ক্ষুদ্র দেখিতে পায়—যেখানে যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু মধুর সুন্দর মহৎ বা বিশাল হইতে পারিত, তাহা অসুন্দর অমহৎ ক্ষুদ্র হইয়া আদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পায়, সে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বশে ও বিকাশিত কর্ম্মশক্তি সাহায্যে সেই অসুন্দরকে কুৎসিৎকে তাহার আদর্শ সৌন্দর্য্যে মহত্ত্বে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যাঁহারা জগৎকে এইরূপ সৌন্দর্য্যময় করিতে চেষ্টা করেন, মানুষকে সুন্দর করিতে—আনন্দময় করিতে চেষ্টা করেন, সর্ব্বত্র অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তাঁহাদের আদর্শের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্য কর্ম্ম করেন—তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মবীর। তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। তাঁহাদের চেষ্টাতেই মানবসমাজের ও সমগ্র মানবজাতির ক্রমোন্নতি হয়। তাঁহাদের এই দুঃখানুভূতির ফল পরার্থ কর্ম্ম—তাহার ফল মানবের ক্রমোন্নতি।

৯২। এইরূপে মানুষের এই আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশে তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিরও যে ক্রমবিকাশ হয়, মানুষের অন্তরে সেই আদর্শ ধারণার—সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির যে কতদূর বিকাশ হইতে পারে, তাহা সাধনাবিহীন আমরা ধারণা করিতে পারি না। যখন এই সৌন্দর্য্যানুভূতির পূর্ণ পরিণতি হয়, তখন মানব এইরূপ ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অসৌন্দর্য্যানুভূতিজনিত সুখদুঃখভূমি অতিক্রম করিয়া, এক ভূমা পূর্ণ অদ্বিতীয় অভিনব অনন্ত অবিভক্ত সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়। তখন সে আর উল্লিখিত সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্যরূপ সুখদুঃখানুভূতিবশে কর্ম্ম করে না। তাহার আর কর্ম্ম থাকে না। তখন সে সেই অদ্বিতীয় সত্যশিবসুন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া—ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া 'সর্ব্বত্ব' লাভ করিয়া—সুখদুঃখভূমি অতিক্রম করিয়া মহা আনন্দময়ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক জগতের ক্রমোন্নতিরূপ মহাকর্ম্ম ব্যাপারে—(বা কার্য্যব্রহ্মে)—একাত্মতা

লাভ করে। তখন তাঁহার মুক্তি হয়। সে অবস্থায়—সে সুখদুঃখের অতীত আনন্দময় অবস্থায়—কোন গুরুতর দুঃখও আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখন তাঁহার নিকট কুৎসিৎ বা অসুন্দর কিছু থাকে না। তিনি সকলের মধ্যেই সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের বিকাশ অনুভব করেন। যাহা আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিৎ অপবিত্র বা অসুন্দর বোধ হয়, তাহাতেও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ও তাহার কাল্পনিক প্রকৃষ্ট আদর্শের অপূর্ণ-বিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন নিয়মে তাহার সেই আদর্শের পূর্ণত্বের দিকে গতি তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি জীবের দুঃখ-তত্ত্ব মধ্যে,—ক্রমবিবর্ত্তন নিয়মে, সেই দুঃখের মধ্য দিয়া সুখদুঃখের অতীত সেই পূর্ণ আনন্দময়ের রাজ্যের দিকে তাহার গতি ধারণা করেন। বলিয়াছি ত, এই মুক্ত বা সুখদুঃখের অতীত অবস্থায় তাঁহার আর নিজের কোনরূপ কর্ম্ম থাকে না বটে, কিন্তু তখনও তিনি জগতের পালন, রক্ষণ ও পোষণ বা ধর্ম্মরক্ষণ ও অধর্ম্ম-দমনরূপ কর্ম্মব্যাপারে, কার্য্যব্রহ্মের সহিত একাত্মতা হেতু, আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন। (১) তখনও তিনি জগতকে সেই পূর্ণ আদর্শের দিকে—মানুষকে সেই ভূমানন্দের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্ম করিতে পারেন। যাউক, সে কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৯৩। এইরূপে মানুষ সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির পূর্ণবিকাশে এক অদ্বিতীয় সত্য শিবসুন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে উৎকট সাধনা করেন। সেই অদ্বিতীয় শান্ত শিবসুন্দর যিনি—আমাদের সৌন্দর্য্যকল্পনার চরম আদর্শ যিনি—তিনিই আমাদের পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান। তিনি আমাদের পরম গতি—আমাদের পরম আশ্রয়। সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের উৎস, আমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যানুভূতির আকর। তিনিই আমাদের হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণ চরিতার্থতার, পূর্ণ বিকাশের ও পরম বিশ্রামের স্থান। মানুষ সাধনাবলে যত উন্নত হয়, তাহার হ্লাদিনীশক্তির ও আদর্শসৌন্দর্য্যজ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য হইতে সমষ্টি সৌন্দর্য্যের বা আদর্শসৌন্দর্য্যের ধারণা যতই পরিস্ফুট হয়, ততই সে সেই এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে—পরম আদর্শ সৌন্দর্য্যের দিকে,—সেই ভূমানন্দের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে; ও

---

(১) ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥" ইত্যাদি।

সেই ভূমানন্দসাগরে—অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে আপনাকে চিরতরে বিলীন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র ব্যষ্টি ক্ষণস্থায়ী বাহ্য সৌন্দর্য্যে আপনাকে ক্ষণতরে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ যে আনন্দের যে পরম সুখের আভাষ পায়, তাহা—সেই নিত্য চিরনূতন সদাপূর্ণ এক অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্য্য মধ্যে ভূমানন্দসাগরের মধ্যে আপনাকে একেবারে বিলীন করিয়া দিয়া শ্রেষ্ঠ সাধনাসিদ্ধ মানুষ যে আনন্দলাভ করেন, তাহার নিকট কিছুই নহে। তাই যিনি সাধনাসিদ্ধ, তিনি সে অমৃত ভূমানন্দ লাভ করিয়া, যাহা কিছু অল্প ক্ষণিক মর্ত্ত্য বাহ্যিক আনন্দ, তাহা সমুদায় উপেক্ষা করেন।

সাধনার এই চরম অবস্থায়, মানুষের হ্লাদিনী শক্তির এইরূপ পূর্ণবিকাশকালে মানুষ জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই পরমানন্দময় ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান। তখন তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হয়—যে ব্রহ্মের সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখের অনুভব হয়, তাহাই বাহিরে প্রতিবিম্বিত হয়; তখন তাঁহার নিকট সকলই আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। তিনি জগতে যেখানে যে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের, মহত্ত্বের, বা বিশালত্বের আংশিক বিকাশ অনুভব করেন, তাহার অন্তরালে সেই এক অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্য্যময়কে দেখিতে পান। বলিয়াছি ত, মানুষ যখন সেই ভূমানন্দসাগরে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি আর জগতে কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। তখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই মহাসুন্দরকে দেখিয়া, সেই মহা আনন্দে তাঁহার সব একাকার—সব মধুময় হইয়া যায়। আনন্দ নিরানন্দ সব মিলিয়া—তাহার উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া, পূর্ণানন্দ স্বরূপ লাভ করিয়া, সেই ভূমানন্দ মধ্যে সকলকে বিলীন করিয়া দেয়। তখন তিনি সর্ব্বত্র সেই পরম সৌন্দর্য্যময়ের বিভূতি দর্শন করেন। তখন তিনি "কুসুমে সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের কান্তি, সলিলে তাঁহার শান্তি, বজ্ররবে তাঁহার ভীম রুদ্ররূপ" দেখিতে পান; তখন তিনি সূর্য্যে তাঁহার অনন্ত প্রেম ও শক্তির বাহ্য বিকাশ (১) আকাশে তাঁহার অনন্তত্বের বিস্তার, অনন্তস্থানকালে তাঁহার "এতাদৃশ মহিমার ব্যাপকত্ব" দেখিতে পান।

---

(১) জর্ম্মাণ যোগীশ্রেষ্ঠ সুইডেনবার্গ বলিয়াছেন,—"He (God) is seen by the angels as the sun of heaven, the source of their

তখন আর তাঁহার ব্যষ্টি ক্ষুদ্র অসুন্দরকে দেখিবার অবসর কোথায়? এ পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষণিক সুখদুঃখ অনুভব করিবারই বা অবসর কোথায়? তখন এ পৃথিবী তাঁহার কাছে কতটুকু! (১) এই পৃথিবী হইতে কত গুণ বড় গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য লইয়া এই সৌরজগৎ; ইহা কত নাক্ষত্র জগৎ হইতেও ক্ষুদ্র! এরূপ কোটী কোটী কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর নাক্ষত্র জগৎ লইয়া এ সৃষ্টি (২)। অনন্ত দেশকালে এই অনন্ত সৌর নাক্ষত্র জগতের বিকাশ-বিনাশ-ব্যাপারে, মহাকবির মহাছন্দে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলয়লীলায়, তাহার বিশালত্বে, বিরাটত্বে, অনন্তত্বে, অনন্ত ব্যাপকত্বে, এ পৃথিবীর কথা—ইহার ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা আর তাঁহার মনে অসে না। তখন সকলই এই বিরাটত্বের—মধ্যে এ অনন্তত্বের মধ্যে—ডুবিয়া একাকার হইয়া যায়। যাঁহার সৌন্দর্য্যে—মহত্বে ব্যাপকত্বে সব এইরূপে একাকার হইয়া যায়, যে ভয়ানকের ভয়ে রবি শশী তারা বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানোচিত মহাত্যাগাত্মক কার্য্য ব্যাপারে নিত্য—নিরত, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অনন্তত্বে মহত্বে ভয়ানকত্বে—তিনি তখন আশ্চর্য্য হইয়া—আত্মহারা হইয়া—কি একরূপ অদ্ভুত ভক্তিতে ভয়ে প্রেমে আনন্দে বিভোর হইয়া, তাঁহাতেই একেবারে বিলীন হইয়া যাইতে ব্যাকুল হন।

এই জন্য মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশে মানুষ সেই ভূমানন্দ লাভের জন্য এত লালায়িত হন। তিনি যদি কখন সে মহা আনন্দ হইতে মুহূর্ত্ত জন্যও বিচ্যুত হন, তবে বড় ব্যাকুল হন। মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশাবস্থায়, মানুষ সে মহা-আনন্দ লাভের জন্য পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র আনন্দ—সকল সুখ পরিত্যগে করেন, আজীবন কঠোর সাধনা করেন; আর যখন সে সাধনা ফলে, সেই মহা সৌন্দর্য্য সাগরের—সে অনন্ত আনন্দ সাগরের কণামাত্র লাভ করিতে পারেন, তখন একে-

---

(১) বিলাতী পণ্ডিত কার্লাইল বুঝি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এ পৃথিবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"The ant-hill and its commotions."

(২) এইরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর ও নাক্ষত্র জগতের ধারণা পুরাণের মধ্যে অনেক স্থানে আছে। যথা:—

> "অণ্ডানাং তু সহস্রাণাং সহস্রান্যযুতানি চ।
> ইদৃশানাং তথা তত্র কোটী কোটী শতানি চ"—বিষ্ণুপুরাণ।
> "ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।

বারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন 'অহং ইদং' সব একাকার হইয়া গিয়া—থাকে কেবল এক অনন্ত অখণ্ড আনন্দানুভূতি। মানুষ যখন এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করেন, যখন তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির এইরূপ চরম বিকাশ হয়, তখন তাঁহার মুক্তি হয়। কিন্তু সে কথা এখানে কেন? (১)

---

(১) সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্র মতে ও বৌদ্ধধর্ম্ম মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্তমতে পূর্ণানন্দ লাভই পরম) পুরুষার্থ। আনন্দ অবস্থা—সুখদুঃখ এই দ্বৈতভাবের অতীত (Synthesis) অবস্থা। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময়—তিনিই সত্য শিবসুন্দর। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ হইলেই আনন্দময়ত্ব লাভ হয়। সেই ভূমানন্দ কিরূপ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাহার আভাষ আছে। তাহা এইরূপ :—"(সেই ব্রহ্মের) আনন্দের এই মীমাংসা করা যাইতেছে। একজন বেদজ্ঞ ক্ষিপ্রকর্ম্মা দ্রাঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক আছে—এবং এই বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার। ইহা এক (unit) আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, মানুষ-গন্ধর্ব্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, দেবগন্ধর্ব্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, চিরলোকবাসী পিতৃদের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, আজানজ দেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, কর্ম্মদেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ দেবতাদের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ইন্দ্রের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, বৃহস্পতির এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, প্রজাপতি ব্রহ্মার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ। এ সমুদায়ই কামনা-মুক্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ।" অতএব সেই পৃথিবীপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মের আনন্দ দশ লক্ষ কোটী-গুণিত কোটী গুণ বা অনন্ত গুণ অধিক।

শ্রুতিতে আছে,—

"যতো বাচাঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"